দুই নৌকা

দুই নৌকা

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

শ্রীমান গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

কল্যাণীয়েষু—

বাগবাজার
৪ পৌষ ১৩৪৭

বড়দা

দুই নৌকা

১

চার মাসের লম্বা ছুটি পেয়েছি। এমন নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকা আমার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। কার্সিয়ং-এর কুয়াসা-বিমুক্ত ঝকঝকে প্রভাত আর কনকনে সন্ধ্যা আমার মনকে কত দিকেই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, অথচ কিছুই করবার উপায় নেই। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে যে, এই ছুটির মধ্যে আমাকে কেবলমাত্র বিশ্রামই নিতে হবে, হাল্কা রকমের লেখাপড়া করা ব্যতীত আর আমি কিছুই করতে পাবো না। অগত্যা কাগজ কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসেছি।

ভেবে দেখলুম পরের বিষয় নিয়ে গল্প তৈরি করার চেয়ে নিজের কাহিনী বলাই সহজ। আমরা পরের গল্প বলতে গিয়েও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খানিকটা নিজেরই গল্প বলি। আমাদের মনের মধ্যে যে একজন গল্পবক্তা আছে, সে যখন নিজের গল্প লুকিয়ে রেখে পরের গল্প বলে, তখন যতটা পারে তারই মধ্যে নিজের রংটুকু ফলিয়ে দেয়। কিন্তু আজকালকার দিনে এত লুকোচুরির কোনো প্রয়োজন নেই।

নিজের কথা সোজাসুজি নিজেই বলা উচিত। রোগীর নিজের মুখে যেমন রোগের পরিচয় পাওয়া যায়, পরের মুখে তেমন নয়।

আমার গল্প ছেলেবেলার থেকেই সুরু করি।

আমার বাবা ছিলেন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। ভারতবর্ষে বড় বড় নদী বেঁধে পুল তৈরি করবার আর পাহাড়-জঙ্গল কেটে প্রশস্ত পথ তৈরি করবার প্রথম যুগের বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার. [illegible]ষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবংশের প্রথম আলোকপ্রাপ্ত প্রতিভা। তেজস্বী [illegible]র রাশভারী লোক, অথচ শিশুর মতো সরল। স্থূল বিচারটাই তিনি বুঝতেন, সূক্ষ্ম বিচারের দিকে নজর দিতেন না। তাঁর একজন রসিক বন্ধু তাঁর নাম দিয়েছিলেন দুরমুশ। অর্থাৎ উঁচু-নীচু খানা-গর্ত কিছুই রাখবেন না, অসমতল দেখলেই সজোরে পিটে সমান ক'রে দেবেন। যেখানে মনে করবেন যে অন্যায় প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেখানে যেমন ক'রেই হোক তাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু কেউ যদি একবার বুঝিয়ে দিতে পারে যে সেটা অন্যায় নয়, তাহ'লে একেবারেই নিষ্কৃতি। এই প্রকৃতির লোক আজকাল বিরল।

আমরা দুই ভাই আর এক বোন। দিদি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো, অনেক আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কালে ভদ্রে আমরা দিদির সাক্ষাৎ পেতুম। বাবা আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষায় যাতে কোনো ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখতেন। আমাদের জন্যে [illegible] মাষ্টার নিযুক্ত করা ছিল, তা'রা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকতো। [illegible] ছেলেবেলার থেকেই আমাদের জিম্‌ন্যাষ্টিক কসরৎ আর ইংরেজ[illegible] কথা বলতে শেখানো হোতো। আমাদের সায়ান্স শেখাবার দিকে[illegible]বাবার বিশেষ ঝোঁক। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন শিখবে পদার্থ বিজ্ঞান, একজন শিখবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান। [illegible]নিয়ারি বিদ্যা শেখাবার তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলতেন, কুলি-মজুরের কাজ শিখে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই।

বাবার নিজের ভিতরে ভিতরে যেমন সখ ছিল বৈজ্ঞানিক হ'তে, তেমনি সখ ছিল ডাক্তার হ'তে। এই দুটো সখকেই তিনি আমাদের দিয়ে মেটাতে চেয়েছিলেন। নিজেও তিনি অবসর সময়ে এই নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করতেন। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক বই নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করতেন। আবার নিজে নিজে ডাক্তারি করাও ছিল তাঁর এক বাতিকের মধ্যে। নানারকমের ওষুধপত্র সাজিয়ে রাখতেন আলমারির থাকে থাকে, যখন যেটা প্রয়োজন মনে করতেন সেটা ব্যবহার করতেন, আবার উপযাজক হ'য়ে অপর ব্যক্তিকেও বিতরণ করতেন। তিনি বলতেন, সকল বিষয়েই আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করা উচিত, এমন কি শরীরের বিষয়েও। বসতবাড়ি যেমন ভাবে রক্ষা করা দরকার, শরীরকেও তেমনি ভাবে রক্ষা করা দরকার। যে-ঘরে বাস করছি সেখানে আজ দেয়ালের চটা উঠে গেল, কাল ছাদ ফেটে জল ঝরতে লাগলো, হয়তো একটা খুঁটি হেলে পড়লো, নয়তো কড়িকাঠে ঘুণ ধরলো,—এগুলো নিত্য হবেই, নিজের থেকে মেরামত ক'রে না নিলে চলবে কেন?

অতএব বাবার ইচ্ছাতেই আমার দাদা হয়েছেন সায়ান্টিষ্ট আর আমি হয়েছি ডাক্তার। লোকে বলে, ডাক্তার হওয়া আমার প্রকৃতিতে লেখা ছিল না, বাবা জোর ক'রে আমাকে ডাক্তার বানিয়ে দিয়েছেন। তার ফল নাকি সুবিধাজনক হয়নি।

আমার ছেলেবেলাকার অনেক ইতিহাসই বাবার স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো, অনেক কথাই এখনো মনে আছে। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে তিনি ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনে পায়চারী করতেন আর গম্ভীরকণ্ঠে স্তবগান করতেন:

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে—

শুনতে শুনতে প্রত্যহই আমার ঘুম ভাঙতো। কথাগুলোর অর্থ আমি ক্রমে ক্রমে জেনে নিয়েছিলুম। বিছানায় শুয়ে ভাবতুম এ কথনো হয় না কি? বোবার মুখে কথা ফুটে যাবে, খোঁড়া মানুষে পাহাড় ডিঙিয়ে যাবে, এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘটানোর ক্ষমতা কারো আছে না কি? প্রথমটায় সন্দেহ হোতো। তার পর মনে হোতো, নিশ্চয় এমন কিছু থাকতে পারে, নইলে বাবা রোজই ঐ এক ক[illegible]রেবারে বলেন কেন? আমার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, বাবা ক[illegible] বাজে কথা বলেন না। বাবাকে মনে করতুম আমার বাস্তব-লোকে[illegible]দর্শ, আর মাকে ভাবতুম অদৃশ্য স্বর্গলোকের দেবী।

সরকারি কাজে বাবাকে প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াতে হোতো। কখনো বা গোযানে-অশ্বযানে, কখনো বা ট্রেণে-ট্রেণে তিন চার দিন ঘুরে ঘুরে তিনি বাসায় ফিরতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো একজন তকমাপরা চাপরাশি আর আমাদের আচারনিষ্ঠ চটুলশিখাসমন্বিত তেওয়ারি। চাপরাশির সঙ্গে থাকতো থিয়োডোলাইট, ডাম্পি লেভেল, ঝাণ্ডা, শিকল, জরিপের লম্বা লম্বা ম্যাপ প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারির যাবতীয় যন্ত্র-সরঞ্জাম; তেওয়ারির সঙ্গে থাকতো রন্ধনাদির সরঞ্জাম আর গঙ্গাজল। রীতিমত হাটকোটপ্যাণ্ট প'রেই তিনি সর্বত্র যেতেন, কিন্তু দুবেলা আহ্নিক-পূজা না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না। খাদ্য সম্বন্ধে যে তাঁর বিশেষ বাচ-বিচার ছিল তা নয়, তেওয়ারি রন্ধনে বিশেষ পটু ছিল সেজন্যও বটে, আর ঐ আহ্নিকের গঙ্গাজল বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যেই তাকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নতুবা অন্যত্র খেতে তাঁর আপত্তি ছিল না। শুনেছি কেল্‌নারের হোটেলেও তিনি খেয়েছেন। কেউ এই নিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করলে তিনি বলতেন, ভিতরের ধর্মের সঙ্গে বাইরের খাদ্যের কী সম্পর্ক আছে?

মাঝে মাঝে কার্যপরিদর্শনে আসতো বাবার চীফ ইঞ্জিনিয়ার। একজন খাঁটি স্কচ্‌ম্যান, তার লম্বাচওড়া চেহারা। সে এলে তার থাকবার জন্যে

বাবা নিজের ঘরটা ছেড়ে দিতেন। তার সঙ্গে আসতো অনেক বাবুর্চি খানসামা। তা'রা নানা রকমের খাদ্য প্রস্তুত করতো, কাঁটা-চামচ-প্লেট পেয়ালা-বোতলে টেবিল ভরিয়ে দিতো। সাহেব মোটর সাইকেলে চ'ড়ে কাজ দেখে বেড়াতো আর নির্দিষ্ট সময়টিতে বাসায় ফিরে এসে খানা খেতে বসতো। কাঁটা-চামচ দিয়ে তার ভক্ষণ-প্রক্রিয়া দেখা আমাদের দুই ভাইয়ের পরম উপভোগ্য ছিল, আমরা দরজার ছিদ্র দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতুম। সে চ'লে গেলেই বাবার আহ্নিকের সরঞ্জামাদি সেই ঘরে ফিরে আসতো, বাবা আবার তাঁর নিজের ঘরটি অধিকার করতেন।

২

আমার মা নেই। খুব ছেলেবেলার থেকেই মা নেই। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি আমার মা ছিলেন অসামান্য রূপবতী আর গুণবতী। শুনতুম তিনি এখন আছেন স্বর্গে। বাবার ঘরে তাঁর একটি ছবি টাঙানো থাকতো, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতুম ঐ আমার মা, যে-মা একদিন জীবন্ত ছিলেন। লোকের মুখে মায়ের যে-সকল রূপৈশ্বর্যের ব্যঞ্জনা আর দয়াদাক্ষিণ্যের কাহিনী শুনতুম, কল্পনায় সেই সমস্ত ঐ কাচের আবরণ দেওয়া ছবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করতুম। চেয়ে চেয়ে দেখতুম মা যেন আমার দিকে চেয়েই হাসছেন, এখনই যেন জীবন্ত হ'য়ে কাচের আবরণ ভেদ ক'রে নেমে আসবেন। এখনই তিনি আমাকে কোলে তুলে নেবেন, যেমন ক'রে অন্য ছেলেমেয়েদের মায়েরা তাদের কোলে নেয়, এখনই বুঝি তাঁর বুকের ভিতরকার সেই স্নিগ্ধ মাতৃগন্ধটুকু আমি পাবো, যা থাকে সকল মায়েদের বুকের মধ্যে। আমি জানি সেই গন্ধের কথা, অনেক দিন স্বপ্নের মধ্যে তার আঘ্রাণ পেয়েছি। আমার বন্ধুদের মায়েরা আমাকে

কোলে নিতে চাইতো, আদর ক'রে খাবার দিতে চাইতো, করুণার স্বরে বলতো,—আহা তোমার মা নেই! আমি সে আদরও নিতুম না, সে খাবারও খেতুম না। বলতুম,—নিজেদের বাড়ি ছাড়া আমি আর কোথাও খাই না। আমার গলায় ঝুলতো একটা সোনার মাদুলি। লোকে বলতো, ওর মধ্যে আছে অক্ষয় কবচ, অতি শৈশবে নাকি মা ওটি আমার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন। বড় হ'য়েও অনেককাল পর্যন্ত সেই মাদুলি আমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিলুম। সেটি মাথায় ঠেকালেই আমি মায়ের হাতের বিশিষ্ট একটি স্নেহের স্পর্শ পেতুম। কতদিন কত অব্যক্ত দুঃখ-অভিমানের মধ্যে ঐ ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

আমাদের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন আমার এক দূরসম্পর্কের বিধবা জ্যাঠাইমা। তিনিও সুন্দরী। তবে মায়ের রূপের সঙ্গে তুলনা হয় না। গৌরবর্ণ ঋজু দেহ মুখে লাবণ্যের সঙ্গে একটা কাঠিন্য, বোধ করি ভিতরে ভিতরে তাঁর রূপ সম্বন্ধে আত্মচেতনা ছিল। মাতৃত্বময়ী রূপ আর মাতৃত্বহীন রূপে যে পার্থক্য আছে, এটা ছেলেবেলাতেও আমি বুঝতুম। বাঙালীর ঘরের বাল্য-বিধবাদের যে রূপ দেখা যায়, তার কোনো দান নেই, সে কেবল সঞ্চয়। কেন যে সে কঠিন তা দেখলেই জানা যায়।

জ্যাঠাইমাকে কখনো বেশি কথা বলতে দেখতুম না। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ ক'রেই থাকতেন, নিঃশব্দে নিজের কাজগু[illegible] ক'রে যেতেন। কাজের তাঁর সীমাসংখ্যা নেই। চাকরবাকরদের কোনো[illegible] করতেন না, যা-কিছু তাঁর করণীয় সমস্তই নিজের হাতেই করতেন। আম[illegible]র খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত আদর [illegible] আগ্রহ ছিল না। যেন সুশৃঙ্খলে সংসার চালাবার একটি নিখুঁত মানুষ-যন্ত্র। তাঁর কাজকর্মও ছিল যেমন নিখুঁত আর অনাড়ম্বর, বেশভূষা [illegible]ছিল তেমনি নিখুঁত আর অনাড়ম্বর। ধব্‌ধবে সাদা একখানি থান কাপড় পরতেন, তার নীচে থাকতো ধব্‌ধবে সাদা একটি সেমিজ। তার পরণের কাপড়

আর. সেমিজ কোনদিন মলিন দেখিনি। সর্বদাই তিনি শুভ্র এবং শুচি।

জ্যাঠাইমার বিলক্ষণ শুচিবাই ছিল। সে অসাধারণ কাণ্ড। দুনিয়ার সকল মানুষের এবং সকল জিনিষের স্পর্শ তিনি বাঁচিয়ে চলতেন, বাবার ঘরের ত্রিসীমানায় কখনো যেতেন না। কিসে যে তাঁর দেহ অশুচি হ'য়ে যায় আর কিসে যে তাঁর আহারে বিঘ্ন ঘটে তা আমরা অনেক চেষ্টাতেও বুঝতে পারতুম না। দিনের মধ্যে কতবার যে তিনি স্নান করতেন আর কাপড় ছাড়তেন তার সংখ্যা নেই। চাকরদের মুখে শুনেছি গভীর রাত্রে তিনি ঘুম থেকে উঠেও পুকুরে গিয়ে স্নান ক'রে আসতেন।

জ্যাঠাইমার শুচিবাই নিয়ে বাবা তাঁকে খুব বিদ্রূপ করতেন। দাদাতে আমাতেও তাঁকে এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার নিয়ে উত্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে আমোদ অনুভব করতুম। কিন্তু দেখেছি অদ্ভুত শক্তি তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনার। বার-ব্রত উপলক্ষে তিনি দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস ক'রে কাটিয়ে দিতেন, অথচ কর্তব্যে তাঁর কোথাও তিলমাত্র ত্রুটি ছিল না।

চাকরবাকরেরা জ্যাঠাইমাকে ভয় ক'রে চলতো। কিন্তু অনেকবার শুনেছি, তা'রা ওঁর সম্বন্ধে কি একটা গোপনীয় আলোচনা করতো, বাবার নামও সেই সঙ্গে অনেকবার উল্লেখ করতো। কথাগুলো ওরা ইঙ্গিতে বলাবলি করতো, সব ঠিক বুঝতে পারতুম না। মনে হ'তো যেন তার মধ্যে কোনো গূঢ় রহস্য আছে। আমিও একদিন রাত্রে ঘুম থেকে উঠে দেখি উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা আর জ্যাঠাইমা, অত্যন্ত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দুজনে কি কথা বলছেন? জ্যোৎস্না এসে পড়েছে,—ছবিটা এখনো আমার মনে আছে। আমার কেমন ভয় করতে লাগলো, নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেলুম।

চাকর চাপরাশি অনেক ছিল, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে একজনের কথা আমার মনে আছে। তার নাম কালীচরণ। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মাথায়

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে বসন্তের দাগ। বাবা তাকে আমাদের দেশ থেকেই এনেছিলেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে থাকতো, কখনো দেশে যেতো না। সবাইকেই সে ভালোবাসতো, কিন্তু বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখতো বাবার উপর। জ্যাঠাইমাকে সে চক্ষে দেখতে পারতো না। বাবার সমস্ত কাজ সে আগের থেকেই ক'রে রেখে দিতো, জ্যাঠাইমাকে তাঁর কিছুতে হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাইতো না। কথায় কথায় প্রায়ই বলতো—"ইস্ত্রীমানুষ না হলে কি সংসার চলে না? দিক না ওকে দেশে পাঠিয়ে, আমিই সব চালিয়ে নিতে পারবো।" কালীচরণের আর কোনো দোষ ছিল না, কেবল একটি দোষ তার ছিল, মাইনে পেলেই সে দারুণ মদ খেতো। মাতাল হ'য়ে সে একেবারে বেসামাল হ'য়ে পড়তো, আর সারাক্ষণ কেবল কাঁদতো। যদি জিজ্ঞাসা করতুম—"কালীচরণ কাঁদছো কেন, মদ খেয়েছো বুঝি?" সে তৎক্ষণাৎ জিভ কেটে বলতো—"রাম রাম খোকাবাবু, মদ কি খেতে আছে? আমি রস খেয়েছি।"

—"রস খেয়েছো তো কাঁদছো কেন?"

—*"আমার বৌ পালিয়ে গেল, তারই শোক লেগেছে গো বাবু!"*

—*"কোথায় পালালো?"*

—"হায় হায়, তাই কি জানি বাবু?"

এই ব'লেই সে কাঁদতে কাঁদতে গান ধরতো—

"এত সাধে করনু বিয়ে,
বৌ পালালো ফাঁকি দিয়ে,
এবার আমি বৌকে পেলে
সিন্দুকেতে রাখবো রে—"

কথাটা সত্য। কালীচরণ বিয়ে ক'রে বৌকে ঘরে রেখে চাকরী করতে এসেছিল, ফিরে গিয়ে দেখে বৌ পালিয়েছে। অনেক সন্ধান ক'রেও তাকে আর পাওয়া যায়নি।

কালীচরণের কান্না দেখে আমার মন তার প্রতি অসীম মমতায় ভ'রে উঠতো। ভয়ানক রাগ হোতো মেয়ে জাতটার উপর। যেমন ওরা নির্মম তেমনি অবিশ্বাসী। ওদের বাইরে একরকম, কিন্তু ভিতরে অন্যরকম। কালীচরণ এই কথাই বার বার বলতো।

কালীচরণের চোখ মুছিয়ে দিয়ে আমি বলতুম—"যে তোমাকে এমন কষ্ট দিয়েছে তার জন্যে তুমি আবার কাঁদছো? তুমিই তো বলো স্ত্রীলোক না হ'লেও আমাদের বেশ চ'লে যায়। তবে আবার কাঁদবে কেন?"

কালীচরণ আরো জোরে কেঁদে উঠতো। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলতো,—"চলে না খোকাবাবু, ইস্ত্রীলোক না হ'লে আমাদের কারোই চলে না। তোমারও না, আমারও না, বাবুরও না।"

আমি বলতুম—"তুমি নিজের মুখেই কতবার বলেছো, এখন আবার অন্য রকম কথা বলছো, কেন?"

কালীচরণ বলতো—"তখন মিথ্যেকথা বলেছি। এখন খাঁটি রস খেয়েছি কিনা, এখন বলছি খাঁটি সত্যিকথা।" আমি অবাক হ'য়ে ভাবতুম লোকটা দু'রকম কথা বলে কেন!

আমরা দুই ভাই কালীচরণের কাছে অনেক রকমের গল্প শুনতুম। যেদিন দুপুরে ইস্কুলের ছুটি থাকতো, যেদিন সকাল থেকেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নেমে ইস্কুল যাবার কোনো উপায় থাকতো না, কিংবা যেদিন মাষ্টারের শরীর অসুস্থ থাকতো, সেদিন আমরা কালীচরণকে ধ'রে গল্প শুনতে বসতুম। শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প, হরিদাস সাধুর গল্প, বিল্বমঙ্গলের গল্প, রুহিদাসের গল্প, আরো কত পার্থিব মানুষের অপার্থিব কাহিনী। শুনতে শুনতে আমরা চ'লে যেতুম এমন এক যুগের ভারতবর্ষে যেখানে সুন্দরী রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বও ছিল তুচ্ছ, সোনাকরা পরশপাথরও তুচ্ছ। শুনতে শুনতে আমরা ভাবতুম, সেই কালটাই ছিল চমৎকার আর এই কালটা বিশ্রী। এ কালে সুন্দরী রাজকন্যাও মেলে না আর পরশপাথরও পাওয়া

যায় না। যদি পাওয়া যেতো তবে আমিও একবার দেখিয়ে দিতুম কেমন ক'রে তা তুচ্ছ করতে হয়।

৩

ইস্কুলে আমরা দুভাই ছিলুম সকলের চেয়ে বিশিষ্ট। আমরা অবলীলাক্রমে ইংরেজী বলতে পারতুম, অমাদের মনে একটা আভিজাত্যের গর্ব ছিল, আমাদের বেশভূষায় ছিল তখনকার বাবুগিরির পারিপাট্য। চেহারা ভালো হ'লে আর লেখাপড়ায় দক্ষ হ'লে সহপাঠিরাও সেধে ভাব করে, আর শিক্ষকেরাও পক্ষপাতিত্ব করে। আমাদের দুই ভায়ের অনেক বন্ধু জুটেছিল, আর শিক্ষকদের কাছেও ছিল আমাদের সাতখুন মাপ। প্রায় প্রত্যেক বছরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন না একজন ফার্ষ্ট হতুম এবং প্রাইজ পেতুম। যে-বছর আমাদের কেউই প্রাইজ পেতুম না সে বছর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে যেতেন, আমাদের ঘরের মাষ্টারেরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতো। পরের বছর কেউ প্রাইজ পেলে তবে বাবার মুখে হাসি দেখা যেতো।

দাদা পড়তো আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে। দাদা একটু ভালোমানুষ-প্রকৃতির, আমার মতো এতটা চালাকচতুর নয়। একটা ঘটনা এখনো দাদাকে দেখলেই আমার মনে পড়ে। তখন নতুন স্বদেশীর যুগ বিলেতি বর্জনের হুজুগ উঠেছে। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি টানতে শিখেছে। একদিন টিফিনের সময় আমাদের নীচু ক্লাসের একজন মাষ্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বার্ডসাই খাচ্ছিলেন। দাদার হঠাৎ কি খেয়াল হোলো, পকেট থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে তাঁর সুমুখে ধ'রে বললে—"স্যার বিলেতি

জিনিষটা আপনার খাওয়া উচিত নয়। এই নিন, ওটা ফেলে দিয়ে স্বদেশী বিড়ি খান।"

মাষ্টারমশাই প্রথমে দাদার কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেলেন। তার পরে দাদার হাত ধ'রে হেড মাষ্টারের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। দাদার মুখটা ভয়ে একেবারে চূণ হয়ে গেছে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। মাষ্টারমশাই কিছু বলার পূর্বেই আমি হেড মাষ্টারকে বললুম—"দাদাকে এখানে ধ'রে আনা হয়েছে, কিন্তু দাদার বিশেষ কিছু দোষ নেই। মাষ্টারমশাই আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বিলেতি সিগ্রেট খাচ্ছিলেন। যদি খেতে হয় তো নিজেদের ওয়েটিং রুমে গিয়েই খাওয়া উচিত ছিল।' এই ব'লেই আমি দাদার হাত ধ'রে দাঁড়ালুম। বললুম—"ভয় কি দাদা, মার খেতে হয় তো আমরা দুজনে একসঙ্গে [illegible] খাবো। ইস্কুল ছাড়তে হয় তো দুজনে একসঙ্গেই ছাড়বো। শুধু তাই নয়, আমরা সকলে মিলে এই ইস্কুল বয়কট করবো। আগে দেখি হেডমাষ্টার মশাই ন্যায় বিচার করেন কিনা।"

এই কথার পর হেডমাষ্টার আর অভিযোগটা ভালো ক'রে শুনলেন না, দাদাকে একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিলেন আর শাসিয়ে দিলেন যে বাবাকে তিনি এই সব কথা লিখে জানাবেন। বলা বাহুল্য বাবাকে তিনি কিছুই জানান নি। বাবা যদি শুনতেন তা হ'লে আমাদের আর আস্ত রাখতেন না।

আর একবার দাদা দুষ্টুমি ক'রে পণ্ডিত মশাইয়ের চেয়ারে জিউলির আঠা মাখিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেই চেয়ারে ব'সে পণ্ডিত মশাইয়ের কাপড় এমন জুড়ে গেল যে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে অন্য কাপড় আনিয়ে পরতে হোলো। হেডমাষ্টার বললেন, এ কাজ যে করেছে সে যদি নিজে স্বীকার না করে তা হ'লে ক্লাসের সমস্ত ছেলেকে বেত খেতে হবে। দাদা [illegible] ইতস্ততঃ করতে লাগলো, অন্য

দের ভয়ে কিছু বললে না। আমি তখন হেড মাষ্টারের
বললুম যে আমিই আঠা লাগিয়েছি। সেবার আমাকে
ক ঘা বেত খেতে হয়েছিল। বেতের আঘাতে আমার হাত
বেরিয়ে গেল, তবু আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুজনেই আমরা ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় পড়তে গেলুম,—দাদা এক বছর আগে, আমি তার পরের বছর। কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া নেওয়া হোলো, জ্যাঠাইমা রইলেন আমাদের সঙ্গে। একজন মাষ্টারও রইলেন আমাদের বাসায়। ইতিমধ্যে বাবাও বদলি হলেন নতুন জায়গায়। যখনই তিনি মফঃস্বলে বেরুতেন তখনি কলকাতায় এসে আমাদের দেখাশোনা ক'রে যেতেন।

বছর চারেক আমাদের এই ভাবেই কাটলো। দাদা বি-এস্-সি পড়তে লাগলো, আমি আই-এস-সি পাস ক'রে মেডিকেল কলেজে ঢুকলুম। কলেজে পড়বার সময় আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব জুটেছিল। মাত্র কয়েক বছরের বন্ধু, তারপর কে কোথায় চ'লে গেছে কিছুই জানি না। একজন বন্ধু আমাদের খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছিল, সে নৃপেন। নৃপেন আমারও বন্ধু, দাদারও বন্ধু। কলকাতাতেই ওদের বাড়ি, ওর বাপ মা আমাদের খুবই ভালোবাসতেন, অনেকদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আমাদের খাওয়াতেন। ওরাও ব্রাহ্মণ, কলকাতার বনেদি বংশ। নৃপেন বাপের এক ছেলে, আর ওর একটি ছোটো বোন, তার নাম সরলা। নৃপেনের মায়ের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে সরলার বিবাহ দেন, যদিও তার বয়স তখন মাত্র বারো বছরের বেশি হবে না। কেন তাঁর এমন খেয়াল হয়েছিল তা জানি না, কিন্তু একদিন তিনি আমাকে বললেন যে সরলা তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, আমি যদি প্রতিশ্রুত হই তাহ'লে তিনি আমার পাশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সরলাকে বিবাহ করবার কথা আমার মোটেই ভালো লাগলো না, আমি তাঁকে

স্পষ্টই জবাব দিলুম যে এখানে আমার বিয়ে হ'তে পারে না, বাবা আমার জন্য পাত্রী ঠিক ক'রে রেখেছেন।

বিবাহ আমাদের দুই ভাইকে এক জায়গাতেই করতে হয়েছিল। বাবার একজন অন্তরঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ছিলেন, যিনি তাঁকে গুরুমুখ বলতেন। তাঁর দুটি মেয়ে, দুটিই সুন্দরী। মেয়ে দুটিকে আমরা জানতুম, বড়ো মেয়ের নাম পার্বতী, ছোটোর নাম পাঞ্চালী। বন্ধুর কাছে বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন যে দুই ছেলের সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন। বাবা বিপত্নীক মানুষ, অল্প বয়সেই ছেলের বিবাহ দিয়ে বৌ ঘরে আনা তাঁর অভিপ্রায় ছিল। দাদা বি-এস-সি পাশ করবার পরেই বড়ো মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

এর পরেই কলকাতার বাসা রাখা সম্বন্ধে নানারকম অসুবিধা উপস্থিত হোলো। বাবা বৌদিকে নিজের কাছে রাখতে চান, কাজেই সেখানে জ্যাঠাইমারও থাকা দরকার। আর আমরাও বললুম যে বাসায় থেকে আমাদের পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে, হষ্টেলে কিংবা মেসে থাকলে পড়ার সুবিধা হয়। কাজেই কলকাতার বাসা উঠে গেল। দাদা চ'লে গেল হষ্টেলে, আমি গেলুম মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেডিকেল মেসে।

এর মধ্যে আরো একটা ভিতরকার কথা আছে। দাদার সঙ্গে আমার চিরকাল ধ'রেই একটা প্রতিযোগিতা চ'লে আসছে। আমি দেখাতে চাই যে দাদার চেয়ে আমি ভালো, আর আমি জানি যে দাদাও নিশ্চয় তাই দেখাতে চায় যে আমার চেয়ে সে ভালো। এটা আমরা উভয়েই জানি, কিন্তু কেউ কাউকে প্রকাশ্যে বলিনা। প্রকাশ্যে আমরা দুজনেই নিজেকে অপরের চেয়ে ছোটো করি। এইজন্য পড়াশুনার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করবার বড় অসুবিধা হয়, অনেক সময় লুকিয়ে করতে হয়। যদিও দাদা পড়ছে সায়ান্স আর আমি পড়ছি ডাক্তারি, তবু পরীক্ষার ফলের দ্বারা পরোক্ষভাবের প্রতিযোগিতা চলে। জীবনের পরীক্ষায় আমরা যেন

দুই ভাই প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছি, কে ফার্স্ট হয় দেখতে হবে। কিন্তু অয় জন্যে দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হওয়া যায় না। একটু তফাতে তফাতে থাকাই ভালো।

৪

ব্যাঙ্ কাটার পর্ব শেষ ক'রে যখন মানুষের হাড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির পর্ব সুরু হোলো তখন আমি রয়েছি মেসে, পুরোপুরি একজন মেডিকেল ষ্টুডেন্ট। অ্যানাটমির বইখানা অতি প্রকাণ্ড, তার ছত্রে ছত্রে অসংখ্য ল্যাটিন নামগুলো ছড়ানো আছে। বোঝাও যেমন কঠিন, মুখস্থ করাও তেমনি কষ্টকর। তবু সে যে কী আনন্দ! টেবিলের ওপর হাড় ছড়ানো, বিছানার ওপর হাড় ছড়ানো, আমি অ্যানাটমি পড়ছি! দাদা আমার মেসে এসে এই সব দেখে যায়, আর নির্বাক গর্বে আমার বুকটা ভ'রে ওঠে। ডাক্তারি শিক্ষার মধ্যে এমন মনোহারিত্ব আছে, আগে আমি জানতুম না।

শীতকাল পড়তেই মড়া কাটা আরম্ভ হ'য়ে গেল। প্রাথমিক ডাক্তারি শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনার যুগ এই ডিসেক্শনের সময়টা। মড়া কাটতে প্রথম প্রথম অনেকের ঘৃণা হোতো, অনেকের মাথা ঘুরতো, কিন্তু আমার যেন ওতেই সবচেয়ে আগ্রহ। শরীরের প্রত্যেক অংশটি নিজের হাতে কেটে কেটে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবো,—যত সূক্ষ্ম জিনিষই তার মধ্যে লুকানো থাক, বই থেকে বর্ণনা প'ড়ে সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করবো, আমার ডিসেক্শনের ছবিটি বইয়ের ছবির সঙ্গে অবিকল মিলে যাবে,—এ একটা স্বতন্ত্র রকমের আর্ট, করতে করতে এতে নেশা লেগে যায়। বেলা এগারটায় ডিসেক্শন হলে ঢুকতুম, দিনের আলো অস্পষ্ট হ'য়ে না এলে

সেখান থেকে বেরুতাম না। রবিবারেও কামাই ছিল না, সকলে সেদিন যেতো না, কিন্তু আমরা কয়েকজন যেতুম।

একদিন দাদাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ডিসেক্‌শন দেখালুম। দাদা নাকে রুমাল দিয়ে বললে—"বড় বিশ্রী গন্ধ।"

ডিসেক্‌শন হলের একটা গন্ধ আছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সিগারেট খেলে আর সে গন্ধ টের পাওয়া যায় না। এই সময়েই আমি সিগারেট খেতে শিখেছিলুম, এক একবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসতুম।

নাকে রুমাল দেওয়া অপরিচিত ছেলে দেখে আমাদের ডিমনস্ট্রেটর এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এই ছেলেটি কে হে শ্রীকুমার?"

—"আমার দাদা।"

—"নাম কি তোমার?"

—"নন্দকুমার মুখার্জি।"

—"কী পড়ো?"

"—এম্, এস-সি পড়ছি।"

—"সায়ান্সের ছাত্র হ'য়ে ডিসেক্‌শন দেখে নাকে কাপড় দাও? তোমাদের ল্যাবরেটরিতে কোনো গন্ধ নেই?"

—"সে আলাদা, আর এ গন্ধ আলাদা।"

—"তা হ'লেও যাদের মনে সায়ান্টিফিক কৌতূহল জেগেছে তাদের কোনো গন্ধই নাকে লাগে না। নাকের রুমাল নামিয়ে ফেলো, এখানে তোমার ঐ উদাহরণটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না।"

আমি একটু অপ্রস্তুতের ভাব দেখালুম, কিন্তু মনে মনে আমার কী আমোদই হোলো!

অ্যানাটমি ফিজিওলজি আমার ভালোই লাগতো, কিন্তু মুশকিল হোলো মেটিরিয়া মেডিকার ডোজ মুখস্থ করা নিয়ে। কিছুতেই মনে রাখা যায় না কোন্ ওষুধের কত মাত্রা। নানারকমের অদ্ভুত ছড়া তৈরি করা আছে

ওষুধের নাম আর তার ডোজ মনে রাখবার জন্যে, আমি সেইগুলো প্রাণপণে মুখস্থ করতুম। তবুও মাঝে মাঝে গোলমাল হ'য়ে যেতো।

দুবছর অমানুষিক পরিশ্রম করলুম। খেটে খেটে শরীর রোগা হ'য়ে গেল। অ্যানাটমিতে সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়াতে আর ডিসেক্‌শনে আমার হাত খুব ভালো ব'লে আমি প্রোসেকটর হয়েছিলুম, সুতরাং আমাকে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে আরো বেশি খাটতে হোতো। প্রফেসর যা লেকচার দেবেন তা প্রত্যেক দিন আগের থেকে আমাকে ডিসেক্‌শন ক'রে রাখতে হোতো, তা ছাড়া নিজের পড়া তো আছেই।

কিন্তু এত পরিশ্রম ক'রেও পরীক্ষার সময় ভীষণ ভাবনা উপস্থিত হোলো। মানুষের দেহের সমস্ত অ্যানাটমি দুবছর মাত্র প'ড়ে সম্পূর্ণ মনে রাখা অসম্ভব। আজ যেটা মুখস্থ করি কাল সেটা মনে থাকে না। অথচ অ্যানাটমির কোনো জায়গাটা অপ্রয়োজনীয় নয়, সবই প্রয়োজনীয়। ফার্ষ্ট আমাকে যেমন ক'রে হোক হতেই হবে। নইলে কলেজেও মুখ দেখানো যাবে না, দাদার কাছেও মুখ দেখানো যাবে না।

অ্যানাটমির পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। পরীক্ষক তিন জন বিভিন্ন কলেজের প্রফেসর, তাদের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াবে একজন অসহায় ছাত্র। তিনজনের উদ্দেশ্য তিন রকম। পরীক্ষার্থী যাঁর কলেজের ছাত্র নয় তিনি চাইবেন ঠকাতে, আর যাঁর কলেজের সে ছাত্র, তিনি চাইবেন বাঁচাতে। কাজে কাজেই এখানে বিদ্যা-পরীক্ষা ততটা হয় না যতটা হয় ভাগ্য-পরীক্ষা। স্বাভাবিক জিনিষকে বিকৃত ক'রে দেখানো হয়, ভুল প্রশ্ন ক'রে পরীক্ষার্থীকে বিব্রত করা হয়, সুতরাং যতই তার জানা থাকুক, নিজের জ্ঞান সম্বন্ধেই তার সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাই হোক, ভাগ্যক্রমে অ্যানাটমিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেই ডাক্তারি উপাধি পরীক্ষার দ্বিতীয় প্রস্থে আমি উত্তীর্ণ হলুম।

এর পরেই বিবাহ। আমি আপত্তি করেছিলুম, বলেছিলুম যে ও সকল হাঙ্গামা করলে এখন পড়াশুনার ক্ষতি হবে, পাশ করা পর্য্যন্ত ওটা

স্থগিত থাক। কিন্তু বাবার অভিমত ছিল অন্যরকম। তিনি বললেন, যে বয়সের যা স্বাভাবিক প্রয়োজন সেই বয়সেই তা করা উচিত। বেশি বেলা পর্যন্ত অভুক্ত থাকা আর বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা কারোই উচিত নয়।

অগত্যা আমাকে প্রথামত টোপর মাথায় দিয়ে বর সেজে বিয়ে করতে হোলো। যথারীতি গাঁটছড়া বেঁধে বৌ ঘরে আনলুম। মনে আছে আমার সেই কনকাঞ্জলির ব্যাপারটা। দেশের এক দূরসম্পর্কীয় খুড়ীমার আঁচলে টাকাসমেত এক পাত্র ধান ঢেলে দেবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কী আনতে যাচ্ছ বাবা?" প্রথামত আমাকে জবাব দিতে হোলো—দাসী আনতে যাচ্ছি।" কিন্তু মনে মনে হাসলুম।

পাঞ্চালী সুন্দরী,—বৌদির চেয়েও সুন্দরী। বৌদিদি হাসতে হাসতে এসে জিজ্ঞাসা করলে—

—"কি গো ঠাকুরপো, বৌ পছন্দ হয়েছে?"

—"ও তো আমার অনেক দিন থেকেই চেনা, তবে আবার এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

—"তখন ও বৌ হয় নি, এখন বৌ হয়েছে। তোমরা বলো অচেনা বৌএর চেয়ে চেনা বৌ বেশি ভালো লাগবার কথা। তাই জানতে চাইছি, সত্যি সত্যি তোমার পছন্দ হোলো কিনা।"

—"দাদার যদি তোমাকে পছন্দ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমারও ওকে পছন্দ হয়েছে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।"

—"এতো হেঁদো কথা হোলো। লজ্জায় কাজ কি, আসল কথাটা পরিষ্কার বলেই কেন না?"

—"তুমিই বা এত জানতে চাইছো কেন? পছন্দ না হ'লে কি তুমি বদলে দিতে পারবে? তা যদি পারো তাহ'লে বলি।"

—"চেষ্টা করতে পারি। কেন, পছন্দ হয়নি বুঝি?"

—"না, ওর চেয়ে আরো সুন্দরী হ'লে ভালো হোতো।"

—"ওঃ, ওর চেয়ে সুন্দরী? তুমি একেবারে মেম সাহেব চাও নাকি? তাহ'লে এখানে বিয়ে না ক'রে বিলেত গিয়ে বিয়ে ক'রে আনলেই পারতে। তুমি তো মেডিকেল কলেজে পড়ো, সেখানে অনেক মেম সাহেব আছে। তাই একটা বেছে নিলে না কেন?"

বৌদিদি মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে যায়। আমি তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনলুম। বললুম—

—"কথাটা তুমি বুঝলে না, মিছিমিছি রাগ করলে। আমি বলছিলুম যে ওর চেয়ে তুমি বেশি সুন্দরী। ওর বদলে তুমি হলেই পছন্দটা বেশি হোতো। এ কথা তো আর এখন বলা যায় না, তাই একটু ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছিলুম।"

—"যাও যাও, আর চালাকি করতে হবে না।"

বৌদিদি প্রস্থান করলো, কিন্তু এবারকার রোষটা কৃত্রিম। রূপের সুখ্যাতি শোনবামাত্রই ওরা খুশি হয় জানি। দেখলুম যে বাহুল্য ক'রে বললেও খুশি হয়।

কিন্তু এটা জানতুম না যে রূপের গর্বকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। রূপ আমি ভালবাসি। সে কথা যে লুকিয়ে রাখতে হয় তা জানি না। পাঞ্চালীর রূপ খাঁটি বাঙালীর রূপ। তার লাবণ্যে সেই প্রাচীন বিশিষ্টতা পূরা মাত্রায় আছে যা নিয়ে বাঙালী সুন্দরীদের একটা আভিজাত্য গ'ড়ে উঠেছে, যা বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানারকম ভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। পাঞ্চালীর চিবুকের গঠনে কণারক-ভাস্কর্যের কোমলতা আছে, গ্রীবাভঙ্গিতে মরালের লালিত্য আছে, চোখের দৃষ্টিতে আম্রপল্লবের স্নিগ্ধতা আছে,—দেখলেই আমার গাঁয়ের ছবির হাথ দুটো মনে পড়ে। আর তার গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল কিন্তু উগ্র নয়, গৌরবর্ণের উপর অপরূপ একটি স্নিগ্ধ শ্যামলের ছায়া, যা বাংলাদেশ ছাড়া বোধকরি

আর কোথাও নেই। বিয়ের পর পাঞ্চালী আমাদের বাড়িতে সাতদিন ছিল। সেই কয়দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমি খুব ভাব [illegible] নেবার চেষ্টা করলুম। একদিন কাব্য ক'রে বললুম—

—"দেখ পাঞ্চালী, তুমি অতি সুন্দর। আমার থেকেই [illegible] তুমি সুন্দর। তোমাকে পেয়ে আমি ভাগ্যবান।"

সে প্রসন্ন হ'য়ে উঠলো। বললে—"সকলেই ঐ কথা বলে যে আমি সুন্দর। আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা কি বলেন জানো?"

—"কী বলেন?"

—"বলেন আমার যে বর হবে তার চোখ আমাকে দেখে একেবারে জন্মের মতো ঝলসে যাবে। জীবনে আর সে কারো দিকে ফিরেও চাইতে পারবে না।"

বুঝলুম পাঞ্চালীর মনে একটা রূপের গর্ব আছে। তা থাক, তাতে আর এমন দোষ কি? সম্পদ যার আছে, গর্ব তার কিছু হবেই।

৫

ফোর্থ ইয়ারে যখন আমি পড়ছি, দাদা তখন কৃতিত্বের সঙ্গে এম্.এস্‌-সি পাশ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রফেসারি চাকরি পেয়ে গেছে। আমাদের দেশে সায়ান্স শেখার এই হোলো যথেষ্ট সার্থকতা, পাশ ক'রেই একটা প্রফেসারি পাওয়া কম গৌরবের কথা নয়। অনেক মেধাবী যুবকের এই সৌভাগ্য ঘটে না, অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পাশ ক'রেও ঘরে বেকার ব'সে থাকতে হয়। দাদার এই চাকরি হওয়াতে বাবা খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন।

আমার পরিশ্রম তখন অনেক বেড়ে গেছে। অনেক রকমের পড়বার বিষয়, অনেক মোটা মোটা বই, অথচ পড়বার সময় কম। রোজ সকালে

হাসপাতালে যেতে হয়, মাঝে মাঝে রাত জেগে ডিউটি করতে হয়। দুপুরে নানা রকমের লেকচার আর ল্যাবরেটরি। সময়ের বড় অকুলান।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাঝে মাঝে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি। তখন লেখাপড়া ফেলে শ্বশুরবাড়ি পালাই। আমার শ্বশুর খড়গপুরে বদলি হ'য়ে এসেছেন। কলকাতা থেকে অল্প সময়ের পথ, উইক্এণ্ডে শুক্রবার রাত্রে গিয়ে সোমবার সকালে ফিরে এলে বিশেষ কামাই হয় না। সেখানে গিয়ে দুদিন কাটিয়ে এলেই মনটা চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। শাশুড়ী খুব যত্ন করেন, আর বৌদিদি আমোদে আহ্লাদে দিনরাত অন্যমনস্ক ক'রে রাখেন। একে বৌদিদি, তাতে শ্যালিকা। রসিকাসুলভ অস্ত্রশস্ত্রাদি তিনি আমার জন্যে রীতিমত শান দিয়ে রাখেন। তাঁর ব্যবহারটি সরস, এমন একটা সখ্যভাব আছে যে অনেক সময় আমার মনে হয় পাঞ্চালীর চেয়ে হয়তো তাঁর সঙ্গটা পাওয়াই বেশী লোভনীয়।

পাঞ্চালীর কথা বলাই বাহুল্য। যতবার যাই ততবার তার রূপ যেন নতুন ক'রে দেখতে পাই। আমিও জানি কোন্ আকর্ষণে আমি তার কাছে যাচ্ছি, আর সেও জানে কোন্ আকর্ষণে সে আমাকে টানছে। আকর্ষণী শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে নেবার তার অনেক রকমের কৌশল জানা আছে। সে জানে কোন্ সময়ের জন্য ফুলের মালা গেঁথে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখতে হয়। কবে আমি বলেছিলুম কোন্ রঙের শাড়িখানা তাকে মানিয়েছে সে-কথা সে মনে রাখে, কালো টিপ আমি ভালোবাসি মনে ক'রে সে কালো টিপ পরে, পাতাকাটা চুল আমি দেখতে পারি না তাই সে টান ক'রে চুল বাঁধে। আমার যেমন ভালো লাগে তেমনি ক'রেই সে সাজে, আর বারে বারে জিজ্ঞাসা করে—"দেখতো ঠিক হয়েছে কিনা!"

বৌদিদি বলে—"দেখেছো তো ঠাকুরপো, তুমি এলেই বোনটির আমার কেমন ভোল বদলে যায়! পাতা কাটা না হ'লে মেয়ের পছন্দই হোতো না,

কিন্তু এখন যতই টেনে চুল বাঁধি তবুও বলবে আলগা হচ্ছে। তুমি এলে ও যে আমাদের কী করবে তা ভেবেই পায় না।"

—"আর তুমি বুঝি দুঃখিত হও আমি এলে?"

—"তা কেন? বোনের কথা হচ্ছে বোনের কথাই হোক, তার মধ্যে আমায় নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?"

—"অপরাধ হয়েছে। তা দুঃখ করতে আর হবে না, তোমারও আমোদে দিশাহারা হ'য়ে ওঠবার মানুষটি আগামী সপ্তাহে এখানে আসছেন, খবরটা জেনে দুঃখনিবারণ করো।"

—"তুমি এলে বুঝি আমার আমোদ হয় না মনে করো? সত্যি বলছি, তুমি এলেই আমি বরং বেশি খুশি হই। পেট ভ'রে দুটো গল্প ক'রে বাঁচি।"

—"দাদার সঙ্গে বুঝি গল্প করতে পাওনা? কথা কইতে লজ্জা করে?"

—দূর, তা কেন? আমার অতো লজ্জাটজ্জা নেই। কিন্তু তোমার দাদার সঙ্গে মোটে গল্প জমেই না। তিনি কেবল বলবেন তাঁর কলেজের কথা। আর আমি যদি কিছু বলতে যাই, অমনি বলবেন, বাজে বকছি কাজে কাজেই আমার রাগ ধ'রে যায়, আমিও চুপ ক'রে থাকি, তিনিও চুপ ক'রে থাকেন।"

—"তুমি বলতে চাও যে দাদার চেয়ে তোমার আমাকেই বেশি পছন্দ? কথাটা তো বড় সুবিধার নয়!"

—"তোমার দাদাও তো সেই কথা বলেন। তাঁর মুখে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না। তিনি বলেন তুমি যখন ডাক্তার হবে তখন দুই ভাই কলকাতায় একটা বাসা নিয়ে একসঙ্গে থাকবে, আর আমি তখন সাধ মিটিয়ে তোমার সঙ্গে যত খুশি গল্প করতে পাবো। আমি হবো বাড়ির গিন্নি, আর তুমি হবে আমার হুকুমের ঠাকুরপো, যা হুকুম করবো তাই শুনবে। সে যা মজা হবে তা আমিই জানি।"

দেখাসাক্ষাৎ ছাড়া চিঠি লেখালেখিও যথেষ্ট হয়। আমি চিঠি লিখি পাঞ্চালীকে, সে উত্তর দেয়। একদিক থেকে যায় "প্রিয়তমাসু"—আর একদিক থেকে আসে "শ্রীচরণেষু"। একদিক থেকে যায় চুম্বন ও ভালোবাসা, আর একদিক থেকে আসে শতকোটি প্রণাম। যে চিঠি আসে তার ভাষা আলাদা, ভঙ্গি আলাদা,—যে-মানুষ লেখে তার সঙ্গে চিঠির মিল নেই। বৌদিদিও লেখে চিঠি, পাঞ্চালীর চিঠির খামের মধ্যে। তার ভাষা আবার স্বতন্ত্র।—ভাই ঠাকুরপো, অনেক দিন দেখি নি, মন কেমন করচে, চ'লে এসো, আমার রাগে যায়-আসে না কিন্তু দেরী হ'লে এবার পাঞ্চালী রাগ করবে,—ইত্যাদি। আমি পাঞ্চালীর চিঠিতেই সব কথার জবাব লিখি, বৌদিদিকে স্বতন্ত্র চিঠি কিছু আর লিখিনা।

আমার ছাত্রজীবনের মধ্যে এইটুকুই বৈচিত্র। এইটুকুর জোরে আমি পরিশ্রম ক'রেও ক্লান্ত হই না। মেসে অনেক ছেলের সঙ্গে থাকি, লক্ষ্য ক'রে দেখি, সকলেই যে আমার মতো পরিশ্রম করে তা নয়। ছাত্রদের মধ্যে দুটো টাইপ আছে। একদল ছাত্র আমারই মতো নিয়মিত পরিশ্রম ক'রেও সময়ের সঙ্কুলান করতে পারে না, আর একদল ছাত্র দিনের পর দিন বইয়ের পাতাই খোলে না, নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা দেয়, গল্প করে, মেয়েদের সম্বন্ধে জোর গলায় নানারকমের আলোচনা করে। ছাত্রজীবন তাদের খুব স্ফূর্তিতেই কাটে। আমি ভাবি, পরীক্ষায় এরা নিশ্চয় ফেল করবে। কিন্তু দেখা যায় ওদের মধ্যেও অনেকে অবলীলাক্রমে পাশ করে, আবার যারা পরিশ্রম করে তাদের মধ্যেও অনেকে বছরের পর বছর ফেল করে। পরিশ্রমের সঙ্গে পাশ করার কোনো সম্পর্ক নেই।

আরো একটা জিনিষ আমি কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করেছি। প্রায়ই দেখি ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের একটা অস্বাভাবিক রকমের ভাব। একদল ছাত্র থাকে তাদের আর কোনো কাজ নেই, মেয়েদের কাছেই তা'রা ঘোরে, সর্বদাই তাদের কিছু সাহায্য করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে, দুটো কথা

কইবার যদি সুযোগ পায় তবে যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এরা যে অজ্ঞ তাও নয়, নির্বোধ তাও নয়, বরং রীতিমত বুদ্ধিমান আর অতিরিক্ত রকমের বিনয়ী। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে এদের ব্যবহার এতই অস্বাভাবিক যে নিতান্তই চোখে ঠেকে। মেয়েদের দিকে দেখি, তাদের মধ্যেও জনকয়েক এমন আছে যারা পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গপ্রিয়। ইচ্ছাপূর্বক তা'রা ছাত্রদের সঙ্গে কৌশলে আলাপ জমায়। ছাত্রেরা তাতেই পরম অনুগৃহীত বোধ করে এবং তাই নিয়ে গৌরব করে। আমি এ দুচক্ষে দেখতে পারতুম না। মনে করতুম এটা ওদের চরিত্রের দৈন্য, মানসিক রুচির অভাব। ওদের ঘরে কি পাঞ্চালী কিংবা বৌদিদির মতো কেউ নেই?

৬

ছয় বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর যেদিন আমার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল সে দিনটার কথা এখনো আমার মনে আছে। ছাত্রজীবন যে কখনো ঘুচবে এমন যেন আশাই ছিল না। মনে করতুম যে বারেবারেই ফেল করতে হবে আর বারেবারেই পরীক্ষা দিতে হবে।

পরীক্ষাগুলো কী কঠিন! কোনোটাই কম নয়। প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই স্বতন্ত্র রকমের জটিলতা। সব চাইতে প্যাথলজিকে আমি যমের মতো, ভয় করতুম। অন্যান্য বিষয় যতই কঠিন হোক, তাতে কিছু উপস্থিতবুদ্ধি খাটে, কিন্তু প্যাথলজিতে কিছুই খাটে না। কেমন ক'রে তা জানি না, কিন্তু পরীক্ষায় আমি উচ্চস্থান অধিকার করলুম, আর আশ্চর্যের কথা এই যে প্যাথলজিতেই আমি ফার্স্ট হলুম।

ভালো ভাবে যারা পাশ করে তা'রা প্রায়ই হাঁসপাতালে অস্থায়ী চাকরি পায়, তাতে তাদের ব্যবহারিক বিদ্যা আয়ত্ত করবার অনেক সুবিধা হয়।

এদের মধ্যে যদি আবার তেমন কেউ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারে তা'হলে অস্থায়ী পদে থাকতে থাকতে স্থায়ী চাকরী হবারও সম্ভাবনা থাকে।

আমি প্রথমেই পেলুম হাউস ফিজিশিয়ানের পদ। এটা আমার পক্ষে খুব সৌভাগ্যের কথা। ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখলুম যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মতো বিদ্যা আমার থাকতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক ডাক্তারি আমি কিছুই জানি না। দেখলুম যে ডাক্তারি করার দ্বারাই প্রকৃত ডাক্তারি শেখা যায়, বই পড়ার দ্বারা নয়। চাকরিতে ঢুকে আমি প্রকৃত ডাক্তারি শিখতে আরম্ভ করলুম।

কিন্তু ঐ দিকটা শেখবার আগেই আমি ডাক্তারির অপর একটা দিক বেশ ভালো ভাবেই শিখে নিলুম। সে হোলো ডাক্তারির আদব-কায়দা। আসল কাজে কাঁচা থাকলেও ঐ বিষয়ে আমাকে পাকা হ'তে হবে, লোকচক্ষে আমাকে দেখাতে হবে যে আমি একজন দস্তরমতন ডাক্তার, অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। বাবাও কোটপ্যান্ট পরেন, কিন্তু আমার পোষাক তেমন ঢিলেঢালা-গোছের হ'লে চলবে না। আমার পোষাক এমন নিখুঁত হবে যাতে হাঁসপাতালের নার্সরা তাচ্ছিল্য না করে, ছাত্রছাত্রীরা যাতে সমীহ করে। নেকটাইটি নিভাঁজভাবে বাঁধা চাই, সেটির একটি টাই পিন দিয়ে সেটি নিপুণভাবে আঁটা চাই, গলার কলার যেন অযথা কোথাও দুমড়ে না যায়, প্যান্টের ভাঁজটা যেন সোজা থাকে, জুতোর পালিশ যেন চক্চক্ করে,—প্রসাধনের অনেক রকমের ব্যাপার আছে। সকালের পোষাক হবে একরকম, বিকেলের পোষাক হবে তার থেকে একটু অন্যরকম। ডাক্তারি প্রসাধনের পর্বটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়, তার জন্যও রীতিমত সাধনা করতে হয়। পোষাকের দিকেই তখন আমার অদ্ভুত ঝোঁক। প্রত্যহ দুবেলা এই নিয়ে আমার আধঘণ্টা ক'রে সময় লেগে যায়, আর চাকরিতে যা উপার্জন করি তার অধিকাংশই ওতে ব্যয় হ'য়ে যায়। তা হোক, যা-তা জিনিষ কেনাও যায় না আর যেখানে-সেখানে

তা খোলাই করাও যায় না। আমি যে গৌরবের কাজ করছি তার আভিজাত্যটা আমাকে বজায় রাখতেই হবে।

আমার পূর্বপরিচিতেরা আজকাল আমাকে দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। দাদার বাসায় ঐ পোষাকে অনেকবার গেছি। দাদা বলে—"ডাক্তার হ'য়ে তোর চেহারাটাও বদলে গেছে, যেন আমার চেয়েও অনেক বড়ো হ'য়ে গেছিস। তোর এই কোটের কাপড়টা কিসের রে? এণ্ডি না ভাগলপুরি?" আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলি—"ওটা চায়না সিল্ক।"

কয়েকবার শ্বশুরবাড়িও যাওয়া হয়েছে ঐ পোষাকে। তাতে আমার খাতির আরো বেড়ে গেছে। বৌদিদি বলে—"কী চমৎকার তোমাকে মানিয়েছে ঠাকুরপো! ঠিক যেন একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার। সকলের চেহারায় কি এ পোষাক মানায়? তোমার দাদাকেও তো দেখেছি কোটপ্যান্ট পরতে, কিন্তু সে দেখলেই মনে হয় যেন খালাসি। হ্যাট মাথায় দেওয়া তোমার দাদাকে মোটেই মানায় না, কিন্তু তোমাকে ওতে খুব সুন্দর দেখায়।" এই ব'লে বৌদিদি স্বহস্তে আমার হ্যাটটা বুরুষ দিয়ে ঝেড়ে দেয়।

পাঞ্চালী কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে—"এত রকমের পোষাক বুঝি তোমাকে পরতেই হয়, তা নইলে হাসপাতালের মেয়েরা বুঝি নিন্দে করে?"

—হাঁ, কে তোমাকে বললে?"

—"দিদি বলছিলো।"

—"ঠিক তাই। শুধু মেয়েরা কেন, পোষাক ভালো না হ'লে সকলেই নিন্দে করে। নইলে কি আর আমি ইচ্ছে ক'রে এত পরি?"

—"তা হোক বাপু, এ পোষাকের চেয়ে সাদা কাপড়-জামাতেই তোমাকে ভালো দেখায়। দেশী পোষাকে মনে হয় ঘরের লোক, আর এ পোষাকে মনে হয় যেন বাইরের অপর লোক।"

কথাটা সত্য। পোষাক যে অনুকরণ মাত্র, এ কথা আমি মনে মনে বুঝতুম। পোষাকে যেমন আসল চেহারাটাকে চাপা দিয়ে অন্যরকম দেখায়, ওতে তেমনি আসল চরিত্রটাকেও চাপা দিয়ে অন্যরকম ক'রে তোলবার সম্ভাবনা আছে। সর্বদা সাবধান থাকতুম যে পোষাকের সঙ্গে চরিত্রের পরিবর্তন আমি কিছুতেই হতে দেবো না। অবস্থাগতিকে পোষাক-পরিচ্ছদেরই অনুকরণ করি মাত্র, কিন্তু আমার চরিত্র আর ব্যবহার থাকবে আমার নিজস্ব। প্রায় দেখি অন্যান্য ডাক্তারেরা নার্সদের সঙ্গে মেলামেশা করে, হাসিমুখে অতিবিনয়ের সুরে তাদের সঙ্গে কথা বলে, প্রফেসরদের কাছে অনাবশ্যক "স্যার স্যার" ক'রে সমীহ দেখায়, কিন্তু রোগীদের সঙ্গে কথা কয় উচ্চ মেজাজের ভঙ্গিতে। এই রকমের ব্যবহার আমার স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে অহেতুক মেলামেশা আমি স্বভাবত তেমন পছন্দই করি না। নার্সদের সঙ্গে আমি খুব কম কথা কইতুম। ওদের প্রতি আমার কেমন একটা বিজাতীয় ভাব ছিল, আমি সাধ্যমত ওদের এড়িয়ে চলতুম। কাজের কোনো ত্রুটি দেখলে আমি কখনই ওদের ক্ষমা করতুম না। ওদের মহলে আমার সম্বন্ধে এ কথা প্রচার হ'য়ে গিয়েছিল, ওরা আমার নাম রেখেছিল—ডক্টর বোয়ার মুখার্জি।

আমার এ রকম নামকরণ হবার আরো একটা কারণ আছে। একদিন দৈবাৎ একটা দুর্লভীয় ঘটনা আমার নজরে পড়ে যায়। হাঁসপাতালে যে-ওয়ার্ডে আমি কাজ করতুম সেটা তিন তলায়। সেখানে উঠবার দুটো সিঁড়ি আছে। একটা সদর সিঁড়ি, সেটা দিয়ে সাধারণত সকলেই যাতায়াত করে। আর একটা কোণের দিকে লোহার সরু ঘোরানো সিঁড়ি, সেটা যদিও অপ্রশস্ত আর অন্ধকার, তবু হাঁসপাতালের পিছন দিক থেকে শর্টকার্ট হয় ব'লে আমরা দিনের বেলা কেউ কখনো সেটা দিয়ে যাতায়াত ক'রে থাকি। ছোট্ট একটি কুঠুরীর মধ্য দিয়ে গিয়ে খানিকটা সরু গলিপথ পার হ'য়ে তবে ঐ সিঁড়িটা পাওয়া যায়। এই পথে সাধারণত কেউ যায় না।

তার কারণ একে ঐ সরু গলিটা দিনের বেলাতেই রাত্রের মতো অন্ধকার, তাতে আবার ঐ সিঁড়ির নীচের অপরিসর ঘরটুকু হাসপাতালের পরিত্যক্ত দ্রব্যের গুদামের মতো ব্যবহার হয়। প্যাকিং বাক্স, ভাঙা লোহার খাট অব্যবহার্য স্ট্রেচার, বড় বড় টিনের ড্রাম প্রভৃতি সেখানে ইতস্তত ছড়ানো। অসতর্ক ভাবে ঢুকলে সেখানে আঘাত পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তা ছাড়া ঐ পথ দিয়ে বেরুলে হাঁসপাতালের পিছনের দিকেই গিয়ে পড়া যায়, সদরের দিকে নয়। সেইজন্যে যদিও সিঁড়িটা আছে, তবু তার ব্যবহার খুব কম।

সেদিন দুপুরে দৈবাৎ আমি ঐ সিঁড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম। বেলা অনেক হয়েছে, সকালের কাজকর্ম সেরে ডাক্তার এবং ছাত্রেরা প্রায় সকলেই হাঁসপাতাল থেকে চ'লে গেছে। আমিও বাসায় যাবো বলে নেমে এসেছিলুম, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল একটা কাজ বাকি রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি তাই আমি ঐ পথেই ঢুকে পড়েছিলুম। সিঁড়ির কাছে যেতেই হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে একটা শব্দ হোলো, যেন প্যাকিংবাক্সে কেউ ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। জায়গাটা অন্ধকার, তবু ভালো করে চেয়ে দেখি দুজন মানুষ ধাক্কাটা সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম—"কে তোমরা?" কেউ কোনো জবাব দেয় না। আমি তাদের ধ'রে বাইরে নিয়ে গেলুম। দেখি একজন সিনিয়র ক্লাসের ছাত্র, আর একজন ছাত্রী। ছেলেটিকে আমি চিনি, তার নাম পুলিনবিহারী।

—"ওখানে তোমরা কী করছিলে?"

—"আমি স্যার, ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলুম পথে ওর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল তাই দুটো কথা বলছিলুম।"

কৈফিয়ৎটা অত্যন্ত বাজে, ভয়ে দুজনের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। আমি বললুম—"প্রিন্সিপ্যালের কাছে চলো, সেখানে গিয়ে জবাব দেবে।"

—"না স্যার, দুটি পায়ে পড়ি, এবারটা ছেড়ে দিন।"

হলো যায় আমার কিছুই হোলো না। ভাবলুম ওদের কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। অনুনয় বিনয় উপেক্ষা ক'রে আমি ওদের দুজনকে প্রিন্সি-প্যালের কাছে ধ'রে নিয়ে গেলুম। ছেলেটির ফাইন হ'য়ে গেল, আর মেয়েটিকে শাস্তি দেবার জন্যে লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে কড়া হুকুম গেল।

এ সংবাদ চারদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। ঐ ছাত্র আর ছাত্রীটি লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারতো না। ওদের দুজনকে আর কখনো একত্রে দেখা যায়নি।

৭

আমি কাজ করতুম কর্ণেল লাইটের ওয়ার্ডে। তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমি খোশামোদ করি না, আমি কর্তব্যে কখনো ত্রুটি করি-না, আমি রোগীদের কোনো বিষয়ে অবহেলা করি না, সম্ভবত এইজন্যেই তিনি আমাকে অতটা ভালোবাসতেন। তাঁর চেষ্টায় আমি অস্থায়ী থেকে স্থায়ী পদ পেয়ে গেলুম, অথচ কোথাও বদলি না হ'য়ে তাঁরই ওয়ার্ডে র'য়ে গেলুম।

চাকরি স্থায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেসের বাসা ছেড়ে হাঁসপাতালের কোয়ার্টার্সে উঠে আসতে হোলো। এই রকমই নিয়ম। যারা স্থায়ী-পদে কাজ করে তা'রা বাইরে থাকতে পারে না হাসপাতালের মধ্যেই তাদের চব্বিশ ঘন্টা থাকতে হয়। যখনই প্রয়োজন তখনই তাদের হাজির হ'তে হয়, তা ছাড়া পর্যায়ক্রমে তাদের ডিউটি পড়ে, তখন সর্বক্ষণই হাজির থাকতে হয়।

আমি কোয়ার্টার্স পেলুম হাসপাতালের সংলগ্ন একটা দোতলা বাড়ির উপর তলায়। তিনখানি ঘর,—দুটো বেড রুম আর একটা ড্রয়িং রুম। বিবাহিত লোকদের জন্যে প্রায় এই রকমই ব্যবস্থা, যারা অবিবাহিত তাদের জন্যে অন্য রকমের ব্যবস্থা আছে।

কোয়ার্টার্স নিয়ে একা থাকা যায় না, বাবা আমার জন্যে একজন চাকর পাঠিয়ে দিলেন। সে আমাদের দেশের লোক—কেষ্টা। লোকটা নিতান্তই বৈষ্ণব, গলায় কন্ঠি, নাকে তিলক, গুন গুন ক'রে কীর্তনের পদ গায়, আর হাই তুলে রাধেকৃষ্ণ ব'লে তুড়ি দেয়। তাহ'লেও কাজে সে মন্দ নয়। খুব ভোরে উঠে রুটির টোষ্ট আর চা তৈরি ক'রে আমাকে ডাকে,—"বাবু, চা হয়েছে, উঠুন।" দুবেলা রেঁধে আমাকে খাওয়ায়, আবার জুতো জামাও পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু ওর হাতে খেতে আমার তেমন প্রবৃত্তি হয় না। বাইরে চাকচিক্য থাকলেও ওর অভ্যাসগুলো নোংরা। যখন দাঁত বের ক'রে কথা বলে, তখন মুখ দিয়ে নিষ্ঠীবনবৃষ্টি হ'তে থাকে। হাতে বড় বড় নখ। অতঃপর পাঞ্চালীকে আমি নিয়ে এলুম।

বৌদিদি খুব দুঃখ করতে লাগলো, তার অনেক দিনের কল্পনা বিফল হ'য়ে গেল। এক বাসায় দুই ভাই মিলে থাকা আর সম্ভবপর হোলো না। শুনলুম দাদাও শীঘ্র কলকাতায় বাসা করছে, বৌদিদিকে নিয়ে আসবে। বৌদিদি বললে, তখন প্রায়ই আমাদের বাসায় বেড়াতে পারবে।

কোয়ার্টার্সে এসে পাঞ্চালীর ভারি মুশকিল হোলো। ঐ তিনটি ঘর থেকে বাইরে সহজে বেরুতেও পায় না, আর আমাকেও তেমন কাছে পায় না, অধিকাংশ সময় একাই থাকতে হয়। যখন আমি বাসায় থাকি তখনো দেখে আমার চারিদিকে কর্মব্যস্ততার আবহাওয়া। শ্বশুরবাড়ি যখন যেতুম তখন আমাকে দেখতো এক রকম, আর এখানে এসে দেখলে আমি স্বতন্ত্র রকম। তখন আমাকে দেখতো যেন কেবল স্ত্রীর স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির জামাই, কিন্তু এখন দেখলে সে আমার অল্পটুকুই পরিচয় মাত্র, আসলে

আমার অধিকাংশটাই হ'য়ে গেছে হাসপাতালের ডাক্তার। এ যেন সে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হ'য়ে তাই সে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একদিন বললে—"তোমাদের হাঁসপাতালে যে এত মেম-নার্স থাকে তা জানতুম না। দিদি বলতো বটে এই কথা। ওদের সকলকেই তুমি চেনো না কি?"

—"অনেককেই চিনি। কেন, তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও?"

—"রক্ষে করো। আমরা হলুম ব্রাহ্মণ, আর ওরা ম্লেচ্ছ। ওদের একটাও ভালো নয়। ভালো হ'লে কি আর ঘর ছেড়ে নার্সগিরি করতে আসে?"

আমারও কতকটা তাই মত। কিন্তু মুখে সে কথা বললুম না। বললুম—"মানুষকে অতো ছোটো ক'রে দেখতে নেই। ওরা কত রোগীর সেবা ক'রে, কত লোকের প্রাণরক্ষা করে, কত ওরা পরিশ্রম করে, তা জানো? হাঁসপাতালে ঢুকে যদি দেখ তো আশ্চর্য হ'য়ে যাবে। ওদের গুণ কত সেটা দেখতে হবে!"

—"কাজ নেই অমন-গুণে। আপনার জন কোথায় প'ড়ে রইলো তার ঠিক নেই, পরের সেবাটাই বুঝি বড়ো হোলো? নিজের স্বামী-পুত্রের সেবা করার চেয়ে আর কোনো বড় কাজ আছে নাকি? তোমরা যেমন, তাই বিলিতি মেমদের একটু কাজ করতে দেখলেই একেবারে অবাক হ'য়ে যাও। অমনি ক'রেই ওরা তোমাদের ভুলিয়ে দেয়।"

—"কেন, সেদিক দিয়ে তোমার নিজের কোনো ভয় হয় নাকি?"

—"না না, সে ভয় আমার একটুও নেই। যা চমৎকার ওদের রূপ! আমাদের মতো ওদের মধ্যে একটাও নেই। পথ দিয়ে যাওয়াআসা করে, আমি সবগুলোকেই দেখেছি। দেখতে ভালো হ'লে কি আর মেয়েমানুষ চাকরি করতে আসে? তা হোক, তুমি ওদের সঙ্গে বেশি মিশো না।"

আমি একটু হাসলুম মাত্র, এ কথার কোনো জবাব দিলুম না। পাঞ্চালীর মতো সুন্দরী সত্যই ওদের মধ্যে নেই।

ক্রমশ পাঞ্চালীর পরিচয় পেতে লাগলুম। ওর এক রকমের নিষ্ঠা আছে, নিজের ঘর বাঁধবার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে, সংসারের পথে দৈনন্দিন যাত্রার ওর একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, যাতে সেই ছন্দের কখনো পতন না হয় সেই দিকে নিয়ত নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডীটুকু সে বারে বারে দাগ দিয়ে নিশানা ক'রে নিয়েছে এবং মনে মনে স্থির ক'রে নিয়েছে যে, এর মধ্যে যতটুকু স্থান আছে সে তার একেবারে নিজস্ব। এর বাইরে সে পদার্পণ করতে চায় না, কিন্তু এর মধ্যে অপর কাউকে সে অনধিকার প্রবেশ করতেও দেবে না। তার নিজের রূপ, নিজের ধর্ম, নিজের স্বামী, নিজের সংসার এবং তার যাবতীয় সরঞ্জামপত্র, নিজের শাড়ি, নিজের গহনা—এইগুলিতে সম্পূর্ণ অধিকার কেবল তারই, এখানে অপর কারো কোনোরকমের হস্তক্ষেপ চলে না। এইগুলি নিয়েই সে সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করে।

পাঞ্চালী সংসার পেতেছে তার আপন ধারায়, নিজের মনের মতনটি ক'রে, যেমন ক'রে সম্ভবত সে ছেলেবেলায় নিজের খেলাঘর সাজাতো। তিন চারটে তার তোরঙ্গ, দুটো আলমারি, দুটো ক্যাশ বাক্স, একটা গহনার বাক্স, একটা বাসনের সিন্দুক। এইগুলোর চাবি থাকে একটা রিঙের মধ্যে, সেটা আঁচলে বাঁধা রূপার চেনের সঙ্গে ঝোলে, আঁচলটা নাড়তে চাড়তে চাবিগুলো ঝুন্‌ঝুন্ ক'রে বাজে। রান্নাঘরের পাশেই একটা ভাঁড়ার ঘরের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানকার জিনিসগুলোও ওর নিজের পছন্দ-মত আনা হয়েছে। মস্ত বড় একটা বঁটি এসেছে, ছোটো বঁটিতে আনাজ তরকারি ভালো কোটা যায় না। বেলুন চাকি আর শিলনোড়া কলকাতার মোটেই ভালো নয়, ঐগুলো আনা হয়েছে একেবারে খড়গপুর থেকে।

সংসারের কাজগুলো যে পাঞ্চালী নিজের হাতেই সব করে, তা নয়। রান্না থেকে আরম্ভ ক'রে অধিকাংশ কাজই সে কেষ্টাকে দিয়ে করিয়ে নেয়।

কেষ্টার সঙ্গে সে সর্বক্ষণ এই নিয়েই লেগে থাকে। কাজটা কেষ্টাই করবে, কিন্তু যথাযথভাবে পাঞ্চালীর নির্দেশ অনুসারে। একটু ত্রুটি হ'লেই সব পণ্ড হ'য়ে গেল, সে কাজ আবার নতুন করে দ্বিতীয়বার করতে হবে। এই নিয়ে কেষ্টার কাজের আর অন্ত নেই। পাঞ্চালীর এই কার্যনির্দেশের মধ্যে জ্যাঠাইমার শুচিবাইএর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

পাঞ্চালীর নিজের হাতে করবার কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ আছে। সেগুলি ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কীয়। শোবার ঘরের এক কোণে সে একটুখানি ঠাকুরঘর পেতেছে। একটা কাঠের চৌকির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে একখানি ঠাকুরের ছবি। প্রত্যহ স্নানের পর এই ছবিকে সে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করে। কী মন্ত্রাদি বলে তা জানি না, কিন্তু পুজো অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলে। সে ঘরে কারো জুতো পায়ে দিয়ে ঢোকবার হুকুম নেই।

আরো একটা কাজ আছে সন্ধ্যার সময় তুলসীগাছের কাছে আলো দেওয়া। কেষ্টাকে দিয়ে সে টবে ক'রে একটি তুলসীগাছ আনিয়ে নিয়েছে। স্নানের পর প্রত্যহ সেই গাছে জল দেওয়া হয় আর সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বেলে আলো দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষাগুলি সে মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। সে ব'লেই দিয়েছে যে, এখানে আমার কোনো ওজর আপত্তি চলবে না।

আমার সম্বন্ধেও কতকগুলো কর্তব্য সে স্থির ক'রে নিয়েছে। আমার খাবার সময় সুমুখে এসে বসা, আমার পোষাক পরবার সময় ও খোলবার সময় কাছে এসে সাহায্য করা, এইগুলো ওর নিজস্ব কর্তব্য। এতেও আমার কোনোরকম বাধা দেওয়া চলবে না। এই শিক্ষাগুলিও ওর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া, কারণ আমি দেখেছি তিনিও বড়মশাইয়ের এই কাজগুলো নিজের হাতে করে দেন।

সমস্তদিন পাঞ্চালী নানা রকম আবশ্যক ও অনাবশ্যক কাজের ব্যবস্থা নিয়েই থাকে। আমারও যেমন তার সঙ্গে দুদণ্ড ব'সে গল্প করবার ফুরসৎ

লোকে বলে ডাক্তারদের শরীরে দয়ামায়া থাকে না। তা হ'তে পারে। কিন্তু তার প্রধান কারণ, মৃত্যুকে আমরা জানি। মৃত্যুকে আসন্ন দেখলেই আমাদের মন আপনা-আপনি সেখানে বিমুখ হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের কর্তব্য ওখানে শেষ হ'য়ে গেছে। তবুও যে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টার প্রয়োগ করি, সে নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে। তখন আমরা আশাশূন্য, মমতাশূন্য, কার উপর আর মমতা করবো? আমার মনে আছে, এক বন্ধুর সঙ্গে একবার সিনেমা দেখতে গিয়াছিলাম। সে একটা যুদ্ধের ছবি, তাতে একটি হাঁসপাতালের চিত্র দেখানো হয়েছে। একজন সৈনিক গুরুতর আঘাত পেয়েছে, তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার এক প্রিয় বন্ধু তাকে সেখানে দেখতে গেছে। হাঁসপাতালের সকলেই জানে যে লোকটি বাঁচবে না, কিন্তু বন্ধু সে কথা জানে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঐ সৈনিক কেমন ক'রে উঠলো, বন্ধু তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ডাক্তারকে ডাকতে। ডাক্তার তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, সে ঐ বন্ধুর ব্যস্ততা দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হোলো না, আপন মনে নিজের কাজ করতে লাগলো। আমার পাশের বন্ধু এই ছবি দেখে ব'লে উঠলো,—"ছি ছি তোমরা ডাক্তারেরা এমন নিষ্ঠুর?" আমি চুপ ক'রে রইলুম,—দেখেই চিনতে পেরেছিলুম যে ডাক্তারি মনের এই নিখুঁত ছবি। ঐ সিনেমার ছবির ডাক্তার মৃত্যুর কাছে গিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করতে চায় না, তার হাতে অনেক কাজ। এ মনের পরিচয় আমরা বন্ধুর কাছে কী দেবো? সে কিছু বুঝবে না। এ বুঝতে গেলে নিজে ডাক্তার হওয়া চাই।

ডাক্তারেরা নিষ্ঠুর নয়, তাদের মন সাধারণের চেয়ে কতকটা অসাড়। মৃত্যুর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মানুষের নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনাই হয় না। নিত্য নব নব ঐ নিষ্ঠুরতা দেখে ডাক্তারের মন যে অসাড় হ'য়ে যায়, সে ভালোই, সেইজন্যই সে মৃত্যু দেখেও অসুস্থ হয় না। তা যদি না হোতো তাহ'লে ডাক্তারেরও মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হোতো।

বছরখানিক যেতে-না-যেতে আমার ডাক্তারি-জীবন ক্রমে গতানুগতিক হ'য়ে এলো। নিত্য নিয়মিত কাজ ক'রে যাই, যে মরবার সে মরে, যে বাঁচবার সে বাঁচে। রোগীদের আত্মীয়স্বজনেরা নিত্যই আসে, চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, উৎসুক হ'য়ে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাদের কথার জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হ'য়ে যাই। নানারকমের অদ্ভুত প্রশ্ন, নানারকমের অসম্ভব অনুরোধ।

খেটে খেটে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। সকাল সাতটায় চা-রুটি খেয়ে হাঁসপাতালে ঢুকি, বাসায় ফিরতে কোনোদিন বা দুটো বাজে, কোনোদিন বা তিনটে। অবসাদে আর ক্ষুধার তাড়নায় তখন জ্ঞান থাকে না, কোনোমতে খেয়ে নিয়ে মড়ার মতো শুয়ে পড়ি। তাও কি বিশ্রামের উপায় আছে? ঠিক যেন সময় বুঝেই নার্সরা স্লিপ দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠায়—অমুক রোগীর অবস্থা খারাপ,—ঠিক যে-সময় আমি খেয়ে উঠেছি কিংবা সবেমাত্র যখন তন্দ্রা এসেছে। একে চাকরি, তার উপর মনুষ্যত্বের দাবী, সুতরাং তখনই আবার সদ্য-পরিত্যক্ত জামা গায়ে চড়িয়ে দৌড়তে হয়। রোগীর হয়তো অন্তিম সময়, কিছুই করবার নেই। তবু অক্সিজেন দিতে হয়, ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে হয়, যা কিছু তখন কর্তব্য। হয়তো রোগীর আত্মীয় উপস্থিত, সে পায়ে জড়িয়ে ধরে—"যেমন ক'রেই হোক বাঁচান ডাক্তারবাবু।" সে জানে না যে ডাক্তারবাবুও তারই মতো মানুষ, এখানে সে তারই মতো অক্ষম। যেটুকু তার করণীয় তাই সে কলের মতো ক'রে যাচ্ছে, এর বেশি আর কিছুই সে জানে না।

যাঁরা মনে করেন ডাক্তারি-জীবন খুব সুখের, তাঁরা হাঁসপাতালের ভিতর গিয়ে দিনকতক দেখে আসবেন। বাইরের থেকে দেখতে ডাক্তারেরা খুব ফিটফাট, ভারী স্ফূর্তিযুক্ত। আমি ভাগ্যবান ডাক্তারদের কথা কিছু জানি না, সাধারণদের কথাই বলছি। পোষাকের মধ্যে লুকানো দেহ এবং দেহের মধ্যে লুকানো মন, দুইই তাদের ক্লিষ্ট। পরের দুঃখ তা'রা জানে,

সে-দুঃখ যে অধিকাংশই দূর করা যাবে না একথাও তা'রা জানে, কিন্তু কিছুই বলবার উপায় নেই। মনে মনে রোগের চেনা এবং না-চেনা সম্বন্ধে, ঔষধ নির্বাচন ঠিক হয়েছে কি হয়নি সে সম্বন্ধে, আরোগ্যের নিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে সময়ে অসময়ে তাদের মনে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে,—অথচ বাইরে দেখাতে হয় নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা, মুখভাব ক'রে রাখতে হয় প্রশান্ত। চব্বিশ ঘণ্টাই রোগীর কাজের জন্য ডাক্তারের মন নিযুক্ত, সর্বদাই ঐ কাজের জন্য সে প্রস্তুত। নিজের জীবনকে উপভোগ করবার তার অবসর নেই, নিজের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। মানুষ এমনভাবে বেশিদিন সুস্থ থাকতে পারে না। সে নিজের জন্য একটা কিছু সান্ত্বনা খোঁজে। যখন তা মেলে না তখন সে হৃদয়হীনের মতো আচরণ করে। এর জন্য তাকে হয়তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

৯

পাঞ্চালীর প্রতিও কি আমি হৃদয়হীনের মতো আচরণ করেছিলাম? সে কথা আমি নিজে জানতুম না, একদিন বৌদিদির মুখে শুনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম।

পাঞ্চালী আমার সুন্দরী স্ত্রী, তাকে নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকবো, মনের সখ মিটিয়ে নিজেদের খুশিমত দুজনে বাস করবো, এ আমার অনেক দিনের কল্পনা। সে সাধ মেটাবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। ঘর সাজাবার আসবাব-পত্র ইচ্ছামত আমিও কিনেছি, পাঞ্চালীর ইচ্ছামত সেও কিনেছে। অর্থ যা উপার্জন করি তাতে সখ মেটাবার কোনো বাধাই নেই। পাঞ্চালীর পছন্দ অনুসারে তার অনেক রকমের সৌখীন কাপড়জামা এবং কিছু কিছু গহনাও কিনে দিয়েছি। তা ছাড়া বাড়িতে

ব'সে আনন্দ উপভোগের অনেক বস্তু সংগ্রহ করেছি। একটা গ্রামোফোন কিনেছি, একটা হার্মোনিয়ামও আছে। আনন্দের উপকরণের অভাব নেই।

ইতিমধ্যে দাদা কলকাতায় একটা বাসা ক'রে বৌদিদিকে নিয়ে এসেছে। বৌদিদি প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টার্সে আসে, অনেকক্ষণ থেকে গল্পগুজব করে, পাঞ্চালীকে নিজের বাসায় নিয়ে যায়, আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। বৌদিদি তাকে নিজের কাছে দুই একদিনের জন্যে রাখতে চায়, কিন্তু সে কখনো সেখানে রাত্রিবাস করতে রাজি হয় না, যেদিন যায় সেই দিনেই ফিরে আসে। সে বলে অমন ভাবে গিয়ে থাকলে তার সংসারের বিশৃঙ্খলা হবে।

বৌদিদি এই নিয়ে প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করে। একদিন বললে—"দুজনে এমনই গলায় গলায় ভাব যে একরাত্রি কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারো না?"

—"তা যদি হয় সে তো খুব ভালোই কথা। এটা কি ভারী অন্যায় ব'লে মনে হচ্ছে?"

—"না গো না, অন্যায় কেন হবে, আমি তোমাদের সুখ্যাতিই করছি। তবে এতটা কারুর দেখিনি কিনা, সেই কথাই বলছিলুম।"

—"আর তুমি বুঝি দাদাকে ছেড়ে এখানে এসে দুচারদিন থাকতে পারো?"

—"তা আমি খুব পারি। তবে আমি না থাকলে তোমার দাদার কষ্ট হবে এই যা। নইলে ঘরদোর এমন চমৎকার সাজিয়ে রেখেছো যে দেখলেই থাকতে লোভ হয়।"

—"তোমার ঘরদোরও এমনি ক'রে সাজাও না কেন?"

—"সে কি আর হবার যো আছে? তোমার দাদা যে কৃপণ, একটি পয়সাও হাত দিয়ে গলে না। তুমি ওকে কাপড়জামা কিনে দিয়েছো

দেখলুম। আর আমি তুমাস ধ'রে ব'লে ব'লে তোমার দাদাকে দি একখানা ভয়েল শাড়ি কেনাতে পারলুম না।"

—"এ অত্যন্ত অন্যায়। আচ্ছা আজই আমি দাদাকে বলছি।"

—"না না ঠাকুরপো, ওসব তুমি খবরদার বলো না। তা হ'লে ভীষণ ঝগড়া হ'য়ে যাবে।"

—"এই সামান্য কথাতেই ঝগড়া হ'য়ে যাবে?"

—"তুমি জানো না। ঝগড়া তো আমাদের প্রায়ই লেগে আছে সেইজন্যেই বলছি তোমরা সুখী, তোমাদের কখনো ঝগড়া হ'তে দেখলুম না।"

বৌদিদি এসে এসে দেখে যায় যে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা খু সুখী। কিন্তু বৌদিদি আমার ভিতরকার খবর কিছু জানেনা। বৌদিদিও জানেনা, আর [illegible]লীও জানেনা। কোথায় যে আমি ক্লিষ্ট, কোথায় আমার সহানুভূতির প্র[illegible]ন, কোথায় সান্ত্বনার প্রয়োজন, সে খবর ওরা রাখে না।

চাকরিবাকরির কাজ আর স্ত্রীর সঙ্গ ছাড়াও যে সময়টা মানুষের হাতে থাকে, তাকে বলে অবসর। এই অবসরের সময়টা সে নিজের ইচ্ছামত এমন কোনো ব্যবহারে লাগায় যাতে তার কিছু আত্মতৃপ্তি হয়। অনেকে ক্লাবে যায়, আড্ডা দেয়, কিন্তু আমার এসকল ভালো লাগতো না। ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়া, সেও আমার পছন্দ নয়। সঙ্গীতে আমার সখ ছিল। কিন্তু দেখলুম এ বিষয়ে আমার রুচির সঙ্গে পাঞ্চালীর রুচির মিল নেই।

গ্রামোফোনে আমি বেছে বেছে রবীন্দ্রনাথের গানগুলো বাজাতুম। পাঞ্চালী বলতো,—"আহা, ঐ বুঝি তোমার ভালো গান হোলো? আর বুঝি কোনো ভালো গান জুটলো না? বাংলা গান শুনবে, তার মধ্যেও বুঝি বিলিতির গন্ধ থাকা চাই?"

যন্ত্রসঙ্গীত শেখবার উদ্দেশ্যে আমি একটা বেহালা কিনেছিলুম।

দিনকতক মাষ্টার রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে সাধনা করতে লাগলুম। কিন্তু সে বেশিদিন নয়। পাঞ্চালীর ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে লাগলো। একদিন সে বললে—"রাত্রে একটু ঘুমাতেও তুমি দেবে না? ছেলে-কান্নার মতো একঘেয়ে ঐ বিকট আওয়াজ তোমার নিজের কানেও কি ভালো লাগে?"

অতঃপর সঙ্গীতস্পৃহা আমার ঘুচে গেল।

কিন্তু এ সকল রুচিভেদের কথা নিয়ে আমি প্রকাশ্যভাবে কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি নি। প্রত্যেকেরই শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে রুচির বিভিন্নতা ঘটে থাকে। দুজনে একত্রে থাকতে হ'লে পরস্পরের রুচির মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা ক'রেই চলা উচিত। একজন যদি বা না মানে, অপরজনের অন্তত সেটুকু ত্রুটি মেনে নিয়ে সামঞ্জস্য রেখে চলা উচিত। অতএব পাঞ্চালীর আপত্তি দেখলে আমি চুপ ক'রেই যেতুম। আরো একটা অন্যপ্রকারের অসুবিধা আমার ছিল, সেটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে রাখি।

অধিকাংশ মেয়ের যেমন কতকগুলো শুচিবাই আছে, অধিকাংশ ডাক্তারের তেমনি কতকগুলো শুচিবাই আছে। হয়তো কিছু আতিশয্য এসে পড়ে, কিন্তু মেয়েরা যেমন নিজেদের আবেষ্টনে থেকে থেকে ওতে অভ্যস্ত হয়, আমরাও তেমনি আমাদের কাজের আবেষ্টনে থেকে ওতে অভ্যস্ত হই। ফলে, জলের গ্লাসে কেউ আঙুল ডুবিয়ে আনলে সে জল আমি খাই না, ভাতে দৈবাৎ মাছি বসলে সে ভাত আমি খাই না, বড় বড় নখযুক্ত হাতে কেউ খেতে দিলে আমার ঘৃণা হয়, হাতে মেখে খাওয়ার চেয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে খাবার প্রতিই আমার অভিরুচি, ঘরের জানালাগুলো সব খুলে না রাখলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না,—ইত্যাদি কতকগুলো ব্যক্তিগত অভ্যাস-বিকার আমার আছে। পাঞ্চালী এই নিয়ে আমার প্রতি বিদ্রূপবর্ষণ করে। অবশ্য আমি সেগুলো গ্রাহ্যই করি না, আর প্রতিবাদও করি না।

কেবল একদিন একটা বিষয়ে আমি কিছু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলুম।

সেটা রাত্রে উঠে হাঁসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। হাঁসপাতালের নিয়ম এই যে, কোনো রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হ'লে নার্সেরা একটা ছোটো খাতায় "জরুরি কল্" লিখে কুলির মারফত তখ ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবে, দিনেই হোক অথবা রাত্রেই হোক। এইজ প্রয়োজন হ'লে কুলিরা মাঝে মাঝে গভীর রাত্রেও এসে আমার শোব ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতো, আমাকে তখন ঘুম থেকে উঠে যে হোতো। পাঞ্চালীর এতে প্রবল আপত্তি। সে বলে, রাত্রে আমি কে যাবো? রাত্রে তার একলা থাকতে ভয় করে, বুক টিপ্ টিপ্ করে, ইত্যাদি একদিন সে আমার হাত ধ'রে বললে—"না তুমি যেও না।" আমি বিরক্ত হ'য়ে বলেছিলাম—"ছেলেমানুষি কোরো না।" তাতেও সে হাত ছাড়েনি, তখন রূঢ়ভাবে আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এ কথাটা আমার তারপর আর স্মরণ ছিল না।

১০

হাঁসপাতালের চতুঃসীমার মধ্যে দিবারাত্র থাকতে আমার ভালো লাগতো না। আমার মন চাইতো একটু নিভৃত স্থান, একটু বাইরের মুক্তবায়ু। তাই দিনকতক আমি সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডের কাজ সেরে বেড়াতে চ'লে যেতাম ইডেন গার্ডেনের দিকে। তাতে মনটাও ভালো থাকতো, আর খানিকটা এক্সারসাইজও হোতো।

একদিন পাঞ্চালী বললে—"রোজ সন্ধ্যার সময় তুমি কোথায় যাও? সমস্ত দিনই তো বাইরে বাইরে থাকো, সন্ধ্যার সময় না হয় একটু বাড়িতেই রইলে?"

—"না, একটু বেড়িয়ে আসি।"

—"রোজই যেতে হবে? একদিন না গেলে চলবে না?"

—"এ সময় ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগে না।"

—"কে তোমার সঙ্গে যাবে?"

—"কেউ না, একাই যাবো।"

ফিরে এসে দেখি বৌদিদি এসেছে। শোবার ঘরে দুই বোনে গম্ভীর মুখে ব'সে আছে।

আমি উপস্থিত হ'তেই বৌদিদি বললে—"ঠাকুরপো, তুমি নাকি মিন্টুর সঙ্গে ঝগড়া করো?"

—"কথাটা নতুন বটে। আগে শুনতুম ঝগড়া করি না, এখন শুনচি ।। এ নতুন খবরটা তুমি সংগ্রহ করলে কোথা থেকে?"

—"না না, ঠাট্টা রাখো। তুমি যে ঝগড়া করতে পারো এ আমিও জানতুম না। পাঞ্চালীর ওপর তোমার এত রাগ কিসের?"

—"সে কথা তো আমি নিজে কিছুই জানি না।"

—"নিশ্চয় জানো। সন্ধ্যার সময় একদিনও তুমি বাড়ি থাকো না। রোজ কা'র সঙ্গে কোথায় এত বেড়াতে যাও?"

—"কারো সঙ্গেই না। একা যাই।"

—"বেশ তো, পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?"

—"ওকে কোথায় নিয়ে যাবো? হেঁটে হেঁটে আমার সঙ্গে ও কোথায় বেড়াবে?"

—"দুজনে মিলে সিনেমায় যাও না কেন?"

—"সিনেমা আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া বিলিতি ছবি দেখতে ও যেতে চায় না। ও চায় দেশী ছবি দেখতে, সেগুলো আমার মোটেই পছন্দ হয় না।"

—"আর রাত্রেই বা তুমি ওকে একা ফেলে চ'লে যাও কেন? কে তোমাকে রোজ রোজ ডেকে পাঠায়?"

—"রোজ নয়, কোনো রোগীর অবস্থা খারাপ হ'লে নার্সরা ডেকে পাঠায়। হাঁসপাতালের তাই নিয়ম।"

—"তাই যদি হবে, সে কথা ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলেই পারো। হঠাৎ রেগে উঠে ধাকা দিয়ে চ'লে যাবার দরকার কি? বুঝিয়ে বলবার বিলম্বটুকুও বুঝি তোমার সহ্য হয় না? ডাক্তার হ'লেই এমনি অভদ্র স্বভাব হ'য়ে যেতে হয় নাকি?"

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত হলুম। এই সকল কথা পাঞ্চালী বলেছে নাকি? বৌদিদিকে কিছু না ব'লে আমি তখন পাঞ্চালীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"তুমি এইসব কথা বলেছো? এগুলো কি সত্য কথা?"

পাঞ্চালী কিছু বলবার পূর্বেই বৌদিদি তাড়াতাড়ি বললে—"না না, ও এত কথা বলে নি। সামান্যই ও বলেছে, কিন্তু তার থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা কি। তুমি দাদারই তো ভাই, একটু দেখেই তোমাদের অনেকটা বোঝা যায়। কিন্তু এরকম তুমি ছিলে না ঠাকুরপো। দিন দিন তুমি বদলে যাচ্ছো। নিজের মনেই তুমি ভেবে দেখো আমি যা বলছি তা ঠিক কি না।"

এবার আমি বৌদিদিকে বললুম—"দেখ বৌদিদি, আমি যেমনই হই, আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে তুমি থেকো না। আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু গোলমাল হ'লে আমরা নিজেরাই ঠিক ক'রে নিতে পারবো।" দেখলুম আমার কথা শুনে পাঞ্চালী ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি তার কি করতে পরি?

মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওদের বুদ্ধিযন্ত্রের কলকব্জা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। যেটা একবার ধারণা ক'রে নেবে তার থেকে যুক্তিতর্কের দ্বারা কিছুতেই বিচলিত করা যাবে না। আমি আর কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম।

কিন্তু মনে মনে এটুকু আমি স্বীকার ক'রে নিলুম যে—আগের চেয়ে

এখন আমি অনেকটা বদলে গেছি, একথা একদিক দিয়ে সত্য বটে। আমার মনে আর আগেকার মতো তেমন আগ্রহও নেই, তেমন আনন্দও নেই। যতটুকু আমার অতীত জীবন, তার মধ্যে চিরদিনই উৎসাহ নিয়ে চলেছি। স্কুল কলেজে যখন পড়েছি তখন একটা প্রত্যাশা ছিল, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি ছিল। ডাক্তারি পাশ করা পর্যন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি, কিন্তু মনে কখনও ক্লান্তি জাগেনি। এখনো যথেষ্ট পরিশ্রম করছি, এখনো উন্নতির সুযোগ আছে। ডাক্তারি কাজে আমার অসীম আগ্রহ। কিন্তু এখন আমার মনে ক্লান্তি দেখা দিয়েছে।

জীবনের এই সময়টাতে এলো যেন আমার নিরুৎসাহের যুগ। এই সময়টাতে এমন হোলো যেন ভিতরকার উদ্যম আমার ফুরিয়ে গেছে, কোনো কিছুতেই চেষ্টা লাগছে না। লোকের যেমন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়, আমার মনের ভিতরেও যেন তেমনি ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়েছে। কোনো বিষয়েই রুচি নেই, কোনো রকম খাদ্যের প্রতিই তেমন স্পৃহা নেই। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রোগীরা যেমন ক্ষুধা না থাকলেও অভ্যাসমত খেয়ে যায় এবং তারপর সমস্তদিন মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করে, আমারও যেন তাই হয়েছে। জীবনের নদীতে যেন আর স্রোত নেই, নৌকা চলেছে দাঁড়টানার জোরে।

পাঞ্চালীর কোনো দোষ নেই। সে আমার কথা বুঝবে না। যে সব কথা আমি ভাবি তা শুনলে সে হাসবে। একটি সুমধুর সঙ্গ দিয়ে আমাকে সে তৃপ্ত করে, রূপের পিপাসা আমার মিটিয়ে দেয়, এইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমার সমস্ত পরিচয় তাকে দেওয়া যায় না, সকল বিষয়ে সহযোগিতা প্রত্যাশা করাও যায় না। তাতে পাঞ্চালীর কোনো দোষ নেই। অনেক প্রশ্ন রইলো আমার কাছে, পাঞ্চালীরও প্রশ্ন রইল তার নিজের কাছে। সকল মানুষই বোধ হয় এই রকম। একজন কখনো অপরজনের রহস্য সম্পূর্ণ ভাবে জানতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে ভ্যাকুয়াম কোথাও থাকতে পারে না, মনের মধ্যেও না। ফাঁকা জায়গা ভরাট করবার জন্ম বিদ্যার মতো জিনিষ আর নেই,—আমি কলেজের লাইব্রেরী থেকে অনেক বই এনে পড়তে লাগলুম, আর কর্ণেল লাইটের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগলুম।

১১

কর্ণেল লাইট যেমন বিদ্বান তেমনি মিষ্টভাষী। খুব লম্বা চেহারা, সকলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। মুখভাবে স্নিগ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ স্নেহের হাসির আভাস সর্বদাই লেগে আছে। চোখের দৃষ্টিতে মনে হয় যেন জ্ঞানের অদৃশ্য চশমা পরানো রয়েছে, দৃষ্টিশক্তিটা তাই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

কর্ণেল লাইটের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি চমৎকার। তাঁর ক্লিনিক্যাল লেকচার শোনবার জন্যে ছাত্রেরা দলে দলে ভিড় ক'রে আসে। ঠিক ন'টার সময় তিনি ওয়ার্ডে ঢোকেন, সেখান থেকে বেরুতে প্রায় বারোটা বেজে যায়। রোগী দেখতেই যে এতটা সময় লাগে তা নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেই অধিকাংশ সময় কেটে যায়। প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতে দিতে তিনি ঘুরতে থাকেন, আর আমি থাকি তার পশ্চাতে। ব্যবস্থাগুলো যেমন বলেন আমি তাই প্রত্যেক রোগীর টিকিটে লিখে নিতে থাকি। ছেলেদের দল ঘোরে আমাদের পিছনে, ব্যবস্থাগুলো তা'রা শোনে, কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে যেখানে মন হয় সেখানে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। যে রোগীর কাছে দাঁড়ালেন তাঁর সেদিন দুর্ভাগ্য। সাহেবের আদেশে প্রত্যেক ছাত্র তাকে একে একে পরীক্ষা করে।

এর পরেই আরম্ভ হয় লেকচার। রোগটি কী দেখা হ'লো, কি-কি লক্ষণ পাওয়া গেল, কিসে রোগটা চেনা যেতে পারে, ঐ রোগের নিদান কি, চিকিৎসা কি, আরোগ্য-সম্ভাবনা কতটা ইত্যাদি বলতে বলতে তখন আরো এসে পড়ে অনেক অবান্তর কথা। আলোচনা ক্রমে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। *কোনো প্রসঙ্গই তখন বাদ যায় না। চিকিৎসাশাস্ত্র অতিক্রম ক'রে এসে পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা, মানুষের হৃদয়ের কথা,* সমাজের কথা। ছেলেরাও অসঙ্কোচে আলোচনায় যোগ দেয়, কত রকমের প্রশ্ন করে, নানারকম তর্ক করে। কথাগুলো বোধ হয় কখনো তারা ভোলে না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখে। এরকম শিক্ষা বোধ হয় ডাক্তারি ছাত্রেরা ছাড়া অন্য কোনো ছাত্রেরাই পায় না।

আমি আগ্রহের সঙ্গে এই আলোচনাগুলো শুনতুম। এইখানেই আমার অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যেতো। যেদিন যে বিষয়টা শুনতুম সেদিন সেইটা নিয়েই চিন্তা করতুম। সকল দিনের কথা মনে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু একটা দিনের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

কর্ণেল লাইট একটি রোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার রোগের নিদান সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছিলেন, ছাত্রেরা একে একে ঐ রোগীটিকে পরীক্ষা করছিলো। লোকটির কোমরে একটা কালো ঘুনসি বাঁধা ছিল। হাসপাতালের নিয়ম এই যে কোনো বাহুল্য জিনিষ রোগীর গায়ে থাকবে না। রোগী হাঁসপাতালে ভর্তি হওয়ামাত্র সমস্ত কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে তাকে হাঁসপাতালের কাপড় জামা পরিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঘুনসি তাগা প্রভৃতি যা কিছু থাকে সমস্তই খুলে দেওয়া হয়। সম্ভবত এই রোগীর ঘুনসিটা নার্সদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। ছাত্রদের ঐ রোগী পরীক্ষার সময় হাঁসপাতালের একজন নার্স সেটা দেখতে পেলো। সে চুপি চুপি একটি কাঁচি এনে পরীক্ষারত একজন ছাত্রকে সেটা কেটে ফেলে দিতে অনুরোধ করলে। ছাত্রটি ঐ ঘুনসি কাটতে যখন উদ্যত হয়েছে—তখন লোকটি

দুই হাতে বাধা দিয়ে প্রবল আপত্তি করতে লাগলো। ছাত্র তার কথা অগ্রাহ্য ক'রে জোর ক'রে সেটা যখন কাটতে যাচ্ছে তখন ব্যাপারটা কর্ণেল লাইটের নজরে পড়লো। তিনি বললেন—

—"রও রও, ওটা কাটছো কেন?"

—"ওটা স্যার অত্যন্ত একটা ময়লা জিনিষ, কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না, তাই জোর ক'রে কেটে দিচ্ছি।"

—"ওর যদি তাতে কোনো আপত্তি থাকে ত'হলে জোর করবার কী দরকার আছে? বরং নার্সকে বলে দাও না ওটা খুলে নিয়ে সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করে এনে দিক। তাতে বোধ হয় ওর আপত্তি হবে না।"

—"কিন্তু স্যার এই সকল গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? হাঁসপাতালে যখন এসেছে তখন হাঁসপাতালের নিয়ম মেনেই ওকে চলতে হবে। ও বলছে যে ওর ঘুনসিতে ঠাকুরের মাদুলি বাঁধা আছে, সেইজন্যেই ওর ওটা ফেলে দিতে আপত্তি। ও বলতে চায় যে এটা ফেলে দিলেই ওর সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। দেখুন না, ঐ ময়লা জিনিষটাকে কী রকম প্রাণপণে চেপে ধ'রে আছে। ময়লা জিনিষটা গায়ে রাখলে যে কী অনিষ্ট হয় তা ওর ধারণাই নেই।"

—"তুমিও তো বাপু গোঁড়ামি করছো? তোমার গায়ে না হয় জোর আছে, তাই তোমার জেদটাই এখানে খাটবে। কিন্তু তোমার গোঁড়ামির জোরে কি ওর গোঁড়ামিটা দূর ক'রে দিতে পারবে আশা করো?"

—"আমি আবার কোথায় গোঁড়ামি করলুম?"

—"ওর বিশ্বাস যে ঐ বস্তুটা রাখলেই ওর মঙ্গল হবে। আর তোমার বিশ্বাস যে—ওটা ফেলে দিলেই ওর মঙ্গল হবে। দুটোই গোঁড়ামি।"

—"আমি যেটা বলছি সেটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ঐ ময়লা বস্তুটা গায়ে থাকলে ওর অনিষ্ট হ'তে পারে, আমরা সহজ বুদ্ধিতে একথা বুঝি। কিন্তু ওর অন্ধবিশ্বাসের কোনোই যুক্তি নেই।"

—"এ কথা তুমি কখনই বলতে পারো না যে—ওটা না ফেলে দিলে ওর নিশ্চিত অনিষ্ট হবে। তোমরা বিজ্ঞান শিখতে এসে এই দোষটা করো যে—নতুন শিক্ষা যেটা ধরো তাই নিয়ে নতুন রকমের গোঁড়ামি করতে থাকো। একটা ছাড়ো, কিন্তু আর একটা ধরো।"

—"স্যার আমাকে মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করছি। কিন্তু যেটা আমি ঠিক জানি তাই নিয়ে গোঁড়ামি করবো না? ও যে বলছে মাদুলির গুণের কথা, তাই আমাকে মেনে নিতে হবে?"

"দেখ, মানুষ মাত্রেই চিরকাল গোঁড়ামি ক'রে আসছে। পৃথিবীতে আগে ছিল ধর্মের গোঁড়ামি, তারপর জাতীয়তার গোঁড়ামি, তারপর স্বদেশের গোঁড়ামি। এই নিয়েই লোকে সারাজীবন মারামারি কাটাকাটি করে। তার ভিতর থেকেই বেরিয়ে এলো বৈজ্ঞানিকের দল। তা'রা দেখলে এতে কিছু মীমাংসা হয় না, শেষ পর্য্যন্ত গোঁড়ামিই প্রবল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু মানুষ আর অগ্রসর হয় না। সেই জন্যে এরা স্থির করলে যে এরা কেবল নিরপেক্ষভাবে দেখবে এবং বলবে, কিন্তু কোনো গোঁড়ামি করবে না। বিজ্ঞানের ছাত্র হবে ঠিক যেমন আইনষ্টাইনের বর্ণিত দ্রষ্টা। তার একটিমাত্র চোখ ছাড়া আর কোনো রকমের ইন্দ্রিয় থাকবে না। ঐ একটি মাত্র চোখ দিয়ে সে একটিমাত্র দিকেই দেখতে পাবে, এবং যেটুকু মাত্র সে দেখবে কেবল সেইটুকু মাত্রই স্বীকার করবে, তা ছাড়া আর কোনো কথা সে স্বীকারও করবে না অথবা অস্বীকারও করবে না। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র, চিরকাল আমরা এই আদর্শ মেনেই চলবো। শেষ পর্য্যন্ত যে কোন্ কথাটা সত্য হ'য়ে দাঁড়াবে তা আমাদের জানা নেই। সুতরাং যখন যেটুকু দেখা যাচ্ছে তখন সেইটুকু স্বীকার ক'রে নিয়েই আমরা চলবো। কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলুম, বলেছিলুম যে ঈশ্বরই সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। তার পর দেখা গেল যে—ওটা স্বীকার ক'রে না নিলেও আমাদের কাজ চলে। সুতরাং

ও এখন আমরা আর স্বীকারও করি না, অস্বীকারও করি না। তারপর একদিন যদি দেখা যায় যে ঈশ্বরকেই স্বীকার করা প্রয়োজন হয়েছে, তখন তাও আমরা স্বীকার ক'রে নেবো, কিন্তু আমাদের ঐ এক-চক্ষুর সুমুখে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্বীকারও করবো না, অস্বীকারও করবো না। জ্ঞান আমাদের অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, সুতরাং কোনো কিছুকেই অস্বীকার করবার সময় আমাদের এখনো হয়নি। মানুষের শেষ গোঁড়ামি যেটা হবে সেটা আমাদের জন্যেই তোলা রইলো। সুতরাং তার পূর্বে তুমি কিছুই অস্বীকার করতে পারো না, ঐ লোকটির মাদুলিকেও করতে পারো না।"

সেদিন এক নতুন মনোভাব নিয়ে বাসায় ফিরলুম। গিয়ে দেখি পাঞ্চালী তার পূজায় বসেছে। পরনে আছে একখানা গরদ শাড়ি, গলায় জড়িয়েছে তার অঞ্চলপ্রান্ত, কপালে সিঁদুরের টিপ। একখানা ছোটো স্তোত্রমালার বই খুলে দুলে দুলে সুর ক'রে কী একটা স্তব পড়ছে। ধূপের গন্ধে ঘরটা ভ'রে উঠেছে।

আমি আর ঘরে ঢুকলুম না, পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেলুম। আমার যা কাজ তাই আমি করি, পাঞ্চালীর যা কাজ তাই সে করে। ওর কাজে আমি অন্তরায় হই কেন?

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। সত্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই যদি আমার ধর্ম হয়, তাহ'লে মানুষের ভক্তি নামক যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, এই সত্যকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে ভক্তির আধার বিভিন্ন হ'তে পারে। কেউ ভক্তি করবে দৃশ্যমানকে, কেউ করবে কাল্পনিক দেবতাকে। পাঞ্চালী যদি বলে ঐ ছবিখানাকেই মনে করা যাক আমার আরাধ্য দেবতা, ঐখানেই আমার ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হচ্ছে, তাহ'লে সেখানে আমার বলবার কী আছে?

যদি বলি ওটা দুর্বলের ভগবৎপ্রিয়তা। কিন্তু আমরাই কি ভগবানের

সম্বন্ধে কখনো কিছু ভাবি না ? বিজ্ঞানের বর্তমান পুরোহিতরাও বলেন যে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে করতে যেখানে পৌছনো যায় সেটা ক্যানভাসের কিনারামাত্র, তাতে চিত্রই কেবল দেখা যায়, কিন্তু চিত্রকরকে দেখা যায় না। *তাঁরা বলেন যে আমাদের ঐখানেই থেমে যাওয়া যাক, তার বাইরে আমাদের দৃষ্টি দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু থামতে বললেই কি মানুষের মন থামে ?* বিজ্ঞানের ছাত্র হ'লেও আমি মানুষ। নিয়তই দেখছি আশ্চর্য মৃত্যু, নিয়তই দেখছি আশ্চর্য আরোগ্য। সুস্থ লোক অকস্মাৎ হার্টফেল ক'রে মারা যায়, আবার মৃতসাব্যস্ত ব্যক্তিও আশ্চর্যভাবে বেঁচে ওঠে। তখন মনে হয় একটা কিছু শক্তি, একটা কারো ইচ্ছা রয়েছে এর পিছনে। মনে হয় এ বুঝি এমন কোনো কারিকরের কাজ, যার গড়তেও কোনো কষ্ট নেই, ভাঙ্গতেও কোনো মায়া নেই।

কিন্তু পাঙ্কালী কি এত বড়ো ভগবানকে ধারণা করতে পারে ? অসম্ভব। তবু সে আমার মতো সন্দেহ করে না। যা হোক একটা কিছু ধারণা ক'রে নেয় এবং সেইটাকে সে বিশ্বাস করে। তা হোক। আমার সন্দেহ করা ভগবানের চেয়ে ওর নিঃসন্দেহ-ভগবান অনেক ভালো। এ কথা বলতে আমি বাধ্য। ভ্রান্তি নিয়েও ওর মনে তবু যা হোক একটা নিশ্চিন্ততা আছে, কিন্তু আমার মনে তাও নেই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্বাসগুলো যে আমার শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে প্রবাহিত সে কথাও আমার ভুলে যাবার উপায় নেই, আর আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষাগুলো যে প্রবেশ করেছে আমার মজ্জায় মজ্জায়, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বারে বারে আমার এও মনে হয়েছে যে পাঙ্কালীর পূজার মধ্যে ভক্তিটাই প্রবল, না অভ্যাসটাই প্রবল ? নিজেকে তখন বুঝিয়েছি যে সেকথা বিচারে আমার অধিকার নেই। ডাক্তারি ডিগ্রি পেলেই যেমন চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করা হয় না, মানুষকে অধিকার করলেই তেমনি তাকে আয়ত্ত করা হয় না।

এই সময় একদিন একটা ঘটনা উপলক্ষে ডক্টর গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। তখন পাঞ্চালী আমার কাছে নেই। বাবার সখ হয়েছিল দিনকতক তিনি তাঁর দুই বৌমাকে নিজের কাছে রাখবেন। কাজেই পাঞ্চালী আর বৌদিদি বাবার কাছে চ'লে গেল। আমি ছুটি পেতুম না ব'লে যেতে পারতুম না, দাদা প্রতি উইক্এণ্ডে গিয়ে দেখাশোনা ক'রে আসতো। বাসায় আমি একা থাকতুম।

কিন্তু ডক্টর গাঙ্গুলির পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয়নি। আমার আগের বছর পাশ করেছে, তা হ'লেও ছাত্রাবস্থা থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ ছিল। ছিপ্ ছিপে সুপুরুষ চেহারা, কলকাতার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। টক্‌টকে ফর্শা গায়ের রং, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো আর এলোমেলো। আঁচড়ালেও চুল বসে না, বিপর্যস্ত হ'য়ে ফেঁপে ওঠে। চোখদুটো যেন দুষ্টামিতে ভরা, অনবরত চঞ্চল হ'য়ে থাকে। লোকটাও অমনি চঞ্চল, সুস্থির হ'য়েও দাঁড়াতে পারে না, মুখ বুজেও থাকতে পারে না। মানুষ পেলেই অনবরত কথাবৃষ্টি করতে থাকে।

গাঙ্গুলি মেধাবী ছাত্র। বরাবর ভালো ভাবেই পাশ করেছে। ধাত্রীবিদ্যায় ফার্স্ট হয়েছে এবং গুড়ইভ স্কলারশিপ পেয়েছে। এখন সার্জিক্যাল বিভাগে চাকরি করছে অ্যানিস্থেটিষ্টের পদে। সার্জন বনারজি তাকে ভয়ানক ভালোবাসেন, সে ছাড়া কোনো বড়ো অপারেশনে হাত দিতে চান না। যদি অসময়ে কোনো বড়ো অপারেশন করবার দরকার হয় তাহ'লে নিজে গিয়ে ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসেন। গাঙ্গুলির অপারেশনের হাতও খুব চমৎকার। অনেক সময় সে সখ ক'রে নিজেও সার্জনের অনুমতি নিয়ে এক-আধটা অপারেশন করে।

দুই নৌকা

গাঙ্গুলির সবই ভালো, কেবল একটা বিষয়ে দুর্বলতা আছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখছি সে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। ডাক্তার হবার পরেও সে অভ্যাস যায় নি, নার্স কিংবা ছাত্রী দেখলেই সে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ জমাবে।

ভালো চেহারার প্রতি আমার চিরকালই আকর্ষণ আছে। গাঙ্গুলির সঙ্গে তাই আমার একটু আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। বয়স যথেষ্ট হ'য়ে গেলেও সে অবিবাহিত। সৌখীন মানুষ, যা কিছু উপার্জন করে তা বাবুগিরিতেই ব্যয় করে। পোষাক পরে একবারে নিখুঁত, ঝকঝকে তকতকে একখানি সুন্দর মোটরে চ'ড়ে যাতায়াত করে, দস্তানা চড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নিজের হাতে ড্রাইভ করে। কলার এবং টাই প্রত্যেকদিনই নতুন, পকেটের রুমালে প্রতিদিনই একটা সুগন্ধ।

যাই হোক, এবার যে ঘটনার কথা বলছিলাম তাই বলি।

একদিন বৈকালে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিচ্ছি, এমন সময় দেখি নৃপেন একেবারে হাসপাতালের মধ্যে এসে হাজির,—আমার সেই আগেকার কলেজের বন্ধু। দেখলুম তার মুখখানা অত্যন্ত শুকনো। অনেককাল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মধ্যে কয়েকবার আমার কোয়ার্টার্সে এসে দেখা করেছিল, পাঞ্চালীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। তাকে দেখে বললুম—"কিরে, হঠাৎ এখানে যে? ব্যাপার কী?"

—"তোর সঙ্গে ভাই একটা অত্যন্ত প্রাইভেট কথা আছে। যদি কাজ হ'য়ে গিয়ে থাকে তো কোয়ার্টার্সে চল, সেখানে বলবো।"

—"কেন এইখানেই বল না? কে আর শুনচে?"

—"না না, সে অত্যন্ত প্রাইভেট কথা।"

আমার কাজ সেরে নিয়ে তার সঙ্গে কোয়ার্টার্সে গেলুম। ব্যাপারটা এই। তার বোন সরলাকে নিয়ে মহা বিপদ হয়েছে। বয়স হ'য়ে গেলেও তার এখনো বিবাহ দিতে পারা যায়নি। এখন হঠাৎ যা আবিষ্কার হ'য়েছে

তা ভয়ানক ব্যাপার। একটি আত্মীয় ছোকরা ওদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তো, সেই ওর পড়াটড়া ব'লে দিতো, কয়েকদিন হোলো সেও পালিয়েছে। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো কথাই বলে না, অনবরত কেবল কাঁদতে থাকে। মাও দিবারাত্র কাঁদছেন, বাবাও কাঁদছেন, কারো মুখে অন্নজল নেই। এর একটা যা হোক উপায় করতে হবে, নইলে মেয়েটার জন্যে সকলেই মারা যাবে। বলতে বলতে নৃপেন বেচারা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

আমি বললাম—"এর উপায় কী করতে পারি ?"

—"মা বললেন, তুই ডাক্তার হয়েছিস, যা হয় একটা কিছু উপায় তুইই করতে পারবি।"

—"তা পারবো না। জীবন বাঁচাবার বিদ্যাটাই শিখেছি, মারবার বিদ্যা শিখি নি।"

—"বাঁচাতেই তো বলছি। যেমন ক'রে হোক আমাদের সকলকে তুই বাঁচিয়ে দে ভাই, বাঁচিয়ে দে।"

—"যা বলবি তাই করতে রাজি আছি। কিন্তু তাই ব'লে হত্যার কাজ করতে পারবো না। তুই যা করতে বলছিস, তা হত্যা।"

—"আচ্ছা তুই মায়ের কাছে চল। তিনি তোকে ডেকেছেন। যা বলতে হয় সেখানে বলবি।"

অগত্যা যেতেই হোলো। গিয়ে দেখি বাড়ির মধ্যে সবাই চুপচাপ, সকলেরই মুখ শুকনো, যেন বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়েছে। নৃপেনের বাবা বাইরের ঘরে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছেন। ভিতরে ঢুকতেই নৃপেনের মা আমার হাত দুখানা ধ'রে কেঁদে উঠলেন।

—"বাবা তুমি আমার পেটের ছেলের মতো। একটা কিছু ওষুধ-বিষুধ দিয়ে বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

—"আমাকে অসম্ভব আদেশ করছেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কোনো

—"তা আমি কিছুই জানি না। কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি। অনেকদিন আগেই সে কিছু না ব'লে চলে গেছে।"

—"নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি সাবধান হবার কথা কিছুই ভেবে দেখো নি ?"

—"তখন কিছু বুঝতে পারি নি। যখন থেকে বুঝতে পারলুম তখন থেকেই কেবল ভয় করছে। কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই।"

দেখলুম এ মেয়েকে প্রশ্ন করা বৃথা। যার নিজের ভালোমন্দ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, নিজের অপরাধ যে বোঝে না, তার কাছে কী প্রত্যাশা করা যাবে? অপরাধ এরা অজ্ঞানেই ক'রে থাকে, আর অজ্ঞানেই এরা মরে।

মেয়েটার অবস্থা দেখে আমার দয়া হোলো। একে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল ডক্টর গাঙ্গুলির কথা। ভাবলুম তার সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে দেখা যাক, সে কি বলে। মেয়েদের ব্যাপার সে বোঝে ভালো, একটা কিছু ব্যবস্থার কথা বলতে পারে। অনাথ-আশ্রম প্রভৃতিও অনেক আছে, তাও হয়তো সে জানে।

নৃপেনকে সেই কথা বললাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে বরাবর ডক্টর গাঙ্গুলির বাড়ি চ'লে গেলাম।

১৩

গাঙ্গুলি তখন নিজের প্রাইভেট চেম্বারে ব'সে একজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। একখানা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুধারে দুজন বসেছে, টেবিলের উপর কয়েকটা বিয়ারের বোতল, মাঝে একটা প্লেটে এক প্লেট কড়াইশুঁটি ভাজা। ঘরে সাদা ডোমের মধ্যে স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে

ইলেকট্রিক পাখা সজোরে ঘুরছে। বিয়ারের বোতল দেখেই আমার মনটা বিমুখ হ'য়ে উঠলো। গাঙ্গুলির এ নেশাটিও আছে?

আমাকে দেখেই গাঙ্গুলি প্রচুর অভ্যর্থনা করলে—

—"এসো এসো ডক্টর মুখার্জি। এই চেয়ারটায় আরাম ক'রে বোসো। তারপর গরীবের ঘরে কী মনে ক'রে?"

—"একটা প্রাইভেট কথা আছে।"

—"আচ্ছা সে পরে হবে, বিশেষ তাড়া নেই তো? আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও। চলবে তো এসব?"

—"না ভাই, আমি ওসব কখনো খাই নি।"

—"কেন, প্রেজুডিস?"

—"তা নয়, তবে যা কখনো খাই নি তা খাবো না।"

—"অন্ প্রিন্সিপল?"

—হাঁ, কতকটা তাই। নিজেকে উত্তেজিত ক'রে নিয়ে তবে সুখ পেতে হবে, সে রকম কৃত্রিম উন্মাদনায় আমার দরকার নেই।"

—"বিয়ার খেলেই বুঝি উন্মত্ত হয়? কে তোমায় বলেছে এ কথা? বিয়ার কখনও কাউকে উন্মত্ত করে না, টেক ইট ফ্রম মি। খানিকটা ফুর্তি হয় এই পর্যন্ত। একটু ট্রাই ক'রে দেখো, কোনো ভয় নেই। কাম্ অন।"

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলুম না, এক চুমুক খেলুম। কিন্তু এক চুমুকের বেশি খেতে পারলুম না। অত্যন্ত তিক্ত আস্বাদ। গ্লাস নামিয়ে রেখে বললুম—"মাপ করো ভাই, এ আমি খেতে পারবো না।"

—"আচ্ছা তবে থাক থাক, তুমি ওর মর্ম বুঝবে না। পাশের ঘরে চলো, কী তোমার প্রাইভেট কথা আছে শুনি।"

নৃপেনের বোনের সমস্ত ঘটনা তাকে বললুম। মেয়েটা নিতান্ত নিরীহ অজ্ঞানে এমন একটা কাজ ক'রে ফেলেছে যাতে তার সমস্ত জীবনটা

চিরদিনের জন্য নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। শুধু তাই নয়, একটা ভদ্র-সংসার একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে। আমার নিজের বোনের মতো মনে করি ব'লেই কথাটা এত ভাবছি, অথচ এর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি আমার নিজের বোনেরই হোতো তাহ'লে কী করতুম? কোনো অনাথ-আশ্রমে দেওয়া উচিত, না কোথাও সরিয়ে দেওয়া উচিত, কিংবা কী করা উচিত, সেই সম্বন্ধেই একটা পরামর্শ জানতে চাই।

গাঙ্গুলি বললে—"তুমি যা মতলব করতে চাইছো সেগুলোকে খুব সদুপায় বলা যায় না। মেয়েটির যদি ভালোই করতে চাও তা'হলে তার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কাজ করতে হবে। সে ভদ্রঘরের মেয়ে, তার ভবিষ্যৎ যেমন হওয়া উচিত সেটা নষ্ট ক'রে দিয়ে কেবলমাত্র তাকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় ক'রে কোনো লাভ নেই। সে যেমন মর্যাদায় আছে, তেমনি মর্যাদার মধ্যেই তাকে রাখতে হবে। কিন্তু এর একটা অতি সহজ উপায় আছে, সে তো তুমি জানো। সে আমাদের ডাক্তারদেরই হাতে।"

—"না না, কোন রকম হত্যার ব্যাপারে আমি নেই।"

—"আঃ ড্যাম ইট, ওরকম ফাঁকা ময়্যালিটির কোনো মানে হয় না। পৃথিবীতে কত রকমের হত্যা আছে জানো না? মানুষের জীবন্ত মনকে মানুষ ব্রড ডে-লাইটে হত্যা করছে, একটা জাতিকে অপর একটা জাতি গলা টিপে হত্যা করছে, সেখানে তোমার এই ময়্যালিটি কোথায় থাকে? আর এই সামান্য জিনিষটাতেই যত দোষ হ'য়ে গেল? বুদ্ধিমান লোক হ'য়ে তোমার এ কথা বলা উচিত নয়।"

—"তা হোক ভাই, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। অন্য কোনো উপায় থাকে তো বল।"

—"বেশ তো, লীভ ইট টু মি, আমিই যা হয় করবো। আমার

মর‍্যালিটির আদর্শ অন্য রকম। মন্দভাগ্য একটা মেয়ে দৈবাৎ অক্‌ওয়ার্ড পোজিশনে প'ড়ে গেছে, আমাদেরই বন্ধুর বোন, আমরাই মাত্র তাকে উদ্ধার করতে পারি। আমরা ছাড়া আর কেউ তাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? ডাক্তারি শিখেছি লোকের বিপদ আপদ দূর করতে। এইটুকু সৎসাহস যদি না করলুম তবে আর এ বিদ্যের দাম কী?"

গাঙ্গুলি যখন স্ব-ইচ্ছায় ভার নিচ্ছে—তখন আর আমার বলবার কী আছে? আমি বাইরে এসে নৃপেনের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলুম। ভারমুক্ত হয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম বটে, কিন্তু মনটা আমার খচ্ খচ্ করতে লাগলো। গাঙ্গুলির চরিত্র সম্বন্ধে আমার ধারণাটা খুব উঁচু নয়, অথচ তার কাছেই আমাকে যেন ঋণী হয়ে থাকতে হোলো।

এর কিছু দিন পরে নৃপেন আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার মুখ দেখেই বুঝলুম যে বিপদ কেটে গেছে। এখন ওরা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

নৃপেন আমার কাছে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেল। বললে—"ডক্টর গাঙ্গুলির জন্যে এটা দিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমাদের যে উপকার করেছেন তার তুলনায় এ সামান্যই হোলো, আমি আর নিজের হাতে তাঁকে দিতে পারলুম না। তুই এটা দিয়ে দিস।"

সেদিন ডাক্তার গাঙ্গুলিকে আমার কোয়ার্টার্সে ডাকিয়ে আনলুম। টাকাটা তাঁকে দিতে গেলুম, কিন্তু সে কিছুতেই নিলে না। বললে—"তুমি বুঝতে পারছ না ডক্টর মুখার্জি, এখানে এক পয়সাও আমি নিতে পারি না। আমি তোমার মতো সাধু পুরুষ নই। টাকাতে আমার প্রয়োজন আছে। ঐ পাঁচশো টাকা পেলে আমার যথেষ্ট উপকার হোত, কারণ উপস্থিত আমার এক পয়সাও হাতে নেই। কিন্তু তবু ও টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না। আমি যে কাজ অন্যায় করিনি, টাকা

মিলেই সে কাজটা অন্যায় হয়ে যাবে। টাকা নিয়ে ওকাজ করা সত্যিই ভয়ানক ক্রিমিন্যাল, কিন্তু একটি অসহায় মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করা ক্রিমিন্যাল নয়। বুঝলে তো ?”

—“বুঝেছি তোমার কথা। আমি তোমাকে নিতেও অনুরোধ করছি না। নৃপেন দিয়ে গেছে, তাই আমি দিচ্ছিলুম।”

—“টাকাটা বরং এক কাজ করো। ওটা ঐ মেয়েটির নামে ব্যাঙ্কে দিয়ে দাও, ওর যখন বিয়ে হবে তখন ঐ টাকায় ওর একটা গহনা হবে। চমৎকার মেয়ে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। সুন্দর স্বভাব মেয়েটির, আর অসীম ধৈর্য। এই ধরণের মেয়েরাই বিপদে পড়ে। যারা চালাক হয়, নিজের স্বার্থ যারা বোঝে, তা'রা কথনো বিপদে পড়ে না।”

আমি তখন বললাম---“আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি তো মেয়েদের চরিত্র এত বোঝো, মেয়েদের প্রতি তোমার যথেষ্ট দরদ দেখতে পাই, কিন্তু তুমি বিয়ে করো না কেন ?”

—“ওঃ এই কথা ? এর কারণ, মেয়েদের সংশ্রব আমার ভালোই লাগে, কিন্তু বিয়ে করবার মতো মেয়ে কৈ ? তুমি যদি খুঁজে দাও তো চেষ্টা করতে পারি।”

“কেন, এই তো বললে নৃপেনের বোন চমৎকার মেয়ে ; সে কি শুধু মুখের কথাই। মনে করো ওকে যদি যথার্থই তোমার ভালো লেগে থাকে, তাহ'লে ওকেই তুমি বিয়ে করতে পারো।”

—“তা হয়তো পারি। মেয়েটির স্বভাব সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। তার ওপর ও প্রথম জীবনেই ধাক্কা খেলে, ও ভবিষ্যতে খুবই ভালো মেয়ে হবে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে ও সুখী হবে না। আমি ওর ইতিহাসটা জেনে গেছি, আমার কাছে ও চিরকাল অপরাধীর মতো থাকবে। এমন একজন ওর স্বামী হওয়া উচিত যে এই ইতিহাস কিছুই জানে না, তবেই ও সুখী হবে।”

—"সেই ভদ্রলোককে তাহ'লে ওর প্রতারণা করা হবে না? সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিষকে নতুন ব'লে চালিয়ে দেওয়া অন্যায় নয়?"

—"তোমাদের ন্যায় অন্যায়ের মাথামুণ্ড নেই। মনে করো এই মেয়েটি যদি চুরি করতো, তাহ'লে তোমরা কী করতে? হয়তো ওকে কিছু শাস্তি দিতে, তার পর তোমরাও সে কথা ভুলে যেতে, ও-ও ভুলে যেতো। কিন্তু এই অপরাধটাকে তোমরা চিরকাল মনে রাখতে চাইছো। তা কেন করবে? ভবিষ্যতের দিক দিয়ে দুটোর ওজনই সমান বিবেচনা করা উচিত, কোনো অপরাধকেই চিরস্থায়ী ক'রে রাখা উচিত নয়।"

—"থাক্ গে, ওর কথা ছেড়ে দাও। মোট কথা তুমি বিয়েও করবে না, আর মেয়েদের সংশ্রবও ছাড়বে না? নিত্য নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে ভাব করবে, আর চিরকাল এমনি ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে?"

—"ঠিক তাই। চিরকাল একটা মানুষকে নিয়ে কতই বা দেখবো? আমাদের মনও বদলায় আর পছন্দও বদলায়। আমরা পোষাক বদলাই, বাড়ি বদলাই, মোটর বদলাই, হাওয়া বদলাই,—কেবল মানুষের বেলাই বদলাতে পারবো না? ও বিয়ে-টিয়ের বন্ধনের মধ্যে আমি নেই। একটি লোক ছাড়া জীবনে আর কারো সঙ্গে মিশবো না, এ অসাধ্যসাধন তোমরা পারো, কিন্তু আমার চলবে না।"

—"না না ঠাট্টা নয়, কথাটা সিরিয়াস ভাবেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম। মন নিয়ে চিরকাল খেলা করা চলে না। পৃথিবীতে আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে। ঐ নিয়েই যদি এনার্জি নষ্ট করো তাহ'লে আসল কাজ করবে কখন? এখানে ওখানে মধু অন্বেষণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে একজনের ওপর নির্ভর করলেই ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তখন মন দিয়ে নিজের কাজ করা যায়। এটা কি তুমি কখনো ভাবো না?"

—"অনেক ভেবেছি। কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি তারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি, তা ছাড়া নয়। যাকে হোক এনে বললুম

এই আমার স্ত্রী, অথচ সম্পূর্ণরকম স্ত্রী সে হোলোই না, এই তো তোমাদের শতকরা নিরানব্বুই জনের ইতিহাস ? ও আমার পোষাবে না। আমার ধারণা মেয়েদের ভালোবাসাই যায়, কিন্তু বেশি দূর পর্যন্ত ওদের নিয়ে চলা যায় না। অতএব এই অবস্থায় আমার পক্ষে বিয়ে করাই উচিত নয়।"

—"সত্যিই কি তোমার এই ধারণা হয়েছে ?"

—"কেবল ধারণামাত্র নয়, এই আমার অভিজ্ঞতা। আগে আমি তোমাদের মতোই বোকা ছিলুম। কিন্তু ফাঁদে পড়বার আগেই আমার চোখ খুলে গেল। ভাগ্যিস তোমাদের মতো বাঁধা পড়ি নি !"

—"মেয়েদের উপর এত অবিশ্বাস কেন ? কেউ কি তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছিল ?"

—"প্রবঞ্চনা ব'লে কোনো লাভ নেই, প্রত্যেক মানুষের মনের এই খাঁটি সত্য কথা। কেনই বা সে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে, আর কেনই বা তার একদিনের ভালো-লাগা চিরস্থায়ী হ'তে বাধ্য হবে ? যা স্বাভাবিক তাই সে করে।"

—"মেয়েদের যদি তুমি এতই অবিশ্বাস করো তাহ'লে তাদের সঙ্গে আবার এত ক'রে মেশো কেন ?"

—"ঐ যে বললুম, ভালো লাগে তাই মিশি, আর ভালো লাগে না তাই বিয়ে ক'রে তোমাদের মতো মর‍্যালিষ্ট হ'তে পারি না। এ তো খুব সোজা কথা।"

—"কিন্তু এমনি ক'রে জীবনটাকে তুমি নষ্ট ক'রে ফেলছো।"

—"নষ্ট করছি ? চমৎকার একখানা জীবন পেয়ে গেছি, এ আমি নষ্ট করবো ? কিছুতেই না। আমি একে পরিপূর্ণভাবে এনজয় করবো,—টু দি লাষ্ট ড্রপ অফ মাই ব্লাড। যেখানে যতটুকু আনন্দ পাই তার একটুও আমি ছাড়বো না। আমার জীবনের উদ্দেশ্যই তাই, দুনিয়ার মাঝে শুধু আনন্দ খুঁজে নেওয়া।"

—"জীবনকে তুমি এতই সহজ ভাবো? এর মধ্যে যে অনেক দুঃখ আছে তাকে তুমি ঠেকাবে কেমন ক'রে? এর পরে যে আছে মৃত্যু সে কথাটাও তো ভাবতে হবে?"

—"নিশ্চয়ই না। দুঃখের কথা আর মৃত্যুর কথা আমাদের ভুলেথাকাই উচিত। দুঃখ আর মৃত্যুকে মনে রেখে কেউ কখনো বড়ো হ'তে পারে না। স্পোর্ট, স্পোর্ট—বুঝলে মুখার্জি? মাঠে যেমন ফুটবল খেলি, তেমনি আমরা লাইফবল খেলি। রোজ আমি এক ডজন লোককে ক্লোরোফর্ম ক'রে মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছি, আবার রোজ তাদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনছি, আমি ভাববো মৃত্যুর কথা? যতদিন বলটা আছে ততদিন খেলবো, ফেটে গেলেই সেটা টান মেরে ফেলে দেবো,—ড্যাম ইট।"

ডক্টর গাঙ্গুলির সঙ্গে সেদিন যা আমার কথা হয়েছিল সমস্তই এখন মনে পড়ছে। লোকটাকে আগে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু সেইদিন থেকে তার প্রতি আমার কিছু শ্রদ্ধা জন্মালো। কেমন একটা আন্তরিক টান হোলো তার প্রতি, কেমন একটা মমতা। যদিও তার চরিত্রে অনেক দোষ আছে, তবু হৃদয়টা খুব ভালো। জীবনে হয়তো সুখ পায়নি তাই চরিত্রটা অমন হ'য়ে গেছে। মানুষ কি কখনো নিজেকে নিজের মনের মতো গ'ড়ে নেবার সুযোগ পায়? ঘটনাচক্রের ছাঁচেই মানুষের ঢালাই হ'য়ে থাকে।

১৪

এর পর থেকে আমি প্রায়ই গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতুম, আর সেও অবসর পেলেই আমার কোয়ার্টার্সে এসে গল্পগুজব করতো।

ইতিমধ্যে পাঞ্চালী বাবার কাছ থেকে ফিরে এসেছে। গাঙ্গুলি তার সঙ্গেও রীতিমত ভাব জমিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে সে

চিরকালই পটু। প্রথম আলাপের যে নারীসুলভ লজ্জার জড়তা, তা ও চট্ ক'রে কাটিয়ে দিতে পারে, অধিকদিন স্থায়ী হ'তে দেয়না।—"বৌদি আমি এসেছি"—বলতে বলতে সে অপেক্ষামাত্র না ক'রে সটান একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। পাঞ্চালী যদি একটু জড়োসড়ো হ'য়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিতে যায়, গাঙ্গুলি অমনি হাসতে হাসতে বলে—"ছি-ছি বৌদি, ঘোমটা টানা অতি সেকেলে স্টাইল। আজকালকার স্টাইল কী তা জানেন তো? মাথায় কাপড়টা নিশ্চয় একটু দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা খোঁপার ওপর পর্যন্ত এসেই থেমে যাবে, আর এক চুলও এগোবে না। এমনভাবে থাকবে যেন একটু ঘাড় বেঁকালেই কাপড়টা খ'সে পড়ে, তখন যেন আবার অন্যমনস্কেই সেটা তুলে দাও কিংবা অন্যমনস্কেই সেটা তুলতে ভুলে যাও, যখন যেমন অভিরুচি। বুঝেচেন তো প্রক্রিয়াটা?"

পাঞ্চালী তখন হাসতে থাকে, লজ্জা করতে লজ্জা পায়।

কোনো দিন বা পাঞ্চালী কুটনো কুটছে, অকস্মাৎ গাঙ্গুলি পিছন থেকে এসে হাজির।

—"ওকি বৌদি, অতো বড়ো প্রকাণ্ড একখানা বঁটি নিয়ে কুটনো কুটতে বসেছেন? আপনার ভয় করে না? হাত কেটে একেবারে দুখানা হ'য়ে যাবে, তখন আবার আমাকেই ছুটতে হবে সেলাই ক'রে দিতে। শেষকালে একটা অঙ্গহানি হ'য়ে থাকবে।"

—"বড়ো বঁটি না হ'লে আমি তরকারি কুটতে পারি না।"

—"ছাড়ুন ছাড়ুন, ওসব কি আপনার কাজ? ও চাকরে করবে। আমরা এসে দেখবো কোথায় যে আপনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন, কিংবা ছবি আঁকছেন, কিংবা হয়তো ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কাব্যচর্চা করচেন, তা নয় প্রকাণ্ড একটা বঁটি নিয়ে তরকারি বলিদান। সুন্দরীর হাতে ঐ বঁটি দেখলে কি কাব্যলক্ষ্মী স্থির থাকতে পারে? একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে বেচারাকে আপনারা আর আমল দিচ্ছেন না ব'লেই

তো তিনি আপনাদের ছেড়ে আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রে বসেছেন। উঠুন ওখান থেকে, বরং আমাকে একটু চা তৈরি ক'রে খাওয়ান। ঐ বরং একটা অতি-আধুনিক কলাবিদ্যা। মন যার মিষ্টি, তার হাতের চা-ও হয় মিষ্টি। যারা সমজদার লোক তা'রা খেলেই বুঝতে পারে চা প্রস্তুতকারিণীর অন্তঃকরণটি কেমন। মনে করবেন না খোশামোদ করছি, কিন্তু আপনার হাতের চায়ের প্রতি আমার লোভ আছে। সেইজন্যেই এলুম।"

পাঙ্কালী তাড়াতাড়ি উঠে স্টোভ জ্বালতে যায়। গাঙুলি আবার বাধা দিয়ে বলে—

—"ও কাজটি কক্ষনো করবেন না। যদি একবার আগুন ধ'রে যায় তাহ'লে ঐ সুন্দর মুখখানা একেবারেই মাটি হ'য়ে যাবে, হাজার মাথা খুঁড়লেও আর ফিরে পাবেন না। চা খাওয়াতে গিয়ে নিজের মূলধনটি খুইয়ে ব'সে থাকবেন। আপনার কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই দেখছি। স্টোভের ত্রিসীমানায় আপনাদের যাওয়া উচিত নয়। আপনি সরুন, আমিই স্টোভ জেলে দিচ্ছি।"

মেয়েদের সম্বন্ধে গাঙুলির অভিমত একরকম, কিন্তু তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে অন্যরকম। আমি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যাই।

একদিন দুপুরে আমি কাজ থেকে বাসায় ফিরেছি, পাঙ্কালী আমার জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছে। এটা ওর নিত্যকর্মের মধ্যে। সেদিন ঐ সময়টিতেই গাঙুলি এসে উপস্থিত হোলো। বললে—"বৌদি, আমায় এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা জল দিন তো।"

পাঙ্কালী বললে—"একটু দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে জল দিচ্ছি।"

গাঙুলির তখন নজর পড়লো আমার জুতোর দিকে। পাঙ্কালী ফিতে নিয়ে টানাটানি করচে দেখে সে বললে—"ছি ছি মুখার্জি, এ তোমার ভয়ানক অন্যায়। তুমি বৌদিকে দিয়ে জুতো খুলিয়ে নাও? চাকর

যদি না-ও থাকে তো নিজে খুলতে পারো না? বৌদি, তোমার জুতো খুলবে?"

আমি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম—"তা কি করবো বলো, বারণ করলেও উনি শোনেন না। ওঁর ধারণা এই যে স্বামীসেবা একটা কর্তব্য, আর জুতো পরানো এবং খুলে দেওয়া তার একটা প্রধান অঙ্গ। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার আমার কোনো অধিকার নেই। ওঁর বাপের বাড়িতে ওঁর মা-ও এই কাজ করেন দেখেছি, আর উনিও তাই করচেন। দু' একদিন চুপি চুপি নিজে জুতো খোলবার চেষ্টা ক'রেও দেখেছি, কিন্তু এমন ভাবেই উনি উল্‌টে পাল্‌টে ফিতে বেঁধে দেন যে উনি ছাড়া আর সে গেরো খোলে কার সাধ্যি? কাজে কাজেই আমি আর কিছু বলি না, উনিই বাঁধেন আবার উনিই খোলেন।"

—"হাঁ বৌদি, নিজের ছাগলকে নিজের হাতে বেঁধে রাখবেন—এই বুঝি আপনার পলিসি? পলিসিটা মন্দ নয়, কিন্তু পায়ে কেন, গলায় বাঁধুন। পায়ে বাঁধলে দড়ি ছেঁড়া শক্ত নয়, কিন্তু গলায় বাঁধলেই ছেঁড়া কঠিন। জুতোর ফিতের বদলে বরং গলার নেকটাইটা রোজ বেঁধে দেবেন।"

পাঞ্চালী কোনো জবাব দিলে না, নতমুখে একগ্লাস জল এনে গাঙ্গুলির হাতে দিলে।

গাঙ্গুলি হাসতে হাসতে বললে—"তুমি খাসা সুখে আছ মুখার্জি। বৌদি যে কেবল সুন্দরী তা নয়। অধিকন্তু উনি স্বামী-বৎসলা। তোমার ভাগ্য ভালো, দেখলে আমাদের হিংসে হয়। এইবার বুঝতে পারচি কেন তুমি একনিষ্ঠতার প্রচার ক'রে বেড়াও। একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারা সহস্রপি। বেশ বেশ, আশা করি চিরকাল বৌদির এমনি বাধ্য হ'য়েই থাকবে, ভুলেও কখনো অবাধ্য হবে না।"

পাঞ্চালী খুশি হ'য়ে উঠলো। বিজয়ীর দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে চাইলে।

বছর তিনেক মেডিকেল ওয়ার্ডে কাজ করবার পর আর আমার ভালো লাগছিল না। একঘেয়ে ধরণের কাজ চিরকাল করা যায় না। আমি কিছুদিন ধ'রে মনে মনে ভাবছিলুম যদি সার্জিক্যাল বিভাগে বদলি হ'য়ে যাবার সুবিধা করতে পারি তা হ'লে বেশ হয়। চিকিৎসা ব্যাপারের ঐ দিকটাতেও একবার যাওয়া উচিত, ওখানে অনেক শেখবার জিনিষ আছে। হয়তো নতুন কাজে লাগলে আবার মনে নতুন উৎসাহ পাওয়া যাবে। ভাবছি ওখানে ঢোকবার কী সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, এমন সময় অটলদা একদিন আমাকে বললেন—"তুমি তো মেডিকেল ওয়ার্ডে অনেক-দিন কাটালে, একবার সার্জিক্যাল দিকটা থেটে এসো না। তুমি যদি আমার জায়গায় যেতে রাজি হও, তাহ'লে আমি তোমার জায়গায় আসি। ওখানে ওপরওয়ালার সঙ্গে আমার পোষাচ্ছে না।" তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন—"তুমি হচ্ছো ইয়ংম্যান, এখনো খাটবার ক্ষমতা আছে। ওপর ওয়ালাকে যদি খুশি করতে পারো তাহ'লে ওখানে থাকলে বাইরের দুপয়সা পাবে। এখানে তো একটিও পয়সা নেই।"

হাসপাতালের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অটলদা'কে চেনে, সকলেরই তিনি অটলদা। আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র। শোনা যায় তাঁর ডাক্তারি পাশ করতে কয়েক বছর বেশি সময় লেগেছিল। তারপর থেকে তিনি এখানকার মায়া কাটাতে পারেন নি, এখানেই চাকরি যোগাড় ক'রে নিয়েছেন, এবং এতাবৎকাল এখানেই চাকরি বজায় রেখে এসেছেন। কত নতুন নতুন লোক এখানে ঢুকছে আর কিছুকাল পরে বদলি হ'য়ে বাইরে চ'লে যাচ্ছে, কিন্তু অটলদা বহুকাল ধ'রে অটল হ'য়ে বিরাজ করছেন। কলকাতায় তাঁর পিতৃস্থান নয়, কিন্তু চাকরি ক'রে তিনি

কলকাতায় একখানি বাড়ি করেছেন। যদিও নিয়মমতো হাসপাতালে কোয়ার্টার্সেই থাকেন, কিন্তু সুবিধা পেলেই বাড়ি পালান। বাইরে তাঁর কিছু প্র্যাকটিস আছে, আর প্র্যাকটিসের আদবকায়দাও বেশ জানেন হাসপাতালের ডাক্তারদেরও তিনি ডাক্তার, কারো কিছু অসুখ বিসুখ হ'লে তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করায়। ডাক্তারমহলে, ছাত্রমহলে, আর নার্সমহলে, সর্ব্বত্রই তাঁর প্রতিপত্তি। ওপরওয়ালা সাহেব এবং প্রফেসরদের কাছে ইনি অত্যন্ত বিনয়ী ও কর্তব্যপরায়ণ, এঁর ব্যবহারে তাঁরা সকলে সন্তুষ্ট, সকলেই যথেষ্ট খাতির করে। মোটাসোটা বেঁটেখাটো মানুষটি, কেশ বিরল মাথায় সযত্নে আঁচড়ানো একটু টেরি, মট্‌কার প্যান্টের সঙ্গে মট্‌কার গলাবন্ধ কোট পরেন, এ-ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় রকম পোষাক নেই। মুখখানা সর্বদাই বেজায় গম্ভীর ক'রে রাখেন, অচেনা লোক তাঁর সুমুখে এসে সহজে কথা বলতে ভয় পায়। ছাত্রদের কাছে আর নার্সদের কাছে ইনি ভুলে একবার হাসেন না, কিন্তু আমাদের কাছে রসিকতার জন্যেই ইনি বিখ্যাত। ইনি বলেন, আমরা হচ্ছি ঘরের লোক এবং আর সকলে বাইরের লোক। আমাদের কাছে একরকম মন্তব্য প্রকাশ করেন, আর বাইরের লোকের কাছে সম্পূর্ণ অন্য রকম মন্তব্য প্রকাশ করেন, অথচ দুটোই এমন গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন যে বোঝা যায় না কোনটা সত্য বলচেন আর কোনটা ভাণ করচেন।

অটলদা'কে আমরা বিলক্ষণ চিনি। এঁর মতো স্বার্থপর আর দুটি নেই, বিনা স্বার্থে ইনি কিছুই করেন না। সুতরাং এঁর প্রস্তাবে আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম। গাঙ্গুলির কাছে খবর নিয়ে জানলুম যে কথাটা সত্য। ওঁর স্বার্থে আঘাত লেগেছে, ওপরওয়ালা সার্জন ওঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে, সেইজন্যেই উনি কিছুদিন অন্য ওয়ার্ডে স'রে যেতে চান।

আমার অবশ্য এতে ভালোই হোলো, কারণ সার্জিক্যাল দিকে যাবার

জন্ম আমার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। আমি অটলদা'কে ডেকে বললুম যে তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি আছি, কর্তৃপক্ষকে ব'লে আমাদের পরস্পরের মধ্যে অদলবদল ক'রে নেওয়া যাক। অনেকেই আমাকে বারণ করেছিল ওখানে যেতে, বলছিল যে ওখানে গিয়ে আমি টি কতে পারবো না, কিন্তু আমি কারো কথা শুনলুম না। শুনলে হয়তো আমার জীবনের গতি অন্য রকম হ'য়ে যেতো।

কিছুদিন পরে অটলদা এলেন আমার জায়গায়, আর আমি গেলুম তাঁর জায়গায় হাউস সার্জন হ'য়ে। আমরা পরস্পর কোয়ার্টার্সও বদল ক'রে নিলুম।

যেদিন প্রথম আমার ওয়ার্ডের ভার গ্রহণ করলুম সেদিন গাঙুলি ওখানকার হেড নার্সের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—"ইনি আইরিণ ওয়েষ্টউইও, এখানকার হেড নার্স, আমার প্রিয় বান্ধবী।" আর আমার সম্বন্ধে তাকে বললে—"ইনি ডক্টর মুখার্জি, আমার বিশিষ্ট বন্ধু, অটলদা'র বদলে ইনিই তোমাদের হাউস সার্জন হলেন।" আমি নির্বাক হ'য়ে ঐ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খুব উজ্জল দুটি চোখ। সর্বাঙ্গ ধব্‌ধবে সাদা পোষাকে আঁটাসাটা, মাথার চুল ধব্‌ধবে সাদা নার্সের ক্যাপে আবৃত, তার মধ্য থেকে কেবল দেখা যাচ্ছে একজোড়া জীবন্ত অন্তর্ভেদী চোখ। সে চোখ দুটি স্পষ্টই যেন কথা বলছে। বলছে—"খুশি হয়েছি, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। ভালো লাগছে আমার। তোমারও কি ভালো লেগেছে?" আশ্চর্য এই প্রশ্নময়ী দৃষ্টি। আমি বুঝতে পারলুম আমার চোখও তৎক্ষণাৎ যেন কী একটা উত্তর দিয়ে উঠলো। চোখের দৃষ্টির উপর কারো অধিকার নেই, তার ভাষাকে কেউ দমন ক'রে রাখতে পারে না। কিন্তু চোখকে বুজিয়ে ফেলা যায়, তার দৃষ্টিকে অপসারিত করা যায়। আমি মুহূর্ত মধ্যে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে আমার দৃষ্টিকে অপসারিত ক'রে নিলুম।

ভারী বিব্রত হ'য়ে উঠলুম আমি। এই মেয়েরা সময়ে অসময়ে ঘরে বাইরে সর্বত্রই কি চোখের ফাঁদ পেতে বেড়ায়? এদের কি আর কোনো কাজ নেই, কেবলই মানুষকে বিব্রত করবার চেষ্টা? আমারও দোষ হয়েছে, ওর দিকে চেয়ে থাকাই আমার উচিত হয় নি। বেশিক্ষণ চোখের দিকে চাইলে সকলকেই হয়তো অমন চেনা ব'লে মনে হ'তে পারে। আর কখনো আমার দৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, এবং ঐ মেয়েটির সঙ্গে কড়া ব্যবহারই বজায় রাখতে হবে।

গাঙ্গুলি বোধ হয় আমাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। সে নার্সকে ঠাট্টা ক'রে বললে—"অতো হাঁ ক'রে দেখছ কী? তোমাদের নতুন হাউস সার্জনটিকে বুঝি পছন্দ হয়েছে?"

১৬

আমার নদীতে আবার এলো স্রোত। সার্জিক্যাল হাসপাতালে তুলো ব্যাণ্ডেজের ছড়াছড়ি, সর্বত্র আইওডিন স্পিরিটের তীব্র গন্ধ, পরিশ্রমও একেবারে প্রাণান্তকর, কিন্তু এখানে নতুন রকমের একটা আশ্বস্তি আছে যা পূর্বস্থানে খুবই কম পেয়েছি। এতদিন বিজ্ঞানের যে রাজত্বে ছিলুম সেখানে পরিশ্রমের সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি, কিন্তু এখানে তার সার্থকতাই বেশি। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কাকে বলে এখানে এসে তা আমি প্রত্যক্ষ করলুম। বিজ্ঞান এখানে আসন্ন মৃত্যুকেও নিবারণ করবার স্পর্ধা রাখে। সর্বশক্তিমান মৃত্যু স্বয়ং এই স্পর্ধাকে লাঞ্ছিত করে না, বিজ্ঞানের মর্যাদাকে সে স্বীকার করে। যুগ যুগ সাধনার ফলে সার্জারি-বিজ্ঞান এই ক্ষমতাটুকু সঞ্চয় করেছে, মৃত্যুর সীমা নির্দেশ ক'রে দিয়ে সে নিজের সার্থকতা সম্পাদন করেছে। আপন ক্ষমতা সম্বন্ধে সে এখানে অনিশ্চিত নয়, কিন্তু এখানে তার কোনো আস্ফালনও নেই। প্রকৃত ক্ষমতা যেখানে আছে সেখানে কোনো উচ্চরবের প্রচার নেই, সেখানে কাজ হ'তে থাকে নীরবে।

আমি প্রত্যহ দেখতুম, একটার পর একটা রোগী নিঃশব্দে অপারেশন-থিয়েটারে আনীত হচ্ছে, নীরবে তাদের অপারেশন হ'য়ে যাচ্ছে, তা'রা আরোগ্য নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এমনই তার সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি যে সেখানে কোনো দৈববিপাকের সম্ভাবনা নেই, কোনো ব্যতিক্রমের দুর্ভাবনা নেই। সকল দিক থেকেই বিপত্তিনিবারণের যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা। পাছে কোনো বীজাণু প্রবেশ করে,—তাই অপারেশন থিয়েটারের দেয়াল ও মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে যন্ত্রপাতি ও পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই বীজাণুরহিত ক'রে নেওয়া হয়। যে কেউ সেখানে যাবে তাদের প্রত্যেককে বীজাণুশূন্য পোষাকে আপাদমস্তক আবৃত ক'রে দেওয়া হবে, তাদের জুতোর তলায় পাছে কিছু বীজাণু থাকে তাই জুতোর উপর বীজাণুশূন্য বুট পরিয়ে দেওয়া হবে, পাছে মুখের ভিতর থেকে কিছু বেরিয়ে আসে তাই মুখোস দিয়ে মুখ পর্যন্ত ঢাকতে হবে। হাতে পরানো হবে বীজাণুসম্পর্কশূন্য দস্তানা। অস্ত্রপ্রয়োগের স্থানে মাখানো হবে বীজাণু-ধ্বংসকারী ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ। বীজাণুবিশুদ্ধ হাতে শোধনকরা অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে রোগীকে অপারেশন করা হবে। অপারেশনের অস্ত্রশস্ত্রও অসংখ্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যত রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার সমস্তগুলিকেই নিবারণ করবার উপায় থাকবে হাতের কাছেই প্রস্তুত। বিজ্ঞান এখানে কোনো ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়, সাফল্যকে এখানে যথাসম্ভব নিশ্চিত রাখতে হবে, সংপ্রাংশকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেওয়া হবে না।

এই সাফল্যের রাজত্বে এসে আমার মনেও সেই সাফল্যের সুরে সুর বাঁধা হ'য়ে গেল। ব্যর্থতার গ্লানি যেখানে কম, সেখানে আপনা থেকেই আত্মপ্রত্যয় আসে।

এখানকার প্রধান সার্জন মিষ্টার বনারজি। 'ডক্টর' বললে তিনি চ'টে যেতেন, বলতেন তিনি শুধুই মিষ্টার বনারজি। চেহারা নিতান্ত সাধারণ, পোষাক-পরিচ্ছদ অনাড়ম্বর, কিন্তু তবু তাঁর নামে সকলে ভয়ে কাঁপতো।

তিলমাত্র বিচ্যুতি কোথাও সহ্য করবেন না, কোনো ওজর তিনি শুনবেন না, প্রয়োজনীয় কথার একটিও বেশি তিনি বলবেন না, কখনো কারো সঙ্গে হেসে কথা কইবেন না। নির্দিষ্ট সময়টিতে আসবেন, অপারেশন করবেন, লেকচার দিয়ে চ'লে যাবেন। আর অপারেশনের সময় সে কী তাঁর নিবিষ্টচিত্ততা! লক্ষ্যভ্রষ্ট কখনই হবেন না, সকল রকম বিঘ্নের জন্যই তিনি প্রস্তুত। অপারেশনে ভুল তাঁর খুবই কম হয়, কিন্তু যদি কখনো হোলো, তিনি বিচলিত হবেন না, তৎক্ষণাৎ অবিচলিতহস্তে সংশোধন ক'রে নেবেন। তাঁর সহকারীদের মধ্যে কেউ যদি অমনোযোগী হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি তা জানতে পারবেন, তখনই তার প্রতিবিধান করবেন, কিন্তু কাজ ঠিক চলতে থাকবে। কেউ যদি ভোঁতা অস্ত্র বা ভুল অস্ত্র তাঁর হাতে দেয়, তখনি সেটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। মুখে কিছু না বললেও সকলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠবে। কেউ যদি বার বার অমনোযোগী হয়, তাকে তিনি সরিয়ে দেবেন। ডক্টর গাঙ্গুলিকে তিনি এইজন্যই পছন্দ করতেন, তার কাজ ছিল নিখুঁত, তাকে কখনো কাজে অমনোযোগী হ'তে দেখা যায় নি।

প্রকৃত সার্জন এইরকমই হওয়া উচিত। সার্থক বিজ্ঞান যার হাতে দায়িত্ব-অর্পণ করেছে, একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে সেই বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে তার চরিত্রও অমনি নীরস আর কঠোর হ'য়ে যায়। হয়তো তাকে আমরা অস্বাভাবিক বলবো, কিন্তু সার্জারির বিজয়পতাকা যাকে প্রতিদিন অতি সাবধানে বহন ক'রে নিয়ে চলতে হয়, সে আর সাধারণের মতো ঢিলেঢালা অগোছালো অক্ষম মানুষ থাকতে পারে না।

অনেকেই এঁর রুক্ষ মেজাজের জন্য এঁকে আন্তরিক ভয় করতো, কিন্তু আমার কিছুমাত্র ভয় হোলো না। আমি এঁর চরিত্রটিকে চিনতে পারলুম ব'লে আপনা থেকেই আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা জন্মালো। যিনি প্রকৃত কাজ চান তাঁকে কাজ দিয়েই সন্তুষ্ট করা যায়, তাঁকে ভয় করবার কিছু নেই।

বিজ্ঞানের বিজয়সংগ্রামের তিনি সেনাপতি, তিনি চান প্রত্যেক যোদ্ধা তাঁর নির্দেশমত প্রাণপণে লড়বে। আমিও তাই চাই, আমিও লড়তে চাই এই সংগ্রামে। এখানে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না, জিতবার এবং জিততে শিখবার যথেষ্ট সুযোগ আমি এখানে পাবো।

নতুন উদ্যমের সঙ্গে আমি কাজে লাগলুম। আমার মনে প্রবল স্ফূর্তি। কোথা থেকে এই স্ফূর্তির বন্যা এলো তা আমি জানি না, কিন্তু দেখলুম পরিশ্রমেও আমার ক্লান্তি আসে না। আমার কাজে প্রধান সার্জন থেকে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রসন্ন। অস্ত্রবিজ্ঞানের সেবায় আমি নিশ্চিন্ত মনে আত্মনিয়োগ করলুম।

সকলেই আমার আদেশ মেনে চলে, কারো বিরুদ্ধেই কিছু বলবার নেই। আইরিণ ওয়েষ্টউইণ্ড নামে যে নার্সটির কথা বলেছি, সে আমার প্রত্যেকটি আদেশ নিখুঁতভাবে প্রতিপালন করে। কখন কোন্ রোগীর সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা হবে শোনবার জন্য সে তৎপর হ'য়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি কথা মনে রাখে, একবারও ভুলচুক হ'তে দেখা যায় না। আমি আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গেলুম, এমন নির্ভুলভাবে কাজ করতে আমি কোনো নার্সকে দেখি নি। তবুও তার প্রতি আমার মন বিমুখ হ'য়ে থাকে। প্রায়ই দেখতে পাই সে গাঙ্গুলীর সঙ্গে হাসি গল্প করে, অবশ্য কাজের অবসরে। তখন দেখি মেয়েটি একটু বেশি রকমের বকতে পারে আর একটু অতিরিক্ত রকমেই হাসে। আমি এতে মনে মনে বিরক্ত হই, কিন্তু এর জন্য তাকে কিছু বলা যায় না। বোধ হয় সে এটুকু বুঝতে পারে, আমাকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে যায়, আমার মুখের দিকে উৎসুক হ'য়ে চায়, সম্ভবত কোনো আদেশের প্রতীক্ষায়। আমিও গম্ভীর হই, কিছু বলবার থাকলে বলি, কিন্তু সরাসরি ওর চোখের দিকে চাইতে ইচ্ছা করি না। মনে মনে ভাবি যে ওকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, ও বুঝুক যে আমি গাঙ্গুলি নই।

একদিন একটা ব্যাপারে ঐ নার্সটিকে তিরস্কার করবার সুযোগ ঘটলো। সেদিন রাগও আমার হয়েছিল, এই উপলক্ষে সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে নিলুম।

১৭

একজন রোগিনীর একটি প্রকাণ্ড টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। টিউমারটি তার পৃষ্ঠদেশের মাংস ভেদ ক'রে হাড় পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল, তার জীবনসংশয় ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। এর অপারেশন অত্যন্ত সাবধানে করতে হয়েছে, হাড় কেটে টিউমারটিকে সমূলে নির্মূল করতে হয়েছে। এই টিউমারের এমন প্রকৃতি যে এর কণামাত্র অংশ যদি ভিতরে কোথাও থেকে যায় তবে অপারেশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, ওর থেকেই আবার মারাত্মক টিউমারের সৃষ্টি হ'তে থাকবে এবং তখন আর অপারেশনের দ্বারাও তাকে নিবারণ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হয়েছে, অপারেশনটি সমাধা করতে প্রায় তিনঘন্টা সময় লেগেছে। আমি ছিলুম প্রধান সার্জনের সহকারী, দুজনে মিলে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি যাতে রোগটি একেবারে নির্মূল হ'য়ে যায়। এর জন্য অনেক রক্তশিরা নির্মমহস্তে কেটে ফেলতে হয়েছে, অনেক রক্তপাতও করতে হয়েছে। সুতরাং রোগিনীর সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। আমি সেদিন অপারেশনের পরে অনেকবার তাঁকে দেখে এসেছি। সার্জন বনারজিও নিজে এসে সন্ধ্যার সময় দেখে গেছেন। রাত্রে আহারাদির পর শুতে যাবার পূর্বে আমি রাত্রি বারোটার সময় আবার একবার দেখে এলুম। তখনও সে ভালোই আছে, কোথাও কিছু ব্যাঘাত ঘটেনি।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি রোগিনীর নাড়ী দুর্বল, আর পূর্বদিনের ব্যাণ্ডেজের উপর আরো অনেকগুলো নতুন ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। ব্যাপার কী? আমি তৎক্ষণাৎ নার্সকে ডেকে পাঠালুম। আইরিণ এসে উপস্থিত হোলো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"এত ব্যাণ্ডেজ জড়ানো কেন?"

—"আগেকার ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে গিয়েছিল।"

—"কখন ভিজে গেল? তখনই আমাকে খবর দাও নি কেন?"

—"আপনি রাত্রি বারোটায়, ওকে দেখে গেছেন, তখনও কিছুই হয়নি। রাত্রি একটার সময় আমি দেখলুম ব্যাণ্ডেজ ভিজেছে। ভাবলুম যে তুলোর প্যাড দিয়ে বেঁধে রাখলেই রাত্রের মতো কাজ চ'লে যাবে, তার পর আপনারা সকালে এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। সবেমাত্র বারোটার সময় আপনি গেছেন, আবার রাত্রি একটায় আপনাকে বিরক্ত করবো, সেটা উচিত নয় মনে করলুম।"

ইতিমধ্যে গাঙ্গুলি এসে উপস্থিত হোলো। সে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"কী হয়েছে? সকালেই এত গরম মেজাজ কেন?"

আমি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নার্সকে রুক্ষভাবে বললাম—"তোমাকে এত বিচার-বিবেচনার অধিকার কে দিয়েছে? গোলমাল কিছু দেখলেই আমাকে খবর দিতে হবে, এই তোমাদের কর্তব্য। যতবার দরকার হবে ততবার আমাকে ডাকবে। কেন তুমি এখানে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়েছিলে?"

—"বারবার ঘুম থেকে তুলে আনা কোনো ডাক্তারই পছন্দ করেন না। অটলবাবুও তাতে বিরক্ত হতেন।"

এই সময় আমি রোগিনীকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করছিলাম। রোগিনীর পিঠের দিকে হাত দিয়ে দেখি যে সেখানে নতুন ব্যাণ্ডেজটাও রক্তে ভিজে গেছে। নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে কোথাও রক্তপাত হচ্ছে

আমার অত্যন্ত রাগ হোলো। নার্সকে দেখিয়ে বললুম—"এই দেখ কী কাণ্ড হয়েছে। ওর যদি জীবনের ক্ষতি হয় সেজন্যে কে দায়ী হবে?"

নার্স আর একটিও কথা বলতে পারলে না, নতমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাঙ্গুলিও প্রথমটায় চুপ ক'রে রইলো। তারপর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—"থাক থাক, এতটা রাগ করা ভদ্রলোকের রীতি নয়। যাকে তুমি তিরস্কার করছো সে একজন মহিলা, একথা ভুলে যেওনা। চলো, আর সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। ওকে এখনই অপারেশন-থিয়েটারে নিয়ে চলো, সার্জন আসবার আগেই আমরা দুজনে মিলে সেলাই খুলে রক্তটা বন্ধ ক'রে ফেলি। সার্জন এসে যদি দেখে তাহ'লে আর রক্ষা রাখবে না।"

তাই করা হোলো। রোগিনীকে আবার ক্লোরোফরম ক'রে সেলাই খুলে দেখা গেল একটা শিরার বাঁধন খুলে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছে, সেটা বেঁধে আবার সেলাই ক'রে দেওয়া হোলো।

সেদিনকার সমস্ত কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পর আমরা কয়েকজনে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করচি, এমন সময় নার্স আইরিণ এসে আমাকে বললে—"আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

—"কী বলতে চাও বলো।"

—"একটু আড়ালে বলতে চাই। যদি আপনার সময় থাকে তাহ'লে একবার অফিসঘরে চলুন।"

আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

সে বললে—"আমি অন্যায় করেছি স্বীকার করছি। দোষ করলে অবশ্যই আমাকে তিরস্কার করবেন, কিন্তু কেবল এইটুকু বলতে চাই যে পাঁচজনের সামনে আমাকে অমন ক'রে অপদস্থ করবেন না। যা

বলতে হয় আড়ালে বলবেন। আপনি জানবেন যে আমি অন্য নার্সদের মতো নই। এই হাসপাতালে আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তার আমাকে একটি উঁচু কথা বলতে সাহস করেনি।"

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম চোখ দুটো চকচক্ করছে, কিন্তু সে অশ্রুতে নয়, ওর চোখে একটা অসাধারণ রকমের জ্বালা। নিরুদ্ধ শক্তিময়ী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। দৃষ্টির দ্বারা যে মানুষকে ভস্মসাৎ করা যায় তার কতক আভাস যেন ওর দৃষ্টিতে পাওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবলুম এই মেয়েটির চোখে এমন তেজ কোথা থেকে এলো ?

গম্ভীর হ'য়ে আমি বললাম—"তোমার অনুরোধ আমার জানা রইলো। কিন্তু আশা করি ভবিষ্যতে আর কখনো তোমাকে তিরস্কার করবার প্রয়োজনও হবে না। অন্যায় করলেই শাস্তি পেতে হয় এটা জেনে রেখো। অপমানকে যদি সত্যই অপছন্দ করো তাহ'লে সকল দিক বুঝে চলবে।"

—"কাজের কোনো ত্রুটি আমি কখনই করি না। কিন্তু আপনাকে আমি কেমন ক'রে চিনিবো ? নিজের সুবিধার দিকটা সকলেই খোঁজে, এইই বরাবর দেখে আসচি। যাই হোক এইবার বুঝে নিলাম আপনি কী পছন্দ করেন। যতই কেন দোষ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করুন কর্তব্যের অবহেলা আর কখনই পাবেন না, এই ব'লে রাখলুম।"

—"এখানে আমার বা তোমার পছন্দের কোনো কথা নেই। রোগীর কথাটাই আগে ভাবতে হবে, রোগীর যাতে উপকার হয় সেইটাই দেখতে হবে সকলের আগে। নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবলে এখানে মোটেই চলবে না। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম তাহ'লে পণ্ড হ'য়ে যাবে। আজ দেখলে তো কী কাণ্ড হচ্ছিল ?"

—"ওরকম কাণ্ড হাসপাতালে অনেক হ'য়ে থাকে, ডাক্তারেরা সেগুলো অনায়াসে ম্যানেজ ক'রে নেয়। কিন্তু সে কথা যাক, আপনি যা বলচেন তা ঠিক তো? ঐ রকম কথা ছাত্রদের লেকচার দেবার সময় আপনারা ব'লে থাকেন, বটে, অনেকবারই শুনেছি, কিন্তু যখন আমাদের কাছে কাজের ব্যবস্থা দিয়ে যান তখন ঐ আদর্শ মেনে চলতে তেমন দেখা যায় না। আমার এতদিন এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, সেইজন্যেই আপনাকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছি।"

অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে আমি বললাম—"তোমার অভিজ্ঞতার কোনো দাম নেই। আমি যা বলছি তাই ঠিক, রোগীর উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখে আইনমতো কাজ ক'রে যাবে, কোনো দিকে মাথা ঘামাবার তোমার দরকার নেই। আশা করি এই কথাটা তুমি মনে রাখবে, অন্তত যতদিন আমার সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে হবে।"

—"বেশ, আমার মনে থাকবে"—এই ব'লে সে ঠোঁটদুটি ফুলিয়ে মাথা নীচু ক'রে চ'লে গেল। অমি মনে মনে একটু হাসলুম।

এর পর থেকে আমার অসময়ে ডাক পড়ার মাত্রা কিছু বেড়ে গেল। এমনও হয়েছে যে কোনো রোগীর জন্যে রাত্রে একবার ডাক পড়েছে, ঘণ্টাখানেক পরে আবার ডাক পড়েছে। অবশ্য বিনাকারণে একবারও না, প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু প্রয়োজন ঘটেছে। কিন্তু অনেক সময়ে সে প্রয়োজন এতই সামান্য যে আমাকে না ডাকলেও চলতো। তবু আমি একবারও বিরক্ত হই নি, একবারও প্রয়োজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিনি। আমি বুঝেছিলুম যে আমার ধৈর্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষাই হোক আর দায়িত্ব দূর করবার জন্যই হোক, আমলে কখনো আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিনি। তখন কাজে আমার প্রবল উৎসাহ, যতবার ডেকেছে ততবারই মনে হয়েছে যে ভালোই করেছে। তাও বটে, আর দেখিয়ে দেবার ইচ্ছাও ছিল যে পরীক্ষায় আমি কখনো পশ্চাৎপদ নই।

রোগীর উপকারের জন্য যতবার প্রয়োজন ততবারই আমি হাজির হতে প্রস্তুত আছি। কোনো শক্ত রোগী থাকলে নিজেই আমি সেটা প্রমাণ ক'রে দিয়েছি। গভীর রাত্রে ইনজেকশন দিয়ে নার্সকে ব'লে এসেছি,—এই রোগীকে ভোর পাঁচটার সময় আবার ইনজেকশন দেওয়া দরকার, আমি নিজে এসে ইনজেকশন দিয়ে যাবো, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখবে। তারপর ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঠিক পাঁচটার সময় হাসপাতালে গেছি, দেখেছি নার্স ও যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারে বারেই আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে কাজে কখনো আমি অসন্তুষ্ট হই না, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা করেছি কতক নতুন কাজের টানে, আর কতক সামর্থ দেখাবার ঝোঁকে। আরো যদি কিছু কারণ থাকে তো সেটা আমার অগোচর।

পাঞ্চালী ইদানিং আর এ সম্বন্ধে কিছু বলতো না। আমি ভাবলুম যে এই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারটা ক্রমশ সে অভ্যাস ক'রে নিয়েছে।

১৮

কয়েকমাস পরে শুনলুম কর্ণেল লাইট লম্বা ছুটিতে বিলাত চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় অন্য লোক আসছে। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একথা সেকথার পর বললাম তাঁর কোনো একটা স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে রাখতে চাই। মনে করেছিলাম তাঁর একটা ফটো চেয়ে নেবো। কিন্তু তিনি নিজেই বললেন—"আমার মাইক্রোস্কোপটা তুমি কিনবে? ওটা আমি বেচে দিয়ে যাবো ভেবেছিলুম। রিসার্চ করবার পক্ষে অমন চমৎকার বাইনোকিউলার মাইক্রোস্কোপ এখানে সহজে পাওয়া যায় না, ওটা

আমি হাজার টাকা দিয়ে জার্মানি থেকে আনিয়েছিলুম। অনেক দাম, কিন্তু তুমি যদি নিতে চাও তো নাও, যা তুমি দিতে পারো তাই দিও।"

আমি বললাম—"তিনশো টাকা পর্যন্ত আমি দিতে পারি, তার বেশি ক্ষমতা নেই। মাইক্রোস্কোপ একটা রাখা আমার নিশ্চয়ই দরকার, আপনারটা পেলে খুব ভালোই হোতো।"

—"আচ্ছা তিনশো টাকাই দিও। ওটা তোমার জন্যই রইলো, আর কাউকে বেচবো না।"

ঝোঁকের মাথায় বললাম তো তিনশো টাকা দিতে পারি, কিন্তু নগদ টাকা আমার হাতে তখন কিছুই নেই। যা সামান্য মাহিনা পাই তা প্রত্যেক মাসেই খরচ হ'য়ে যায়, কিছুই জমে না। তিনশো টাকা এখন কোথায় পাই?

বাবার কাছে চাইতে লজ্জা হোলো। চাকরি হওয়া পর্যন্ত বাবাকে কিছু দিইনি, নিজেই সমস্ত খরচ করেছি। অনেক অর্থব্যয় করিয়ে তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়েছি, হঠাৎ আবার এখন তাঁর কাছে টাকা চাওয়া ভালো দেখায় না। আর চিঠি লিখে তাঁর কাছে টাকা পেতেও অনেক বিলম্ব হ'য়ে যাবে। আমি দাদার কাছে গেলাম। কিন্তু দাদা বললে যে মাস কাবারের সময়, তাঁর হাতে একটিও পয়সা নেই, তিনশো টাকা তো দূরের কথা। বৌদিদির কানে কথাটা প্রবেশ করলো। বৌদিদি বললে—"টাকা কী হবে গো ঠাকুরপো?"

—"দরকার আছে।"

—"কী দরকারটা শুনিই না?"

—"একটা যন্ত্র কিনতে হবে।"

—"ও তাই, আমি বলি বুঝি পাঞ্চালীর নতুন গয়না কিনছো। তা বেশ তো, যন্ত্র কিনে টাকাটা পরে শোধ করলেই হবে, এত তাড়া কী?

—"আমাদের সাহেব বিলাত যাচ্ছেন, তাঁরই যন্ত্রটা কিনে নিচ্ছি।"

—"বেশ তো, বিলাতেই না-হয় পরে টাকাটা পাঠিয়ে দিও। সাহেব কি আর তোমায় একটু বিশ্বাস করতে পারবে না?"

—"না, সে হয় না। থাক, আমি অন্য জায়গায় দেখি।"

কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছে গেলাম, কারো কাছে টাকা পেলাম না। নৃপেনের কাছেও গিয়েছিলাম, সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, কিন্তু বললে তাদের হাতেও এখন নগদ টাকা নেই।

আমি বড় মুশকিলে পড়লুম। পরের দিন সকালে হাঁসপাতালে গিয়ে দেখি গাঙ্গুলি আইরিণ নার্সের সঙ্গে খুব গল্প জমিয়েছে। গাঙ্গুলিকে দেখেই মনে হোলো ওর কাছে একবার ব'লে দেখা যাক্। বললাম— "আমাকে তিনশো টাকা ধার দিতে পারো?"

—"কত বললে, তিনশো? তিন টাকা চাও তো দিতে পারি। আমার হাতে কি কখনো টাকা থাকে, তুমি জানো না?"

—"বড়ো বিপদে পড়েছি, কারো কাছেই পাচ্ছি না। অথচ টাকাটা আমার নিতান্তই দরকার।"

—"আইরিণের কাছে চেয়ে দেখতে পারো। ওর কাছে টাকাকড়ি থাকে, আমার দরকার হ'লেই আমি ওর কাছে পাই।"

—"না, ওর কাছে আমি চাইতে পারবো না।"

—"আচ্ছা আমিই বলছি,"—এই ব'লে ও আইরিণকে জিজ্ঞাসা করলে—"ডক্টর মুখার্জিকে তিনশো টাকা ধার দিতে পারো? ওঁর দরকার পড়েছে।"

—"কখন আপনার চাই?"

—"আজ পেলে আজই চাই। কিন্তু তুমি এর জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমার নিজের কাছেই আছে, না অন্য কোথাও থেকে এনে দেবে? তা হ'লে আমার দরকার নেই।"

—"আচ্ছা।"

এর পর আর আমি আর কিছুই বললাম না, আইরিণও কিছু বললে না। আমি ভাবলাম এইটুকু কথার উপর বিশেষ কিছুই নির্ভর করা যায় না। স্ত্রীলোকের মন, অসতর্কে যা বলেছে তা হয়তো ভুলেই যাবে, তারপর আমি আর দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে পারবো না। বলতে গিয়ে যদি শুনি—ভেরি সরি, জোগাড় করতে পারলুম না,—সে আমি সহ্য করতে পারবো না।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর আমি অন্যত্র টাকার চেষ্টায় বেরুলাম। বিফলমনোরথ হ'য়ে বৈকালে যখন ফিরলাম তখন দেখি আমার বাসার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ওয়ার্ডের বৃদ্ধ কুলিসর্দার। ভাবলুম কোনো জরুরি তলব পড়েছে বুঝি। দেখলাম তা নয়, আইরিণ নার্স ওর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে তিনশো টাকার নোট। লোকটা অনেকক্ষণ আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলুম। ব্যাপারটা হয়তো শুনতে এমন আশ্চর্য কিছুই নয়, কিন্তু আমি জানি এইটুকু বাক্‌সত্য রক্ষা করাই আজকাল বিরল। প্রয়োজনের সময় টাকার সাহায্য আপনার লোকেও করে না, আর যদি বা উপরোধে প'ড়ে কেউ কথা দিয়ে ফেলে, সে কথা রক্ষা করতে প্রায়ই পারে না। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলুম না, এতে আজকাল দোষ নেই, প্রায়ই এটা হয়। কিন্তু কেন জানি না, আমার এতে বিসদৃশ ঠেকে। আমার ধারণা, যা বলবো তা স্মরণ রাখবো আর পারতপক্ষে সেটা বৃথা হ'তে দেবো না,—এটুকু সভ্যচিত্ত মানুষের প্রধান নিদর্শন। যাই হোক, মেয়েটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা হোলো। শ্রদ্ধা বলতে যা বোঝায় সে রকম মনোভাব আমার এতাবৎ কোনো স্ত্রীলোকের প্রতিই হয় নি, বয়স হওয়া পর্যন্ত ওদের আমি একটু ছোটো ক'রেই দেখে এসেছি। বোধ করি এই প্রথম একটি মেয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মালো। টাকাটা হাতে পেয়ে আমি অনেক কথাই ভাবলুম। সংসারে এমন

ভালো মেয়েও অনেক আছে,—যাদের ওপর আস্থা করা চলতে পারে, যারা বাজে কথা কয় না, যারা ভদ্রতা জানে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা স্বাভাবিক, প্রয়োজনের সময় টাকা হাতে পেলে লোকের অমন অনেক কথাই মনে হয়।

১৯

এর পর থেকে আমি আইরিণের সঙ্গে একটু স্বতন্ত্র রকমের ব্যবহার করতুম, সচরাচর অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি সেরকম নয়। ভাবলুম যে একটু স্বতন্ত্র শ্রদ্ধা পাবারও যোগ্য। আগে কিছু বিদ্বেষের ভাব এসেছিল, সেটা পরিত্যাগ ক'রে মনে মনে ওর সঙ্গে একটা সন্ধিস্থাপনা ক'রে নিলুম। দেখা হ'লেই আমি হাসিমুখে অভিবাদন করতাম এবং অভিবাদন গ্রহণ করতাম, অবসর থাকলে ওর সঙ্গে গল্পও করতাম। ক্রমে ক্রমে কিছু ঘনিষ্ঠতা জন্মালো। ক্রমে ক্রমে আমি দেখলাম যে এ মেয়েটি বাস্তবিকই নিতান্ত সাধারণের মতো নয়, এর মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে। শিক্ষাদীক্ষা এর বেশ আছে, দুনিয়ার অনেক খবর রাখে। কথাও যেমন বলতে জানে তেমনি আবার বাক্যসংযম করতেও জানে। ইংরেজী কথার উচ্চারণগুলি অতি পরিষ্কার, নির্ভুল। স্বভাবটি মিশুক, কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ বিলক্ষণ আছে, সেখানে অল্প কিছু আঘাত পেলেই সাবধান হ'য়ে যায়।

কাজকর্মের পরে যেদিন হাতে সময় থাকতো সেদিন আফিসঘরে আমাদের একটা আড্ডা বসতো। সেখানে আমি থাকতুম, ডক্টর গাঙ্গুলি থাকতো, অটলদা'ও মাঝে মাঝে এসে জুটতেন, হাতের কাজ খালি থাকলে আইরিণও সেখানে এসে উপস্থিত হোতো এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

আমাদের গল্পে যোগ দিতো। বলতে বললে সে সহজে বসতে চাইতো না, বলতো—আপনারা বসুন না, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে মাঝে সে আমাদের চা ক'রে এনে খাওয়াতো, গরমের সময় বরফ-লেমনেড বিতরণ করতো। অটলদা থাকলে আড্ডাটা আরো জমতো ভালো। তিনি অনেক মজার মজার গল্প বলতেন, আমরা হাসতে হাসতে অস্থির হ'য়ে উঠতুম। আইরিণ এই গল্পগুলো শুনতে খুব ভালবাসতো। অটলদা'কে সে গল্প বলবার জন্য প্রায়ই অনুরোধ করতো। যেদিন অটলদার ওকে তাড়াবার ইচ্ছা হোতো সেদিন তিনি গল্পের মধ্যে কিছু অশ্লীলতার অবতারণা করতেন। আইরিণের প্রথমটায় বুঝতে কিছু বিলম্ব হোতো কিন্তু বুঝতে পারলেই সে আর দাঁড়াতো না, তখনই চ'লে যেতো।

একদিনকার আড্ডার বিবরণ বলি।

সেদিন অটলদা তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা খুব হাসির গল্প বলছিলেন। কবে যেন তিনি, হঠাৎ বাড়ি গিয়ে দেখেন যে তাঁর স্ত্রী একজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিয়ে যাগযজ্ঞ করাচ্ছেন। এক ধামা চাল, ডাল, ঘি, নানারকমের ফল, একজোড়া কাপড়, একটা রূপার রেকাবিতে ভরি সোনা। ব্যাপার কী? অটলদা'র স্ত্রী কিছুতেই বলবেন না,—কেবল বলেন তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, পরে বলবো। অবশেষে খবর নিয়ে জানা গেল এই ব্রাহ্মণ আগের থেকেই দু'চারবার আনাগোনা করেছে। সে নাকি খুব ভালো গণনা করতে জানে। অটলদা'র স্ত্রীর হাত দেখেই ব'লে দিয়েছে যে ওঁর স্বামী একজন ভারী ডাক্তার, তিনি হাঁসপাতালে চাকরি করেন, তাঁর সকল বিষয়েই ভালো লক্ষণ দেখা যায়, কেবল সম্প্রতি একটু চরিত্রদোষ ঘটেছে। হাঁসপাতালে একজন স্ত্রীলোক আছে, সে নাকি ডাইনিমন্ত্র জানে, অটলদা'কে সে তুক্‌তাকের দ্বারা একেবারে বশ ক'রে ফেলেছে, তাই আজকাল তিনি রাত্রে প্রায় বাড়ি আসতে পারেন না। কিন্তু তাতে কোনো ভয়ের কারণ নেই, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের এমন মন্ত্র জানা আছে যাতে অটলদা'র

খোঁয়, কেটে যাবে, আর মারণমন্ত্রের জোরে স্ত্রীলোকটি শয্যাগত হ'য়ে পড়বে। সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা। ব্যাপারটা শুনে অটলদা ভয়ানক চ'টে গিয়ে ব্রাহ্মণকে চেপে ধরলেন। লোকটার কথাবার্তা শুনে তাকে যেন পরিচিত ব'লে বোধ হোলো। ভালো ক'রে চেয়ে দেখেন সে তাঁরই ওয়ার্ডের একজন পুরানো রোগী, ওঁর চিকিৎসায় সে অনেকদিন ছিল, মুখে দাড়ি গজিয়েছে ব'লে প্রথমটায় চেনা যায় নি। লোকটা আসলে ব্রাহ্মণ নয় এইরকম দৈবজ্ঞ সেজে লোককে ঠকিয়ে বেড়ায়। কেমন ক'রে সে অটলদা'র বাড়ির সন্ধান পেয়েছে, এখন তাঁরই সর্বনাশ করতে বসেছে। অটলদা'র স্ত্রীর বিশ্বাস জন্মিয়ে আগেই সে দশ টাকা আদায় করেছে, তারপর আবার এই যাগযজ্ঞের আয়োজন। তাকে ধ'রে অটলদা পুলিশে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কান্নাকাটি করতে লাগলো, বললে নিতান্ত পেটের দায়েই মায়ের কাছে কিছু খোরাকি জোগাড় করতে এসেছিল, কোনো-রকম অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় নয়। অটলদা আর কী করবেন, কান মলে দুটো চড় দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

গল্প শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলুম। অটলদা গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"তোমরা অমন হেসো না, এর মধ্যে একটা কথা আছে। মেয়েরা জগতের সকল লোককেই অতি সহজে বিশ্বাস করবে, কেবল নিজেদের স্বামীকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেন বলো দেখি এমন হয়?"

আইরিণ বললে—"সকল মেয়েদের নামে দোষ দিয়ে আপনি ওরকম একটা মন্তব্য করতে পারেন না। আপনি ক'জন মেয়ের কথা জানেন?"

—"সকলের কথা কেমন ক'রে জানবো, কিন্তু অনেক ডাক্তারের ঘরের খবর আমার জানা আছে। বেশির ভাগ ডাক্তারকেই তাদের স্ত্রীরা বিশ্বাস করে না। তাদের চরিত্রেও বিশ্বাস করে না, তাদের চিকিৎসাতেও বিশ্বাস করে না। এই তো তোমাদের ডক্টর মুখার্জি রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, আমি যা বলেছি তা ঠিক কি না।"

—"ওরকম ব্যক্তিগত ভাবে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তবে ডক্টর মুখার্জির স্ত্রী যে খুব ভালো সে কথা আমি নিশ্চিত জানি। আপনার ঐ মন্তব্যটি তাঁর সম্বন্ধে খাটবে না।"

—"কী গো ডক্টর মুখার্জি, তুমি বলো না আমার কথাটা ঠিক কি না? আমার এত বয়সের অভিজ্ঞতা এই মেয়ে উল্টে দিতে চায়।"

আমি তখন বললাম—"আপনার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সকল মেয়েদেরই হয় তো স্বামীকে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে একটা কম্প্লেক্স থাকে, তবে তার মাত্রার অনেক কম বেশি আছে।"

আইরিণ বললে—"আপনিও এই কথা বলবেন? দুচারটে মাত্রই মেয়েদের হয় তো আপনারা জানেন, কিন্তু তার থেকেই কি কোনো সাধারণ মন্তব্য করা উচিত? এমন কি কখনো আপনারা দেখেন নি, যে স্ত্রী স্বামীকে ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করে, স্বামী যা বলে তাই সে ধ্রুব সত্য ব'লে মেনে নেয়, স্বামী যদি তার সুমুখেও কিছু অবিশ্বাসের কাজ করে তবুও তার বিশ্বাস নষ্ট হয় না? এমন কি কখনই কেউ দেখেন নি?"

অটলদা বললেন—"আমি অন্তত দেখি নি, তবে প্রমাণ ক'রে দিতে পারলে নিশ্চয়ই মেনে নেবো। তুমিই বলোনা বাপু কোথায় এমন দেখেছো? নিজের কথাই তুমি বলো। তোমার স্বামী এখন নেই বটে, কিন্তু একটি ছেলে আছে। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের খানিকটা অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে এ আমরা ধ'রে নিতে পারি। তুমিই বলো, তোমার স্বামীকে অতটা বিশ্বাস করতে? এতদিন একসঙ্গে কাজ করছি, কিন্তু তোমার কোনো ইতিহাস আমরা জানি না। তোমার ইতিহাসই আজ বলো, আসামীর মুখেই তার নিজের এজাহারটা শোনা যাক। কিন্তু খবরদার মিথ্যা বলবে না, বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করো যা বলবে সব সত্য বলবে।"

—"আমার কথা ছেড়ে দিন। যে জীবন অতীত তার কথা না শোনাই উচিত। অতীত জিনিষকে মানুষ অতিরঞ্জিত ক'রেই দেখে।"

—"এই তো বাপু চাপা দিচ্ছ। সত্য কথাটি ফাঁশ করতে চাও না, পাছে তর্কে হেরে যাও। সাহস থাকে তো বলো নইলে স্বীকার করো যে হার মানলুম।"

—"মাপ করবেন, নিজের কথা আমি কিছুই বলতে পারবো না। বলতে গেলেই অনেক জিনিষ বাদ দিয়ে যেতে হবে। সমস্তটা যখন বলা যায় না তখন কিছুই বলবো না।"

গাঙ্গুলি এতক্ষণ চুপ ক'রেই আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এইবার সে বললে—"যাক্‌গে, ওর কথা যেতে দিন। ওর অনেক রকমের হেঁয়ালি আছে, আমিও বুঝতে পারি না। বোধ হয় মাথায় একটু ছিট আছে। কিন্তু আমাকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করচেন না? স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাই বরং আপনাদের চেয়ে বেশি। আমি বহু মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি সে তো সকলেই জানেন।"

—"তুমি মেশো কেবল উড্ডীয়মানা আধুনিকাদের সঙ্গে, যারা নিজেদের মনকে মোটে দানা বাঁধতেই দেয় নি। তুমি জানো কেবল তরল মনের ব্যাপার, ক্রিষ্ট্যালের খবর তুমি কেমন ক'রে জানবে হে ছোকরা?"

—"আধুনিকাদের মধ্যে বুঝি ক্রিষ্ট্যাল নেই? এ আপনার অন্যায় কথা। স্ত্রীলোকমাত্রেরই ক্রিষ্ট্যালাইজ করার দিকে স্বাভাবিক টেন্‌ডেনসি থাকে, তরল অবস্থায় ওরা বেশিদিন টিকতে পারে না। স্ত্রী হবার দিকেই ওদের স্বাভাবিক প্রবণতা। হবোনা হবোনা করতে করতেও দেখা যায় ওরা একসময় মনে মনে স্ত্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ছাড়ানো দায়। আপনারা মনে করেন আধুনিকাদের স্ত্রী-হৃদয় নেই? আমেরিকার মতো আধুনিকা জগতে আর কোথাও নেই, আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। সেদিন নিউইয়র্কের একটি আধুনিকার সম্বন্ধে মরিস ডিকোব্রার লেখা গল্প পড়লুম, চমৎকার গল্প। মেয়েটি ঘরের কোনো

খায় খায়ে না, ফুর্তি ক'রে বর্তমান যুগের আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়ে বেড়ায়। একদিন একটা হোটেলে তার একজন রাশিয়ান কাউণ্টের সঙ্গে আলাপ হোলো, সে ভূতপূর্ব জারের আত্মীয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লেও কাউণ্টের বনিয়াদি আভিজাত্য গুণ বজায় আছে। সে দেশ ছেড়ে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমেরিকার কোনো ধনকুবেরের মেয়ে ওকে বিয়ে করতে উৎসুক, কিন্তু ওর তা পছন্দ নয়। অথচ ভদ্রতার খাতিরে সে কথা স্পষ্ট বলতেও পারে না। অগত্যা সে ঐ ধনী মেয়েটিকে পাকেপ্রকারে জানিয়ে দিতে চায় যে ইতিপূর্বেই তার গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে। এইটা সাফাই প্রমাণ করবার জন্যে সে ঐ আধুনিকাকে অনুরোধ করলে, যদি মাত্র এক সন্ধ্যার জন্য ডিনারের নিমন্ত্রণে সে ওর স্ত্রী সেজে একটু অভিনয় করতে পারে তাহ'লে ওর বড় উপকার হয়। আধুনিকা অ্যাডভেঞ্চারই চায়, সে খুশির সঙ্গে এতে সম্মত হোলো। রাশিয়ানের মতো হাবভাব শিখে নিয়ে সে কাউণ্টের প্রতি মিথ্যা অনুরাগ দেখিয়ে ডিনারপার্টিতে গিয়ে চমৎকার স্ত্রীর অভিনয় করলে। পরের দিন সেই কাউণ্ট নিউইয়র্ক ছেড়ে অন্য দেশে চ'লে গেল, যাবার সময় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মেয়েটিকে উপহার পাঠিয়ে দিল দুর্মূল্য পাথর বসানো একটি সিগারেট-পাইপ। আধুনিকা কিন্তু ঐটা পেয়ে আর কেঁদে বাঁচেনা। সে বললে, কাউণ্ট চ'লে গেল, পাইপ নিয়ে তার কী হবে? মিথ্যা অভিনয়টাই তার জীবনে সত্য হ'য়ে রইলো, আর ঐ পাইপটা তাকে যেন লজ্জা দিতে লাগলো। আমেরিকার মডার্ণ স্কাই-স্ক্র্যাপারের প্রাণহীন ফ্ল্যাটগুলোর মধ্যেও যে হৃদয়স্পন্দন চলছে, মরিস ডিকোব্রা ঐ জায়গাটায় তার সুন্দর বর্ণনা করেছে। আধুনিকাদের মধ্যে স্ত্রী হবার মতো হৃদয় নেই একথা কখনো মনে করবেন না।"

আইরিশ বললে—"আপনি বললেন আধুনিক যুগের গল্প। কিন্তু আমি শুনেছি আপনাদেরই দেশের অতি পুরাকালের ঐরকম একটা

গল্প, তাতেও মিথ্যা-স্ত্রী একদিন পরীক্ষায় সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। বাল্মীকি মুনি, যিনি আপনাদের রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তাঁর মায়ের নাম সুপর্ণা। তিনি ছিলেন একজন রাজার মেয়ে। ছেলেবেলায় খেলা করতে গিয়ে তিনি একজন বুড়ো মুনির চোখে খোঁচা দিয়ে কানা ক'রে দেন, মুনি তখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। মুনিকে অন্ধ ক'রে দিয়েছেন ব'লে তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বেচ্ছায় ঐ বৃদ্ধ মুনির স্ত্রী হলেন, সুখসম্পদ ভোগ করা ছেড়ে ঐ মুনির সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত করলেন। অবশ্য ঐ বৃদ্ধ মুনি কোনো হিসেবেই তাঁর স্বামী হ'তে পারে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি কুমারী রইলেন। একদিন অশ্বিনীকুমার নামে দুজন ডাক্তার সুপর্ণার কাছে গিয়ে হাজির, তাঁরা দেখতেও খুব সুপুরুষ। তারা বললে, মুনি তোমার মিথ্যা স্বামী, আমরা তোমার প্রকৃত স্বামী হ'তে চাই। সুপর্ণা বললেন, তা কখনই হ'তে পারে না, কারণ উনিই আমার সত্যকার স্বামী। অশ্বিনীকুমারেরা বললে—তা কেমন ক'রে হবে, মুনি তো স্থবির, অথর্ব, নড়তে পারেন না। সুপর্ণা বললেন,—তাতে কী হয়েছে, ওঁকেই আমি প্রকৃত স্বামী ব'লে নিয়েছি, আমার সমস্ত মন এখন ওঁকে নিয়েই পূর্ণ হয়ে আছে, তোমরা সুপুরুষ হ'লেও আমার মনে তোমাদের স্থান হবে না। অশ্বিনীকুমারেরা তখন খুশি হ'য়ে ঐ মুনিকে এমন ওষুধ দিয়ে গেল যাতে তিনি যৌবনশক্তি ফিরে পেলেন, তাঁর ছেলে জন্মালো বাল্মীকি। যুগে যুগেই আমরা স্ত্রী হ'য়ে আসছি আর যুগে যুগেই হবো, কিন্তু আসল কথা এই যে তার আগে ঐ রকম মুনি কিংবা কাউন্টকে আমাদের মনে লাগা চাই। যেখানে মন লেগে যায় সেখানে আমরা পরিপূর্ণ ভাবেই স্ত্রী হ'য়ে থাকি, সেখানে কোনো অবিশ্বাসেরও কারণ থাকে না। আর তা না হ'লেই যত মুশকিল।"

আমি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু আইরিণের কথাবার্তা শুনে মনে মনে ভাবলুম বাস্তব পৃথিবী কি ওর কাছে অন্য রকম? সকল কথার

অর্থ শোনবামাত্রই বোঝা যায় না, অনেক কথার অর্থ বোঝা যায় বিলম্বে। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি, আইরিণের কথার কী অর্থ ছিল।

আমাদের আড্ডায় এই রকমের গল্প বলাবলি চলতো। যার কাছে যা গল্পের ষ্টক আছে সে তাই বলতো। এই রকম ভাবে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম, আবার কাজে লাগতাম।

২০

ডক্টর গাঙ্গুলিকে আমার ভালোই মনে হোতো, কিন্তু মাঝে মাঝে ওর কতকগুলো ব্যবহার বড় বিশ্রী লাগতো। আমি বুঝতে পারতুম না, আইরিণের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কেমন ক'রে ঘনিষ্ঠ হোলো। ওর প্রকৃতির মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, আইরিণের মধ্যে তা নেই। কিন্তু পারতপক্ষে আমি ওদের ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইতুম না। যখনই দেখতাম যে ওরা দুজনে একত্রে হাসিগল্পে মগ্ন হ'য়ে আছে, তখনই সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতাম। ওরা ডাকলেও সেখানে, যেতাম না, বলতাম—"এখন একটু ব্যস্ত আছি। বন্ধুত্ব হয়েছে সে ভালোই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতায় আমার কাজ কী?

একদিন আমরা তিনজনে মিলে সিনেমা দেখতে গেলুম। এলফিনষ্টোন বায়স্কোপে চমৎকার একখানা ছবি এসেছে, সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি। গাঙ্গুলি বললে—"চলো আমরা তিনজনেই একসঙ্গে দেখে আসি।" আইরিণের সুমুখেই কথাটা উঠলো, সেও আশান্বিত মুখে বললে—"চলুন ডক্টর মুখার্জি, আপনারা গেলে আমিও যেতে পারি, একা একা পোষায় না।" আমার যদিও বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তবু বন্ধুত্বের একটা বাধ্য-বাধকতা আছে, আমি আপত্তি করতে পারলুম না।

পাঞ্চালীকে বললাম, আমি সিনেমায় যাচ্ছি, ফিরতে একটু রাত্রি হবে। সেও আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, আমি বললাম যে একজন ডাক্তার বন্ধু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন সুতরাং তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না। বরং অন্য একদিন নিয়ে যাবো। আইরিণের নামও করলাম না, গাঙুলির কথাও বললাম না। আমি জানি, যদিও অন্যায় কিছু করচি না, তবু সত্যবাদিতায় এখানে গোলমালের সম্ভাবনা আছে।

গাঙুলি তার নিজের গাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল। বইখানা সত্যই খুব চমৎকার, কিন্তু আমার দেখার বিঘ্ন হচ্ছিল। আইরিণকে মাঝে বসিয়ে আমরা দুজনে বসেছিলাম দুই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হ'য়েই বসেছিলাম, পাছে অসতর্কভাবে আইরিণের গায়ের সঙ্গে আমার গা ঠেকে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলুম যে গাঙুলি অনবরত আইরিণের কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করছে, মাঝে মাঝে তার হাতখানাও ধরছে। এ আমার মোটেই ভালো লাগলো না, মনটা বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। আমার মনে হোলো এ অসভ্যতা যদি আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না করবে, তবে আমাকে ওর সঙ্গে আনলে কেন? আর আশেপাশে যারা পাঁচজন ব'সে আছে তা'রাই বা মনে করবে কী?

সিনেমা ভেঙে গেলে বাইরে বেরিয়ে এসে গাঙুলি বললে তাকে একবার ভবানিপুর যেতে হবে। যদি আমাদের কোনো আপত্তি না থাকে তাহ'লে গাড়িতে তার সঙ্গেই আমরা যেতে পারি। সেখানে কিছুক্ষণ আমাদের গাড়িতে ব'সে থাকতে হবে, ওর কাজ শেষ হ'লে একসঙ্গে ফেরা যাবে। আইরিণের এতে কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না, বাসায় ফিরবার জন্য মনটা ব্যাকুল হচ্ছিল। আমি বললাম—

"তবে তোমরাই দুজনে গাড়িতে যাও, আমি ট্রামে ফিরে যাই। আমার স্ত্রী একলা আছে।"

আইরিণ বললে—"তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই চলুন। ট্রামে গিয়ে কাজ নেই, একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।"

—"তার দরকার নেই, আমাকে একা যেতে দিলে কিছু অন্যায় হবে না।"

—"কেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে কোনো আপত্তি আছে?"

—"না, সেজন্য নয়। মিছামিছি ট্যাক্সি ভাড়াটা খরচ হয় কেন, তাই বলছিলাম। তোমার যদি যেতে ইচ্ছা হয় তো চল।"

একটা ট্যাক্সি ডেকে আমরা দুজনে উঠলাম। আমি বসলাম একদিকের কোণ ঘেঁষে, আইরিণের পাশ থেকে অনেকখানি ব্যবধান রেখে। বাইরের দিকে চেয়ে আমি চুপ করে ব'সে রইলাম।

আইরিণ বললে—"চুপ ক'রে আছেন কেন? কথা বলবেন না?"

—"ছবিটা খুব চমৎকার, সেই বিষয়েই ভাবচি।"

—"অতো তফাতে স'রে বসলেন কেন? ভালো ক'রে বসুন না?"

—"ডক্টর গাঙ্গুলির মতো মেয়েদের গা ঘেঁষে বসা আমার অভ্যাস নেই। ওতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।"

—"মেয়েদের কাছে বসা আপনার অভ্যাস নেই? আপনার স্ত্রী যদি এই গাড়িতে থাকতেন তাহ'লেও এমনি ক'রে বসতেন?"

—স্ত্রীর সম্বন্ধে অন্য কথা। স্ত্রীর কথা নিয়ে তুলনা করাই তোমার ভুল হচ্ছে।"

"না না, তুলনা করিনি। একজন মেয়ের কাছে বসতে যদি সঙ্কোচ না হয় তবে অন্য মেয়ের কাছে হবে কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমাদের সমাজে অন্যের স্ত্রীর পাশে বসাই একটা শিষ্টাচার। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু আমি দেখেছি সিনেমাতেও আমার কাছে ব'সে আপনার অস্বস্তি হচ্ছিল।"

—"ওটা হয়তো আমার সংস্কার, কিন্তু কী আর করা যাবে? কাছে বসা কিংবা গায়ে হাত দেওয়াকেও তোমরা হয়তো মনে করতে পারো শিষ্টাচারের মধ্যে, কিন্তু আমি তা পারি না।"

—বুঝেছি, ডক্টর গাঙ্গুলির সম্বন্ধে আভাষ দিয়ে আপনি এই কথাটা বলচেন। তাঁর ঐ রকম একটু গায়ে-পড়া ভাব আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি আমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু, সুতরাং আমি জানি।"

—"আমার ওরকম পছন্দ হয় না। বন্ধুত্বের একটা সীমা আছে।"

—আচ্ছা, এবার থেকে আর সীমা লঙ্ঘন হবে না। কিন্তু আপনিও অনর্থক একটা ভুল বুঝবেন না। এটা নিশ্চিত জানবেন যে ডক্টর গাঙ্গুলির চেয়ে আপনাকে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি। যদি জানতাম যে ঐ রকম ব্যবহার দেখলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন তাহ'লে কখনই ওটুকু হোতো না।"

পরের দিনেই পাঞ্চালীকে নিয়ে গেলুম একটা দেশী সিনেমা দেখতে, একটা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি। সেদিন পাঞ্চালী চমৎকার সেজেছিল। মিশ্-কালো রংএর সিল্কের শাড়িতে তার বর্ণপ্রভা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে। পায়ে সোনালি দেওয়া চটি, কপালে সিঁদুরের টিপ, পান খেয়ে ঠোঁট দুটো লাল টুকটুক করছে, সুগন্ধি একটি রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ মোছা হচ্ছে, চোখে মুখে উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। যেন একখানি ছবি, পাঁচজনকে দেখাবার মতো। কালো পাতায় ঘেরা যেন একটি ফুটন্ত ফুল। উগ্রমূর্তি বিদেশী মরসুমি ফুল নয়, সহজলভ্য স্নিগ্ধমূর্তি দেশী ফুল। এর সৌরভ আলাদা, এর গৌরব আলাদা।

সিনেমাটা দেখতে আমার তেমন ভালো লাগে নি, কিন্তু পাঞ্চালী খুব খুশি হোলো। সেদিন বাসায় ফিরেও সে খুব স্ফূর্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাঝে মাঝে গুণ্ গুণ্ ক'রে গান অনুকরণ করবার চেষ্টা করে,

আর খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠতে থাকে। মনে মনে আমি একটা আনন্দ অনুভব করলুম। ভাবলুম আমাদের দেশের মেয়েদের খুশি করা খুবই সহজ। এরা অল্পই জানে, অল্পেই পরিতৃপ্ত হ'য়ে যায়। দৃষ্টিশক্তির পরিধি হয়তো সঙ্কীর্ণ, তাই মনের দিক দিয়ে অনেকখানি দেখার কিংবা নেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু জটিলতার চেয়ে সরলতা অনেক ভালো। পুকুরের জলে স্নান ক'রে একটা নিশ্চিত আরাম আছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাতে কোনো বিপর্যয় ঘটায় না।

২১

১৩ নম্বর বেড্এ একজন রোগিনী এসেছে, দেখা গেল তার সঙ্গে আইরিণের খুব ভাব জমেছে। মেয়েটি আইরিণের প্রায় সমবয়সী, সৌখীন এবং শিক্ষিতা। বাঙালী হ'লেও সে ইংরেজীতে বেশ কথা বলতে পারে। সম্ভবত কোনো উচ্চশিক্ষিত ঘরের মেয়ে। হাঁসপাতালের কাপড় সে পরতো না, হাঁসপাতালের খাবার খেতো না, নিজের কাপড় এবং খাদ্যাদি বাড়ি থেকে আনিয়ে ব্যবহার ক'রবার অনুমতি নিয়েছিল। রোজ দুবেলা তার নানারকমের খাবার আসতো। সে যে একলা খেতো তা নয়, নার্সদের অনেককে সে ঐ সকল খাদ্যাদি বিতরণ করতো। বেডএর পাশে তার নিজস্ব কাবার্ডে খাবার সরঞ্জাম থাকতো, আইরিণের সেখানে অবারিত অধিকার। আইরিণই নিজের হাতে ওর খাবার তৈরি ক'রে খাওয়াতো, নিজেও খেতো, এবং যাকে খুশি দান করতো।

এত কথা আমি জানতাম না। কিছুদিন ধ'রে দেখলাম প্রত্যহই আমার জন্য চা তৈরি হ'য়ে আসছে। অপারেশন প্রভৃতির পর যেমনি হাঁসপাতাল থেকে প্রধান সার্জ্জন বেরিয়ে চ'লে যায় আর আমি তাঁকে বিদায়

ক'রে দিয়ে আফিসঘরে ফিরে গিয়ে বসি, অমনি দেখি এক কাপ তৈরি-চা এসে হাজির। তখন পরিশ্রমের পর তৃষ্ণাও থাকে প্রবল, বিনা বাক্যব্যয়ে আমি খেয়ে ফেলি। চায়ের নেশার রহস্য সকলেই জানেন। নির্দিষ্ট কোনো সময়ে দিনকতক মাত্র চা খেলেই অমনি সেটা এমন বদ্‌অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় যে ঠিক ঐ সময় চায়ের জন্য মনটা উন্মুখ হ'য়ে ওঠে, পাঁচ মিনিট বিলম্ব হ'লেই মহা অস্বস্তি হ'তে থাকে।

আমি জানতুম যে আইরিণই আমাকে চা তৈরি ক'রে পাঠায়, এটা যেন সে স্থায়ী কর্তব্য হিসাবেই ধ'রে নিয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে পাঠায় তা জানতুম না, মনে করতুম ওর নিজের কোনো ব্যবস্থা আছে। কোনো কোনো দিন বিলম্ব হ'লে ভাবতুম ভুলে গেছে। কিন্তু ভুলতোনা সে কোনোদিন, শুধু মাঝে মাঝে বিলম্ব হোতো। তখন ভাবতুম এটুকু বুঝি ইচ্ছাকৃত। আমাকে এই বিলম্বের দ্বারা একটু জানিয়ে দেবার চেষ্টা। এ অবশ্য আমার মনে মনেই হয়েছে, কিন্তু মানুষের মন এমনই সন্দিগ্ধ হয়।

একদিন চা পেতে অনেক বিলম্ব হ'তে লাগলো। সেদিন গাঙ্গুলিও নেই, আইরিণেরও দেখা নেই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অফিসঘরে আমি একাই ব'সে আছি, প্রায় আধঘণ্টা হবে। তখন ভাবলুম দেখে আসা যাক ব্যাপারটা কী, আইরিণ কোন্ কাজে নিযুক্ত আছে। ঐ সময়টা তার ব্যস্ততার সময় নয়, আমি জানি।

এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি ওয়ার্ডের ১৩নম্বর বেড পর্দা দিয়ে ঘেরা, তারই কাছে আইরিণ ছটফট্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন সেখানে তার অত্যন্ত প্রয়োজন, পর্দা আছে ব'লে ভিতরে যেতে পারছে না, সেগুলো সরানোর অপেক্ষায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম পর্দাগুলো সরিয়ে নেওয়া হোলো, আইরিণ তাড়াতাড়ি সেখানকার কাবার্ড খুলে চায়ের সরঞ্জামাদি বের ক'রে নিয়ে গেল

গ্যাসের টেবিলের কাছে, সেখানে একটা কেটলিতে জল ফুটছিল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে চা তৈরি করতে প্রবৃত্ত হোলো।

বিলম্বের কারণটা আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম। ওকে কিছু জানতে না দিয়ে আমি আফিসঘরে ফিরে যাবার মনস্থ করচি, এমন সময় দেখা গেল ডক্টর গাঙ্গুলি আইরিণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দূর থেকে দেখছিলুম, সেখান থেকে কথাবার্তা কিছু শোনা যায় না। কিন্তু ভাবে বুঝলুম গাঙ্গুলি কোনো একটা রহস্যের কথা বলছে, আইরিণ সেদিকে কান দিচ্ছে না। সম্ভবত চা তৈরি করা নিবারণ করবার অভিপ্রায়ে গাঙ্গুলি ওর হাতখানা ধরলে, আইরিণ অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিলে। অনতিদূরে বুড়া সর্দার দাঁড়িয়েছিল, চা তৈরি হওয়া মাত্র পেয়ালাটা আইরিণ তার হাতে দিয়ে দিলে। আমি আর সেখানে অপেক্ষা করলুম না।

আফিসঘরে পেয়ালাটা নিয়ে উপস্থিত হওয়ামাত্র সর্দারকে বললাম—"মেমসাহেবকো সেলাম দেও।"

আইরিণ এলো। আমি তাকে বললাম—"দেখ, এইমাত্র আমি পুরো একগ্লাস জল খেয়েছি। সুতরাং চা খাবার আর আমার ইচ্ছা নেই। এটা তুমিই খাও, কিংবা অন্য কাউকে দাও। আর এবার থেকে রোজ চা তৈরি কোরো না, তার বদলে একগ্লাস জল শুধু পাঠিয়ে দিও। রোজই যে চা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই।"

মুখখানা অত্যন্ত কাঁচুমাচু ক'রে আইরিণ বললে—"বড্ডো দেরী হ'য়ে গেছে। আজকের দিনটা মাপ করুন ডক্টর মুখার্জি, আর কখনো দেরী হবে না।"

—"না না, সেকথা আমি মোটেই বলছি না। আমি বলছিলাম, রোজ রোজ এই সময় চা খেয়ে একটা খারাপ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

—"এইটুকু তো মাত্র চা দিই, এতেও আপনি আপত্তি করছেন? হোলোই বা একটু অভ্যাস, রোজই আমি দিতে পারবো। এতে আমার কোনো কষ্টও নেই, অসুবিধাও নেই। কাল থেকে এমন ব্যবস্থা করবো, যাতে একটুকুও দেরী না হয়।"

—"তা না-হয় করবে, কিন্তু কেনই বা তুমি রোজ নিয়ম ক'রে আমাকে চা খাওয়াবে? এর উদ্দেশ্যটা কী?"

—"আচ্ছা এ-কথার জবাব আমি দিচ্ছি, আগে তৈরি চা-টা খেয়ে নিন। সবটা না পারেন, অন্তত আধ কাপ খান।"

চায়ের তৃষ্ণা বিলক্ষণ হয়েছিল, আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সবটুকুই আমি খেয়ে ফেললাম। তারপর বললাম,—"কেন তুমি আমার এই অভ্যাসটি করাচ্ছো?"

—"তাতে আপনার কিছু ক্ষতি হচ্ছে কী? পরিশ্রম ক'রে আপনার ক্লান্তি আসে দেখতে পাই, তাই একটু চা ক'রে খাওয়াই। আমাদের হাউস সার্জনকে একটু চা দিচ্ছি, আমার ভালো লাগে তাই দিচ্ছি, এই তো সোজা কথা।"

—"তুমি বোঝো না, এই সামান্য কথা নিয়েই পাঁচজনে পাঁচরকম মনে করতে পারে।"

—"আমার অতো বুঝে কাজ নেই। সামান্য কথাকে টেনে টেনে আপনি এমন অর্থ বের করেন!"

—"বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে সেটা ভুলে যেও না। মনে করো, সে যদি এইটুকুই শোনে যে তুমি রোজ আমাকে চা তৈরি ক'রে খাওয়াচ্ছো, তাহ'লে হয়তো কত রকম কী ভাববে। আমি না-হয় কিছু নাই বললাম, কিন্তু ডক্টর গাঙ্গুলির সঙ্গে তার খুব আলাপ আছে, ওর কাছেও সে এই খবর অনায়াসে পেতে পারে।"

—"এইজন্য আপনার আপত্তি? আচ্ছা বেশ, আপনার সেজন্যে কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে অনুমতি নিয়ে আসবো।"

—"না না, তার দরকার নেই। তুমি ওসব কিছু করতে যেওনা।"

—"তা হ'লে আমার চা আর আপনি খাবেন না?"

—"নিশ্চয় খাবো, কিন্তু রোজ এমন নিয়ম ক'রে নয়। তুমি যে হাঁসপাতালের সমস্ত কাজ ফেলে রোজ আমার চায়ের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে এটাও আমি পছন্দ করি না।"

অতঃপর হাঁসপাতালে নিয়মিত চা পানের অভ্যাসটা আমার নিবৃত্ত হোলো।

আইরিণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক যাতে বেশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে না ওঠে তার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি একদিন অযথা ওর মনে খানিকটা আঘাতও দিয়েছিলাম।

সেদিন হাঁসপাতালে থিয়েটার হচ্ছে। প্রতি বছর শীতকালে এটা হয়। ঐ সময় কলেজের পুরানো ছাত্রদের রি-ইউনিয়নের উৎসব হয়, দেশবিদেশ থেকে ডাক্তাররা এসে এই উৎসবে একত্রিত হয়, আর সেই উপলক্ষে কলেজের ছাত্রেরা একদিন থিয়েটার করে। ছাত্রদের এই থিয়েটার ভারী উপভোগ্য, হাঁসপাতালের সকলেই ভিড় ক'রে দেখতে যায়।

পাঞ্চালী বললে সেও যাবে। ওকে খুব ভালো ক'রে সাজতে বললুম যে শাড়িটায় সবচেয়ে সুন্দর মানায় সেই শাড়িটা ওকে পরতে বললুম পাঁচজনে দেখুক আমার স্ত্রী কত সুন্দরী। কিন্তু সেদিন রাত্রে আমা

বিশেষ একটা ডিউটি ছিল। আবিষ্কার করলাম যে ওকে কারো জিম্মায় বসিয়ে দিয়ে আমি ডিউটিতে চ'লে যাবো, আবার থিয়েটার ভাঙবার সময় এসে বাসায় নিয়ে যাবো। পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে ঢুকে মেয়েদের বসবার জায়গার কাছে গিয়েই দেখি আইরিণ সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম—"ইনি আমার স্ত্রী। তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, তুমি একটা ভালো জায়গা দেখে ওঁকে বসিয়ে দিও।"

আইরিণ হতভম্ব হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম—"বুঝতে পারলে না? আমার ডিউটি আছে, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। তোমার উপর ভার রইলো, ওঁকে একটু দেখো, থিয়েটার ভাঙলে আমি এসে ওঁকে নিয়ে যাবো।"

আইরিণ হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে পাঞ্চালীর হাত দুখানা ধ'রে বললে —"আসুন আসুন, আজ আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে আলাপ হোলো।"

আমি চ'লে গেলাম। থিয়েটার ভাঙবার খবর পেয়ে যখন আবার সেখানে ফিরে গেলাম তখন আমার একটু দেরী হ'য়ে গেছে। গিয়ে দেখি ওরা দুজনে পথের পাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব গল্প জমিয়ে দিয়েছে। আইরিণ ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ করলেও বাংলা কথা বেশ বলতে পারে।

আমি যেতেই আইরিণ বললে—"আপনি কষ্ট ক'রে এলেন কেন ডক্টর মুখার্জি? আমিই ওঁকে বাসায় পৌঁছে দিতাম। মিসেস্ মুখার্জির সঙ্গে, আমার খুব ভাব হ'য়ে গেছে। উনি যে কেবল সুন্দরী তা নয়, ওঁর কথাবার্তাও খুব অমায়িক।"

আমি আইরিণের কথায় কোনো জবাব দিলাম না।

পাঞ্চালী বললে—"কী বলছো ভাই, আমার নিন্দা করছো?"

আইরিণ বললে—"নিন্দা কেন করবো? বলছিলাম যে আপনি দেখতেও যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমনি অমায়িক।"

পাঞ্চালী আমাকে বললে—"যার কাছে তুমি আমাকে রেখে গেলে, তার কোনো পরিচয় আমাকে দিলে না। কিন্তু ও আমার খুব যত্ন করেছে। অনেকবার আমাকে চা, লেমনেড, পান এনে এনে খাইয়েছে। ওর কাছেই শুনলুম যে ও তোমার হাঁসপাতালের আইরিশ নার্স, তোমার সঙ্গেই কাজ করে।"

পথে দাঁড়িয়ে এরকম আলাপ জমানো আমার ভালো লাগছিল না। ওদের প্রশ্রয় দিলেই মৌখিক অমায়িকতার আদানপ্রদান আরো অনেকক্ষণ চলবে। আমি তখন ডিউটি করতে করতে চ'লে এসেছি, পাঞ্চালীকে বাসায় পৌঁছে চারটি খেয়ে নিয়ে আবার চ'লে যেতে হবে। ইচ্ছা ক'রেই ওদের কথার প্রসঙ্গে আমি যোগ দিলাম না। হাতে ছিল স্টিথোস্কোপ যন্ত্রটা। সেইটার দ্বারা আমি পাঞ্চালীর গায়ে মৃদু আঘাত ক'রে বললাম—"আচ্ছা ঢের হয়েছে, এখন চলো চলো, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।"

পাঞ্চালী বললে—"চলো না যাচ্ছি, এত তাড়া কিসের? একটু সবুর করতে পারো না?"

—"না না, আমার সময় নেই।"

—"আচ্ছা ভাই, তাহ'লে আসি। দেখচো তো ওঁর সব বিষয়েই এমনি তাড়া। যখনই যা বলবেন তখনই তাই করতে হবে, একটু দেরী সইবে না।"

আইরিশ চুপ ক'রে রইলো, কোনো জবাব দিলে না। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে হতভম্বের মতো চেয়ে আছে।

এতেই যে আইরিশের এতটাই আঘাত লাগবে সে কথা আমি ভাবিনি। এর ধাক্কাটা সামলাতে ওর কিছুদিন সময় লাগলো। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে ও ভালো ক'রে আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারতো না। মুখটা প্রায় নীচু ক'রে থাকতো, আমার দিকে আর তেমন

ক'রে চাইতে পারতো না। ওর যে অয়ে উচ্ছ্বসিত স্বাভাবিক হাসি, সে কোথায় মিলিয়ে গেল। যে হাসি ও টেনে বের করতো, স্পষ্টই দেখা যেতো সে চেষ্টাকৃত, কৃত্রিম। কিসের আক্রোশে কেনই বা এই অনাবশ্যক আঘাতটা ওকে দিতে গেলুম তা কি আমি নিজেই তখন জানি?

২৩

এর মাস কয়েক পরে বাবার হোলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস। টেলিগ্রাম পেয়ে আমি তখনই ছুটি নিয়ে গেলাম, পাঞ্চালীকে রেখে গেলাম দাদার কাছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম গুরুতর ব্যাপার, অবিলম্বে অপারেশন করা দরকার। জ্যাঠাইমাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে সেই দিনই গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আমি বাবাকে নিয়ে কলকাতায় চ'লে এলাম, হাঁসপাতালে একটা স্বতন্ত্র কেবিনে ভর্তি ক'রে দিলাম।

এত খবর আইরিণ জানতো না। যখন বাবাকে হাঁসপাতালের বিছানায় শুইয়ে রেখে আমি অপারেশনের ব্যবস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছি, তখন আইরিণকে সেখানে দেখলাম না। সম্ভবত তখন তার ডিউটি ছিল না। ডক্টর গাঙ্গুলিকে আর সার্জন বনারজিকে টেলিফোন ক'রে সেদিনেই যাতে অপারেশন করা হয় তার বন্দোবস্ত করলাম। তারপর বাবাকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করবার আদেশ দিয়ে আমি একবার বাসায় গেলাম। বাসার থেকে কেষ্টাকে পাঠিয়ে দিলাম দাদার কাছে খবর দেবার জন্য।

হাঁসপাতালে ফিরে গিয়ে দেখি আইরিণ নিজেই বাবাকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করছে আর নানারকম কথা ব'লে তাঁকে সাহস দিচ্ছে। আমি শুনলাম সে ভাঙা ভাঙা বাংলায় তাঁকে বোঝাচ্ছে—"না না বুড্ঢা, তোমার পেটে ব্যথা আছে, তুমি বেশি কথা বলবে না। অপারেশন হ'য়ে গেলে তুমি আর একটিও কথা বলতে পাবে না। তোমার হাতের কাছেই

ঘণ্টা রাখা আছে, যখনই কিছু দরকার হবে তখনই ঘণ্টা বাজাবে, আমা তা হ'লেই শুনতে পাবো। তুমি বুঝতে পেরেছো আমি যা বলছি এটা মনে রাখা চাই।"

বাবা বললেন—"আমি ইংরেজি কথা জানি, তোমাকে আর ক ক'রে বাংলায় বোঝাতে হবে না। তুমি যা বলচো তা আমার মনে থাকবে। কিন্তু তোমাদের অপারেশনের আর কতক্ষণ দেরী আছে আমাকে বলতে পারো?"

—"ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হ'য়ে যাবে। এই তো ডক্টর মুখার্জি এসে গেছেন, আর কোনো ভাবনা নেই। ইনি আমাদের হাউস সার্জন, এঁর ওয়ার্ডের কোনো রোগীর অপারেশন কখনো খারাপ হয় না, সকলেই সেরে ওঠে। ওঁর ওয়ার্ডে যখন এসেছো, তখন নিশ্চয় জেনো তুমি ভালো হ'য়ে যাবে।"

বাবার মুখে অতো যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন —"তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলুম। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না তোমাদের হাউস সার্জন আমারই ছেলে।"

আইরিন অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চাইলে।

আমি বললাম—"তুমি জানতে না কিছু? উনি আমার বাবা।"

সে বললে—"শুনেছিলাম বটে যে আপনার বাবার অসুখ, কিন্তু ইনিই যে, তা কেমন ক'রে জানবো?" তারপর বাবার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললে—"মাপ করবেন আমাকে, আমি না জেনে আপনাকে অমান্য করেছি, ওল্ডম্যান বলেছি, আরো কত কী বলেছি।"

বাবা বললেন—"কিছু না, কিছু না, আমি সত্যিই তো ওল্ডম্যান, তাতে আর অমান্য কী হোলো? তুমি আমাকে না চিনেও যথেষ্ট যত্ন করেছো। তোমাদের হাউস সার্জন নিজেও বোধ হয় রোগীদের এতটা যত্ন করতে পারে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।"

অপারেশনের খবর পেয়ে দাদা, বৌদিদি, পাঞ্চালী, সকলেই এলো। দাদা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—"একেবারেই এ সব কাণ্ড করতে গেলি কেন? তাড়াতাড়ি অপারেশন না করিয়ে দু-একদিন দেখলে হোতো না? হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেকের অ্যাপেন্ডিসাইটিস সেরে গেছে জানি। আমাদের একজন প্রফেসরের হয়েছিল, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে একেবারে সেরে গেছে। অপারেশনের আগে একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেও তো হোতো?"

আমি বললাম—"অ্যাপেনডিসাইটিস অবস্থাবিশেষে অনেকের আপনিই সারে। কিন্তু বাবার যা অবস্থা হয়েছে তাতে আর অপেক্ষা করা যায় না। দেরী এমনিতেই যথেষ্ট হ'য়ে গেছে। আরো দেরী করলে বাঁচবার কোনোই আশা থাকবে না, এখনও অপারেশন করলে বরং কিছু আশা আছে।"

দাদা আর কোনো জবাব দিলে না।

অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে ডক্টর গাঙ্গুলি যখন তাঁকে ক্লোরোফরম দিতে লাগলো তখন বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎ কৃপা তমহং বন্দে—" বলতে বলতে তাঁর কথাগুলো জড়িয়ে এলো।

অপারেশন ভালোভাবেই সম্পন্ন হোলো। দেখা গেল যে এর প্রয়োজন ছিল, আর দেরী করলে বিপদ ঘটতো। এই ব্যবস্থা করতে আমার একটুও দ্বিধা হয় নি, অপারেশনটা হ'য়ে যাওয়াতে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আমার চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি। পরের বেলাতেও যেমন, আমার নিজের বেলাতেও তেমনি এর উপর একান্ত নির্ভর করতে পারি। সে আস্থা যদি না থাকতো তাহ'লে এই পেশা নিয়ে আমি নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হ'য়ে থাকতুম। সাফল্য হবে কি না জানি না, কিন্তু আমার কর্তব্য আমি করেছি।

অপারেশনের পর বাবার অক্লান্ত সেবা করলে আইরিণ। সিস্টারের সঙ্গে সে বন্দোবস্ত ক'রে নিলে যে তাকে অন্য কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হোক, বাবার নার্সিংএর সম্পূর্ণ ভার সে একাই নেবে, অপর কাউকে দিতে হবে না। অবশ্য আমরা সকলেই বাবার কাছে থাকতুম, বৌদিদি আর পাঞ্চালীও অনেক সময় থাকতো, কিন্তু আইরিণ কাউকে কোনো দায়িত্বের কাজ করতে দিতো না, সমস্তই সে নিজের হাতে করতো। বাবার কাছে তার দিনেও ডিউটি, রাত্রেও ডিউটি, একবারও ছুটি নেই। পাশের কেবিনটা সে খালি রেখেছে নিজের বিশ্রামের জন্য, কিন্তু বিশ্রাম কখনই নেয় না। একটা ঈজিচেয়ার আছে, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে একবার বসে, আবার পাঁচ মিনিট বাদেই উঠে আসে। ওরই মধ্যে সে কখন গিয়ে খেয়ে আসে, কখন স্নানাদি সেরে আসে, আমরা জানতেই পারি না। আশ্চর্য হ'য়ে যাই ওর শক্তি দেখে, দিনরাত একবারও না ঘুমিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় থাকে কেমন ক'রে? এদিকে নিজের বেশভূষার কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা নেই, সর্বদাই টিপ্‌টপ্ হ'য়ে আছে, অথচ কাজেও কোনো ত্রুটি নেই। স্ফূর্তির সঙ্গে সমস্ত কাজগুলি পরিপাটিভাবে ক'রে যাচ্ছে, সর্বদাই মুখের হাসিটি প্রস্তুত আছে, শান্ত সংযত হস্তে বাবার পরিচর্যা করছে আর সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট বাক্যের দ্বারা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছে। নার্সরা যে রোগীদের সেবা করতে পারে একথা বরাবরই জানি, কিন্তু ওদের ক্রিয়াকলাপ খুব নিরীক্ষণ ক'রে কখনো দেখিনি। এইবার দেখলুম। এত ধৈর্য ধ'রে এক জনের সেবায় লেগে থাকা অন্তত আমার পক্ষে অসম্ভব। রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে একাজ আরো অনেক কঠিন। আমি দেখলুম, আইরিণ যা পারে, আমি তা কখনই পারি না।

মাঝে মাঝে বাবার ড্রেসিং বদলে দেবার প্রয়োজন হোতো। আমি কাউকে হাত দিতে দিতাম না, নিজের হাতে ড্রেস করতাম। আইরিণ তখন আমাকে সাহায্য করতো। বাবার একপাশে দাঁড়িয়ে আমি ড্রেস

করতাম, আইরিণ অন্য পাশ থেকে সাজসরঞ্জাম যোগাতো। খুব আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডেজটা আমি পিঠের তলা দিয়ে চালিয়ে দিতাম, খুব আস্তে আস্তে আইরিণ সেটা অপর পাশ থেকে ধ'রে নিতো। হাতের সঙ্গে হাতের অপ্রত্যাশিত রকমের সংযোগ হয়ে যেতো, আইরিণের চোখের দিকে চেয়ে দেখতুম সেও তা অনুভব করেছে, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। আমার মনে আছে অনেকবার তার মাথার সঙ্গে আমার মাথাটা সজোরে ঠুকে গেছে, কিন্তু একবারও সে নড়েনি, পাছে স্থানচ্যুত হ'তে গেলে বাবার কোথাও লেগে যায়। ড্রেস করা হ'য়ে গেলে বাবা বলতেন,—"একবারও আমার লাগে নি, তোমাদের দুজনের হাতই খুব নরম।" রাত্রে আমি থাকতাম বাবার কাছে, আর আইরিণও থাকতো। আমি বরং ঈজিচেয়ারটায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু সে ঠিক জেগে থাকতো। বাবা মাঝে মাঝে ডাকতেন,—"কুমার।" আইরিণ অমনি তাড়াতাড়ি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলতো,—"এই যে আমি এখানে রয়েছি, আমাকে বলুন না কী দরকার?" বাবার ডাক শুনে যদি আমার ঘুম ভেঙে যেতো তা হ'লে সে যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠতো।

কিন্তু এততেও কিছু হোলো না। মৃত্যু একটা পথে আসতে বাধা পেয়ে অন্য পথ দিয়ে এসে উপস্থিত হোলো। অপারেশনের কিছু দোষ হোলো না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অন্য রকম বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো। অনেক রকমের ব্যবস্থা সত্ত্বেও মৃত্যুকে সে দিক দিয়ে ঠেকানো গেল না। বাবা ক্রমশ ছটফট করতে করতে অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলেন।

আইরিণ বলতো—"আপনি অতো ছটফট করবেন না। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, একটু স্থির হ'য়ে থাকুন দেখি। একটু স্থির হ'লেই দেখবেন যন্ত্রণা ক'মে যাবে।"

বাবা বলতেন—"মৃত্যু, মৃত্যু আসছে, তুমি বুঝতে পারছো না? একেই বলে মৃত্যুযন্ত্রণা, আমি অনুভব করছি। কেমন ক'রে স্থির হবো?"

আইরিণ বলতো—"মৃত্যু কথনই নয়। আমি অনেক দেখেছি, মৃত্যুতে কথনো যন্ত্রণা হয় না। মৃত্যু আসবা'র সময় হ'লে সব যন্ত্রণা থেমে যায়। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এ আপনার রোগের যন্ত্রণা। বলুন তো কোথায় কষ্ট হচ্ছে ?"

—"বুকে।"

—"আচ্ছা এই আমি একটা ইনজেকশন দিয়ে দিচ্ছি, এথনই যন্ত্রণা ক'মে যাবে। আপনার ছেলে নিজে এটা দিতে বলেছেন। দেখুন দেখি এবার কমলো কি না ?"

—"কমেছে" ব'লেই বাবা একটু চুপ করে থাকেন, কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘুমিয়ে পড়েন।

একদিন শেষ রাত্রের দিকে বাবার শ্বাস [illegible] মতো হোলো। আমি বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম। তথন সেথানে আর কেউ নেই, কেবল আমি আর আইরিণ। আমি আইরিণকে বললাম—"তুমি একটু থাকো, আমি এথনই গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে কিংবা অটলদা'কে কিংবা যাকে হোক একজনকে ডেকে নিয়ে আসি। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, এথনই একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।"

আইরিণ আমাকে নিবৃত্ত করলে। বললে—"কাউকে ডাকতে হবে না ডক্টর মুথার্জি, আপনি এইথানেই থাকুন। দেথতে পাচ্ছেন না কী আসছে ? আপনি তো জানেন, এথন আর কিছুই করবার নেই। ওঁর শরীরের ওপর এথন আর কিছুই করতে যাবেন না। ওথানে আর আপনাদের কোনো অধিকার নেই।"

বাবা এই সময় চীৎকার ক'রে ডাকলেন—"কুমার, কুমার কৈ ?"

—"এই তো রয়েছি বাবা!"

—"দেথতে পাচ্ছি না।"

আইরিণ বললে—"চোথ বুজে থাকুন, দেথবার চেষ্টা করবেন না।"

—"ভয় করছে বড়ো।"

—"ভয় কিছুই নেই। আপনার ঘুম আসছে, তাই দেখতে পাচ্ছেন না। চোখ বুজে একটু ঘুমোন দেখি।"

আইরিণের কথায় বাবা চোখ বুজলেন। দু এক মিনিট পরেই হঠাৎ একবার খুব বড়ো ক'রে চোখ চাইলেন। ধীরে ধীরে ঘাড়টা কাৎ হ'য়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো আবার বুজে গেল।

ধীরে ধীরে আইরিণ বাবার গায়ের চাদরটা টেনে মুখের ওপর ঢাকা দিয়ে দিলে। তারপর আমাকে বললে—"এইবার আপনি বাসায় গিয়ে সকলকে খবর দিন। আমি ততক্ষণ এইখানেই রইলুম।"

হাঁসপাতালের ফটক পার হ'য়ে আমি বড় রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। পথে দু একজন লোক চলছে, দু একটা গাড়িও যাতায়াত করছে। খবরের কাগজের হকারেরা লোকের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়ি বাড়ি বিতরণ করছে অমৃত-বাজার, আনন্দ বাজার।···

মৃত্যুকে আমি বহুবারই দেখেছি, কিন্তু কখনো এমন ক'রে অনুভব করিনি। মৃত্যুকে দেখা আলাদা কথা আর তাকে উপলব্ধি করা আলাদা কথা। উপলব্ধির দ্বারা মৃত্যু যখন আমাদের আঘাত দিয়ে যায়, তখন তার আঘাতে হাতে পায়ে, সর্বশরীরে, সমস্ত মনে একটা ঝিন্‌ঝিনি ধরে, সমস্ত অসাড় হ'য়ে যায়। পথ দিয়ে চলেছি, কিন্তু পায়ে সেটা অনুভব করছি না। দুপাশের বাড়িগুলো যেন হাওয়ার তৈরি, সবই যেন শূন্যে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে।···

২৪

শ্রাদ্ধশান্তি সেরে দেশ থেকে ফিরে এসে আবার আমরা নিজের নিজের কাজে যোগ দিলাম। দিনকতক খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। বাবা আছেন,

সে ভাবটা একরকম,—আর বাবা নেই, সে ভাবটা অন্যরকম। কিছুদিন ম্রিয়মান হ'য়ে রইলাম। কিন্তু একরকম মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী হয়না, ঘটনাচক্র এসে তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দেয়। অভাবও মুছে যায়, স্মৃতিও মুছে যায়, বর্তমানই সব জুড়ে বসে।

লোকে বলে দুর্ঘটনা কখনো একা আসে না। আমরা সে কথা মানি আর না-মানি, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা থেকেই লোকে এমন বলে।

বাবার মৃত্যুর মাসখানেক পরেই শুনলাম যে হাঁসপাতালের চাকরি থেকে আমার মফঃস্বলে বদলি হবার কথা উঠেছে। অটলদা গিয়েছিলেন উপরওয়ালাদের বড় আফিসে, তিনি এই কথা শুনে এসেছেন। বাইরের থেকে কে একজন নতুন লোক আসছে মেডিকেল ওয়ার্ডে, অটলদা ফিরে আসবেন তাঁর নিজের পুরানো জায়গায়, কাজে কাজেই আমাকে বদলি হ'য়ে যেতে হবে।

অটলদা যদিও বললেন যে মফঃস্বলে একবার ঘুরে আসা ভালো, বাইরে গেলে প্র্যাকটিসের সুযোগ-সুবিধা আছে আর দুপয়সা পাওয়াও যায়, কিন্তু আমার বড় দুর্ভাবনা উপস্থিত হোলো। কলকাতায় থাকতে যারা অভ্যস্ত তা'রা কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না। কলকাতার প্রতি আমার আকর্ষণ কিন্তু তেমন প্রবল নয়। আমি ছেলেবেলা থেকে মফঃস্বলে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমার কলকাতা ছেড়ে গেলে অনেক অসুবিধা আছে। বাবা যে বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন তার এখনো কিছু ব্যবস্থা করা হয় নি। যদিও দাদার উপর সমস্ত ভার আছে, তবু আমার উপস্থিত থাকা দরকার। তা ছাড়া এই হাঁসপাতাল ছাড়তে এখন আমার প্রবল অনিচ্ছা। এখানে আরও কিছুকাল কাজ করতে চাই, আমার শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বাইরে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব।

খবরটা শোনা অবধি কেবলই আমার মনে হ'তে লাগলো, এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কিছুতেই হ'তে পারে না, যেমন ক'রে হোক নিবারণ করতে হবে। কেন তা জানিনা, কিন্তু মনে হোলো আইরিণের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত।

আইরিণের প্রতি আমার মনোভাবের তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাকে বারেবারে তাচ্ছিল্য করতে গিয়ে আমি বারেবারেই শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছি, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে নিজেই আমি পরাজিত হয়েছি, বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর কাছে মাথা নত করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে ওর সঙ্গে আমার একটা অন্তরের সম্বন্ধ রয়েছে, কোনো বাহ্যিক রূঢ়তা কিংবা অস্বীকৃতির দ্বারা সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এ যেন চিরস্থায়ী হ'য়ে গেছে। এই বিস্ময়কর সম্বন্ধের কী নাম দেবো তা আমি জানি না,—হয়তো স্নেহ, হয়তো শ্রদ্ধা, হয়তো সৌহার্দ্দ,—কিন্তু এ এমন একটা উঁচুদরের জিনিষ যার সম্পূর্ণ আখ্যা ওর কোনো শব্দটার দ্বারাই জ্ঞাপন করা যায় না। সাহায্য এবং সহানুভূতি ওর কাছে আমি এতই পাই যে কোনো কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হ'লেই আমার ওর কথা স্মরণ হয়।

খবরটা আইরিণকে বললাম। শোনবামাত্রই সেও তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো—"এ কখনো হ'তেই পারে না। আপনি কিছুতেই যেতে রাজি হবেন না।"

—"সরকারী হুকুম হ'লে তখন আমি মানতে বাধ্য।"

—"হুকুম যাতে না হয় তার চেষ্টা করুন। সার্জন বনারজিকে গিয়ে বলুন। আপনার অসুবিধার কথা সবই তিনি জানেন, আর অটলবাবুকেও তিনি তেমন পছন্দ করেন না, তাঁকে বললেই এর উপায় হবে।"

এই সহজ কথাটা আমার মনে হয় নি। আমি সার্জন বনারজিকে সব সংবাদ বললাম। তিনি বললেন—"আচ্ছা আমি প্রিন্সিপ্যালকে ব'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো।"

তার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য শুনতে পেলুম না। নতুন লোকও কেউ এলো না, অটলদা'ও মেডিকেল ওয়ার্ডে অটল হ'য়ে বিরাজ করতে লাগলেন। সকলেই বুঝলে যে অটলদা কখনো এই হাঁসপাতাল থেকে অন্যত্র যাবেন না, তিনি মেডিকেল ওয়ার্ডে পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত হ'য়ে থাকবার নিশ্চয়ই একটা কিছু উপায় করে নিয়েছেন। আমিও নিশ্চিন্ত হলুম।

এর কিছুকাল পরেই পারুলীর নামে এক[illegible] উড়োচিঠি এসে হাজির হোলো। চিঠিটা এলো ডাকযোগে। লেখা আছে—

"আপনার স্বামীর সম্বন্ধে কোনো সংবাদ আপনি রাখেন কি? কে তাঁকে রোজ চা ক'রে খাওয়ায়, কার সঙ্গে তিনি বায়স্কোপ দেখতে যান, কাকে না দেখতে পেলে তিনি আত্মহারা হন, ডিউটি করবার নামে তিনি কার কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন, কাকে ছেড়ে যেতে হবে [illegible] পেয়েও বিদেশ যেতে রাজি হলেন না, এ-সকল কথা কি আপনি জানেন? আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের প্রতি কোনো অবিচার দেখলে আমার গায়ে লাগে। সেইজন্যই এত কথা লিখলাম। যদি বিশ্বাস না করেন, একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। এখনও সময় আছে, নিজের সর্বনাশ বাঁচাতে যা করা উচিত তা এখনই করবেন। এই পত্র আপনার স্বামীকে দেখাবেন না, আমার দিব্য রইল।"

চিঠিখানা আঁকাবাঁকা অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখা। উপরে কোনো তারিখ ঠিকানা নেই, নীচে কারো নাম নেই।

পারুলী নিতান্ত ঔদাসীন্যমাখা মুখ নিয়ে এই চিঠি আমার হাতে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কার চিঠি?"

"প'ড়ে দেখ।"

প'ড়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না এ-চিঠি কে লিখেছে এবং কেনই বা লিখেছে। আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ক'রেই লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু অল্প কিছু সত্যও এর মধ্যে মেশানো আছে। চিঠি প'ড়ে আমার রাগ হোলো না, বরং আমোদই হোলো। কে এমন প্রহসন করলে? ডক্টর গাঙ্গুলি? সেই কি পাঙ্কালীর সঙ্গে একটু তামাসা করেছে? কিন্তু এই খেলো রকমের তামাসা করা তার স্বভাব নয়। কুটলদা কি আমার নামে এই বদনাম রটাচ্ছেন? এতটা হীনতা নিশ্চয় তিনি করবেন না, তাঁর কোনো অনিষ্ট আমার দ্বারা হয়নি। কিন্তু তবে কে করলে? নিশ্চয় হাসপাতালেরই কারো দ্বারা এটি হয়েছে, বাইরের লোকের পক্ষে ঐ সব কথা লেখা সম্ভব নয়। এত বড় হাসপাতালের মধ্যে হয়তো কেউ আমার অজ্ঞাত শত্রু আছে, কেমন ক'রেই বা জানবো?

পাঙ্কালীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে আমার এমন অনিষ্ট চেষ্টা করছে কিছু আন্দাজ করতে পারো?"

—"কেমন ক'রে জানবো?"

—"যাক্‌গে, ও বাজে চিঠি, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দাও। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই।"

—"না, ওটা এখন আমার কাছেই থাক।"

—"কী করবে রেখে? গোয়েন্দাগিরি ক'রে লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করবে না কি? কিন্তু আমার মনে হয় ঐ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কাজ নেই।"

—"না, আমি তা কিছু করবো না।"

এ রকম উড়োচিঠি কারো গ্রাহ্যের বিষয় হ'তে পারে না, আমিও ঐ বিষয় আর কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। কিন্তু দেখলাম পাঙ্কালী যেন ঐপর থেকে একটু কেমন গম্ভীর হ'য়ে রইল। সে আমার সঙ্গে বেশি কথা বলে না, সর্বদাই যেন একটু সংযত হ'য়ে থাকে, কোনো প্রশ্ন করলে

সংক্ষেপে উত্তর দেয়। আমি ভাবলাম এটা ভালো কথা হচ্ছে না। পাঙ্কালীর মনে যদি কোনো সন্দেহ জেগে থাকে, সেটা এখনই দূর ক'রে দেওয়া উচিত।

গাঙুলিকে আমি চিঠির কথা বললাম। শুনে সে প্রথমটায় অবাক হ'য়ে গেল। সে বললে, রহস্য করবার জন্য কেউ এ কাজ নিশ্চয় করেনি, শত্রুতা করবার উদ্দেশ্যেই করেছে। পাঙ্কালীর মনে সন্দেহ জাগানোই তার আসল উদ্দেশ্য, তাই এমন বিষয় নিয়ে লিখেছে যা স্ত্রীলোকের বিবেচনায় নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হবে না। চিঠিটা সে একবার দেখতে চাইলে

গাঙুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাসায় গেলাম। পাঙ্কালীর কাছে গিয়ে সে বললে—"দেখি বৌদি কী চিঠি এসেছে?"

পাঙ্কালী চিঠিটা বাক্সের ভিতর থেকে বের ক'রে এনে দিলে।

পড়া হ'য়ে গেলে গাঙুলি বললে—"এই নিন, এটা এখনই বাক্সের ভিতর রেখে আসুন, নইলে হারিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছেলেবেলায় দেখেছি গুরুমহাশয়ের কাছে একটা বেত থাকতো তিনি আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ডেস্কের মধ্যে চাবি দিয়ে রাখতেন, পাছে বাইরে রাখলে কেউ সেটা সরিয়ে ফেলে। ছেলের গোলমাল করলেই তখন ডেস্ক খুলে বেতটা বের করতেন।"

পাঙ্কালী ম্লান ভাবে অল্প অল্প হাসতে লাগলো।

গাঙুলি বললে—"আমার কথাটা বুঝি আপনি হেসে উড়িয়ে চান? কিন্তু আপনার হাসি তো তেমন প্রাণখোলা হচ্ছে না দেখে বোঝা যাচ্ছে, আপনার মনে কোথাও সন্দেহ ঢুকেছে। কি ঐ উড়োচিঠির কথাগুলো সত্যি ব'লে মনে করেন?"

—"আমার মনে করাতে কার কী যায়-আসে ঠাকুরপো?"

—"সে কী কথা বৌদি? আপনি ডক্টর মুখার্জিকে সন্দেহ ওর মতো নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমাদের হাঁসপাতালে কারো আছে?"

"আমি কি ওঁর সম্বন্ধে কিছু বলেছি ?"

—"বলেন নি কিছুই, কিন্তু মনে করচেন অনেকখানি। আপনার মনে কী হচ্ছে তা আমি জানি। ঐ জিনিষটাকে মোটে প্রশ্রয় দেবেন না, ও একটা ভয়ানক রোগ। ওর বীজ একবার ঢুকলে আর রক্ষা নেই, ক্রমে ক্রমে বিরাট রোগের সৃষ্টি করবে। ওর নাম জেলাসি, যাকে বাংলায় বলে হিংসে। মরিস ডিকোত্রা বলেছে যে ওটা সেন্টিমেণ্ট্যাল এলিফ্যানটিয়াসিস, অর্থাৎ মনের ভিতর গোদের ব্যারাম। লোকের পায়ে গোদ হয় দেখেছেন তো ? পা ফুলতে ফুলতে এতই মোটা হ'য়ে যায় যে তখন আর মানুষের পা ব'লে চেনাই যায় না। সেই পা তখন কারো সামনে বের করা যায় না, ঢেকে রাখতে হয়। সন্দেহ করতে করতেও মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম বিকৃত হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার সন্দেহ করবার কোনোই কারণ নেই। যে মেয়েটির সম্বন্ধে ঐ চিঠিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার পরিচয় আপনি যথেষ্টই পেয়েছেন। ওর মতো উঁচু মন নার্সদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। তুচ্ছ একটা উড়ো চিঠির কথা আপনি মনের কোণেও স্থান দেবেন না।"

গাঙ্গুলির কথা শুনে পাঞ্চালী যেন একটু লজ্জিত হোলো। সে চুপ ক'রে রইল। আমি ভাবলুম সন্দেহের ব্যাপারটা এইখানেই মিটে গেল। কিন্তু ব্যাপার যে ভিতরে ভিতরে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা আমি কিছুই জানতাম না, পরে জানতে পারলাম।

২৫

আমাদের দেশের রায়মশাই একদিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসে উপস্থিত। ছেলের হার্নিয়া হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি ক'রে অপারেশন করিয়ে দিতে হবে। ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে মোট-

মাটরি সমেত বরাবর হাঁসপাতালে এসে উঠেছেন, যদি এখন ভর্তি না হয় তবে আপাতত আমার বাসাতেই স্থান দিতে হবে, যতদিন ভর্তির ব্যবস্থা না হয়। কলকাতায় ওঁদের থাকবার কোনো স্থান নেই।

রায়মশাই গ্রামের একজন মাতব্বর লোক। তাঁর মুদিখানার দোকানে গ্রামের সকলেই যায়, বৈকালে সেখানে প্রত্যহ দাবা খেলার মজলিস বসে, এবং দুনিয়ার যত কিছু খবরাখবরের আদানপ্রদান সেইখানেই হয়। বাবার তিনি সমবয়সী এবং ছেলেবেলাকার বন্ধু, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর একটা দাবী আছে।

গ্রামের লোকের কঠিন রোগ হ'লে অনেকবার এইরকমভাবে কলকাতায় এসে আমাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে, এবং আমিও তার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছি। যেখানে মারাত্মক অবস্থা, অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সেখানে যেমন ক'রেই হোক একটা উপায় ক'রে দিয়েছি। কিন্তু হার্ণিয়ার অপারেশন বিলম্বেও করা চলতে পারে। উপস্থিত হাঁসপাতালে একটিও বেড খালি ছিল না। রায়মশাইকে আমি বললাম যে উপস্থিত বেড খালি নেই, তিনি এখন ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে যান, সুবিধামত আমি চিঠি লিখবো, তখন যেন তিনি ছেলেকে নিয়ে আসেন।

রায়মশাই বললেন—"তোমার কাছেই ওকে এখন রাখো না কেন? ও কেবল দুবেলা দুটি খাবে আর এক জায়গায় চুপটি ক'রে প'ড়ে থাকবে। কোনো দিকে কোনো নজর দেবে না।"

রায়মশায়ের কথাটা আমি বুঝলাম না। বললাম, আমার বাসায় ওর থাকতে কষ্ট হবে। আপাতত দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো।

উনি বললেন—"তুমি চেষ্টা করলে আজকের মধ্যেই ওর হাঁসপাতালে ঢোকবার একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। তোমার কাছে যে আসে তারই উপায় হ'য়ে যায়। আপদে বিপদে আমাদের আর কোনো ভাবনাই নেই

যেমন ক'রে হোক একবার এনে ফেলতে পারলেই হোলো। তুমি এখানে থাকতে আমাদের কত সুবিধা হ'য়ে গেছে। দেশে আমরা দুহাত তুলে তোমাকে আশীর্বাদ করি, জানো বাবাজী ?"

আমি বললাম—"চেষ্টা আমি ক'রে দেখতে পারি, কিন্তু আজই ভর্ত্তি হবে কি না বলতে পারচি না।"

তিনি বললেন—"নিশ্চয় হবে, তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয় হবে। তোমার এখানে কত বড় প্রতাপ। বড় বড় সাহেব-মেমেরা তোমার মুঠোর মধ্যে। লোকে বদনাম রটালে কী হয়, আমরা তো জানি তোমার কত ক্ষমতা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কে বদনাম রটায় ? কি-সের বদনাম ?"

তখন তিনি অনেক কথাই বললেন।

—"সকলেই তোমার সুখ্যাতি করে বাবাজি। কেবল দেশে কতকগুলো নিষ্কর্মা বিশ্বনিন্দুক আছে, তাদের কথা ছেড়ে দাও, পরনিন্দা করতে পেলে তা'রা ছাড়ে না, তা'রা তোমার আর কিছু দোষ খুঁজে পায় না, শেষে চরিত্রের দিকে কটাক্ষপাত। আমরা থাবা মেরে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিই। সে সব কথা শুনে তোমার কাজ নেই, শুনলেই এখনই মাথা গরম হ'য়ে যাবে। তোমার বাবার সম্বন্ধে যা বলতো তা বলতো, কিন্তু তোমার সম্বন্ধেও তাই বলবে ? সরকার বাহাদুর হাঁসপাতালে মেয়ে-নার্স রাখবার ব্যবস্থা করেছে কেন, পুরুষ-নার্স রাখলেই তো পারতো! পুরুষ-ডাক্তার রাখতে গেলেই সেখানে মেয়ে-নার্স রাখা চাই, নইলে কাজ হয় না। যে কাজের যা অঙ্গ, সেটা বাদ দিলে চলবে কেন ? আগেকার দিনের তান্ত্রিকেরা দুচার বোতল কারণ ক'রে নিয়ে তবে পুজায় বসতো, কেউ কি তাদের দোষ দিতে সাহস করতো ? ভালো ডাক্তার হলেই তাদের সঙ্গে মেয়ে-নার্স থাকবে। এ কাজের এই নিয়ম। এই তো সেদিন আমাদের পাশের গ্রামের হরি ডাক্তার, মস্ত বড়ো দেশজোড়া নাম—"

রায়মশায়ের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে আমি বললাম—"আমার আর শোনবার সময় নেই, অনেক কাজ পড়ে আছে। চলুন আমার সঙ্গে, আপনার ছেলেকে ভর্তি করবার চেষ্টা ক'রে দেখি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই যে আমার কখনো চরিত্রদোষ হয় নি, আর যত-দূর আমি জানি, বাবারও কোনো দোষ ছিল না। আপনার কাছে লুকিয়ে রাখবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু আপনারা যা শুনেছেন সব ভুল কথা।"

রায়মশাই শশব্যস্ত হ'য়ে বলতে লাগলেন—"সে তো ঠিক কথা, লুকোবে কেন বাবা, লুকোবে কেন? আমরা হলুম আপন লোক, আমাদের কাছে লুকোবার কী আছে?"

রেসিডেণ্ট অফিসারকে ব'লে ক'য়ে তাঁর ছেলের ভর্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমি একেবারে কোয়ার্টার্সে চ'লে গেলুম। আজ আমি সন্ধান ক'রে দেখতে চাই কোথা থেকে কেমন ক'রে আমার নামে এই মিথ্যা বদনাম রটলো। ছি ছি, এ কী অপবাদ!

বাসায় গিয়ে দেখি বৌদিদি এসেছে, পাঞ্চালীর সঙ্গে গল্প করছে; রান্নাঘরে কেষ্টা রন্ধনকার্যে ব্যস্ত। আমি বরাবর রান্নাঘরের দিকে গিয়ে কেষ্টাকে ডাকলুম। তাকে বললাম—"এইমাত্র দেশ থেকে রায়মশাই এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে দেশময় আমার নামে মিথ্যা বদনাম রটেছে। নিশ্চয় তোরা কেউ সেখানে গিয়ে বলেছিস্, নইলে দেশের লোক জানবে কেমন ক'রে? কে এই সকল বদনাম রটায় সেই কথা আমি জানতে চাই।"

কেষ্টা অতি-বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চোখ দুটো কপালে তুলে হাত পা নেড়ে বলতে লাগলো—"আমি? আমি বলেছি রায়মশাইকে? পাগল হয়েছেন? রায়মশাইকে আমি কোনো কথাই বলিনি, তামা-তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি করতে পারি।"

আমি বললাম—"রায়মশাইকে না ব'লে থাকিস, আর কাউকে-

বলেছিস, কথাটা তার কাছ থেকেই রটেছে। তুই ছাড়া এখানকার হাঁসপাতালের খবর সেখানে আর কে বলবে ? নিশ্চয় তুইই বলেছিস।"

—"রাধে-মাধব, রাধে-মাধব, ও সকল কথার মধ্যে আমি নেই। আমার পিতেঠাকুর আমাকে পাখীপড়া ক'রে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে কেষ্ট, মেয়েমানুষের কথায় কথনো তুমি থাকবে না।"

আমার বুঝতে কিছু বাকি রইল না। কেষ্টার উপর অত্যন্ত রাগ হ'য়ে গেল। তার কান ধ'রে বললাম—"তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। তোকে আমি রাখবো না, তোর মুখ দেখতে চাই না। এখনই তুই চ'লে যাবি, এই মুহূর্তে।"

গোলমাল শুনে বৌদিদি আর পাঞ্চালী সেখানে এলো। পাঞ্চালী বললে—"ওকে তাড়াচ্ছো কেন, ও বেচারা কী দোষ করেছে ?"

আমি বললাম—"ও দেশে গিয়ে আমার নামে মিথ্যা বদনাম রটিয়েছে। আমি এতদিন বুঝতে পারিনি যে ওই আমার অনিষ্ট ক'রে বেড়ায়। তোমার কাছে এমন সাধু সেজে থাকে, তুমিও চিনতে পারনা।"

বৌদিদি বললে—"ওরই যত দোষ হ'য়ে গেল ? তোমার গোপনীয় কথা কে না জানে ? জানতে কারো আর বাকি নেই।"

আমি বললাম—"তুমিও তাহ'লে জানো দেখছি। কেবল আমি নিজেই কিছু জানিনা। সেইটাই তো আজ আমি জানতে চাইছি কোথায় তোমরা শুনলে, আর কে তোমাদের বলেছে।"

বৌদিদি বললে—"সবই তুমি জানো, শুধু আমাদের কাছেই স্বীকার করতে চাওনা।"

আমি বললাম—"এমন স্বভাব আমার কথনই নয়। নিজের দোষ স্বীকার করবার সাহস আমার চিরকালই আছে।"

—"ঠিক বলছো ? নিজের দোষ সব স্বীকার করতে পারবে ?"

—"নিশ্চয় পারবো, যদি সত্যিই কোনো দোষ ক'রে থাকি।"

—"আচ্ছা, একটা একটা ক'রে বলছি, সাহস থাকে তো ঠিক ঠিক জবাব দেবে।"

—"আচ্ছা বলো শুনি।"

—"তুমি মদ খাও তো? ডাক্তার হ'লেই একটু আধটু খেয়ে থাকে, কিন্তু সে কথা লুকোও কেন?"

—"না, খাইনা। আর ডাক্তার মাত্রেই যে মদ খায় এ কথাও ঠিক নয়।"

—"কখনো খাওনি? ঠিক বলছো, একদিনও খাওনি?"

আমার মনে পড়ে গেল গাঙ্গুলির বাড়িতে একদিন বিয়ারের আস্বাদ গ্রহণ করার কথা। বললাম—"একদিন হয়তো একটু এমনি দৈবাৎ আস্বাদ ক'রে থাকতে পারি, কিন্তু সে কিছুই নয়।"

—"বেশ কথা, মদ তুমি খাওনি, কেবল একদিন চেখে দেখেছো। তা, মেয়েদের সঙ্গে অতো মেশো কেন? সেও কি শুধু 'আস্বাদ' নেবার জন্যে?"

—"কখনই না, মেয়েদের সংস্রবে বেশি মিশতে আমি ঘৃণা বোধ করি।"

—"ঘৃণা বোধ করো? তোমার কোনো একজন বন্ধুর বোনের সম্বন্ধে একটা খবর আমি জানি, সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত করতে পারি কি?"

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। বললাম—"না পারোনা। অপরের সংসারের গোপনীয় কথা নিয়ে আলোচনা করবার আমাদের কারো কোনো অধিকার নেই। কিন্তু সে কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে?"

—"থাক, যখন অধিকার নেই তখন সে কথায় আর দরকারই নেই। কিন্তু একজন ডাক্তার যে টাকা ছুঁলে না, সে টাকা তুমি নিজে নিলে কেন?"

—"নিশ্চয় আমি নিই নি। ফেরত দিয়েছি।"

—"এত টাকা উপায় করো, আবার ধার করো কেন? কিসে তোমার এত খরচ হয়?"

—"একবার মাত্র টাকা ধার করেছি, মাইক্রোস্কোপ কেনবার জন্য।"

—"ঐ নার্স টার সঙ্গে তোমার এত কিসের সম্পর্ক? ওর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া হয়, ওকে মাঝে বসিয়ে দুই বন্ধুতে দুপাশে ব'সে গল্প করা হয়, তোমার দাদা পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেছে।"

—"তাতে কী দোষ হয়েছে? ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। ও আমার অনেক উপকার করেছে। বাবার অসুখের সময় কত করেছে তোমরা সকলেই জানো।"

—"কেনই বা ও তোমার এত উপকার করে? তোমার জন্যে ওর এত মাথাব্যথা কিসের?"

—"তা আমি কেমন ক'রে জানবো? এইটুকু বলতে পারি যে ও আমাকে ভক্তি করে।"

—"ভক্তি নয়, ভালোবাসা। আমি জানি ওর কারণ। স্ত্রীলোক দেখলেই তুমি তাকে আকর্ষণ করতে চাও, এই তোমার স্বভাব। ডাক্তারদের বোধ হয় অনেকেরই এই স্বভাব থাকে। যাকেই তোমরা আকর্ষণ করতে পারো তার ওপরেই তোমাদের শ্রদ্ধা, আর যাকে পারোনা তার ওপরে রাগ। কেমন, তাই নয় কি?"

—"এ তোমার অত্যন্ত বাজে কথা।"

—"বাজে কথা নয়, আমি নিজেই তার প্রমাণ দিতে পারি। এব সময় তুমি আমাকেও আকর্ষণ করতে চেয়েছিলে। আমাকে কতবার কত অপ্সরী সুন্দরী বলেছিলে, সে কথা তোমার মনে পড়বে কী? আমার সবই মনে আছে, কিছু ভুলিনি। তোমার স্তোকবাক্যে যদি আমি ভুলে যেতাম, তাহ'লেই তুমি আমাকেও ঐরকম শ্রদ্ধাভক্তি করতে। কিং আমি সাবধান হ'তে জানি, তাই আমাকে দেখলেই তোমার এখন রা' হয়। কেমন, ঠিক বলেছি কি না?"

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম, মুখ দিয়ে কোনো বাক্যস্ফূর্তি হোলোনা

বৌদিদি আবার বললে—"ডাক্তারদের চরিত্র কখনো ভালো হ'তে পারে না। আগুনের কাছে ঘি থাকলেই গ'লে যাবে, এতো জানা কথা। কিন্তু সেটা লুকোবার চেষ্টা কোরোনা, আর চাকরবাকরদের অযথা পীড়ন কোরো না।"

অনেকগুলো কথাই তখন আমার মনে উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তবু মুখ দিয়ে কিছু উচ্চারণ করতে অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হোলো। কোনো কথা না ব'লে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

২৬

সকলেই আমাদের সন্দেহ করে? চরিত্র ব্যক্তিগত জিনিষ, কিন্তু এরা আমাদের ব্যক্তি হিসেবে দেখে না, জাতি হিসেবে দেখে। এরা ভাবে, চারিদিকে প্রলোভনের বস্তু থাকতে আমাদের চরিত্রবান হওয়া অস্বাভাবিক। আমার একজন বাল্যবন্ধু আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল,—"সত্যি কথা বল দেখি, সুন্দরী মেয়েদের পরীক্ষা করতে গেলে তোর মনের অবস্থাটা কী রকম হয়?" প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। ওদিক দিয়ে আমি কখনো চিন্তাই করিনি, প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বিলম্ব হোলো। এই রকম ধরণের একটা প্রশ্ন আমারো মনে হোতো,—মৃত্যু সম্বন্ধে। তখন ভাবতুম, মৃত্যু দেখলে সকলেই মনে আঘাত পায়, কিন্তু আমি পাই না কেন? সে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম বাবার মৃত্যুতে। যেখানে নাড়ীর টান আছে, কেবল সেইখানেই আমরা মৃত্যুর স্বরূপ মূর্তি দেখতে পাই। অন্যত্র আমাদের চোখে ওটা কোনোরকম বিভীষিকা নয়, মৃত্যু শতকরা-হিসাবে রোগের অন্যতম পরিণতি মাত্র, অথবা তৈলহীন প্রদীপের স্বাভাবিক নির্বাণ। দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধেও সেই

কথা। অন্তরের কোনো টান না থাকলে দেহসৌন্দর্যকে প্রলোভনের চোখে দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। মনুষ্যদেহকে আমরা যন্ত্র হিসাবেই দেখি, তার কোথায় কোন কল বিগড়েছে, কোথায় মেরামতের প্রয়োজন, এইটাই তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। এ কোনো সংযমশিক্ষার ফল নয়, নিতান্তই অভ্যাসের ব্যাপার। ময়রার সন্দেশে লোভ নেই কেন? সন্দেশ তার কাছে ব্যবসার পণ্য, খাদ্য নয়।

কিন্তু এত কথা বোঝাই কাকে? পাঞ্চালীকে? বৌদিদিকে? রায়মশাইকে? ওরা কেউই বুঝবে না। ডাক্তারের চরিত্রে ওদের কারোই বিশ্বাস নেই।

কিন্তু আমার সম্বন্ধে মিথ্যা খবরগুলো ওরা সংগ্রহ করলে কোথা থেকে? একেবারেই মিথ্যা নয়, সত্যের কিছু আভাব ওর মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু ওরা যা প্রমাণ করতে চায় সে আমার কল্পনাতীত। যা বলতে চায় সে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।

পাঞ্চালীই কি এর জন্য দায়ী? অথবা তাকেই পাঁচজনে মিলে এই রকম বুঝিয়েছে? বৌদিদির কি আমার উপর কোনো আক্রোশ আছে?

অত্যন্ত বিচলিত মন নিয়ে আমি রাত্রে শুতে গেলাম। পাঞ্চালীর সঙ্গে ইচ্ছা ক'রেই কোনো কথা বললাম না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পাঞ্চালী নিজেই কথা বললো।

—"তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

—"তুমি হ'লে কী করতে? যদি তোমার নামে আমি ঐরকম কতকগুলো মিথ্যা কথা পাঁচজনের কাছে বলতাম, তাহ'লে কি তুমি খুব খুশি হ'তে?"

—"আমি তো কিছু বলিনি, দিদি বলেছে।"

—"ও একই কথা। তোমার কাছে শুনেই দিদি বলেছে।"

—"তা ঠিক নয়। আমি কেবল সেই চিঠিখানা দিদিকে দেখিয়েছিলাম।"

—"বেশ করেছিলে।"

—"আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। দিদির কথায় তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। আর একটি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, তুমি আমার কাছে কিছু লুকিও না। যা কিছু হোক সব আমাকে বলবে। তাহ'লে অপরের কাছে কিছু শুনলে আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারবো, আর নিজেরও মনে কোনো গোলমাল হবে না দিদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে, আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি না। বলো, আমার এই কথাটি তুমি রাখবে?"

—"নিশ্চয়ই রাখবো। আমার এমন কোনো গোপনীয় কথা নেই যা তোমাকে বলা যায় না। এইটুকু তুমি বিশ্বাস করো।"

পাঞ্চালী চুপ ক'রে রইল।

সন্দেহ আরোপ করা হ'লে মানুষ স্বভাবত কিছু বিচলিত হ'য়ে পড়ে। বিচলিত চিত্ত নিয়ে সে সময়বিশেষে এমন কাজ ক'রে বসে, যা সুস্থমনে কখনই করতে পারে না। তখন এমনই অদ্ভুত আচরণ সে করে,—যার উপর রাগ প্রকাশ উচিত ছিল তার কাছে মুখ বুজে চুপ ক'রে থাকে, আর সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তির উপর অযথা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করতে উদ্যত হ'য়ে ওঠে। আমিও ঠিক তাই করলাম।

ঐ ঘটনার পরের দিন পাঞ্চালীকে নিয়ে দাদার বাসায় যাচ্ছিলাম। পাঞ্চালী সেখানে যেতে চেয়েছিল, আমিও হাঁসপাতালে সন্ধ্যার কাজের ব্যবস্থাগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বৈকালেই প্রস্তুত হ'য়ে বেরুলাম। সন্ধ্যার সময়টা দাদার বাসাতেই কাটিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে একেবারে রাত্রে ফিরবো। উদ্দেশ্যটা এই যে বৌদিদিকে দেখিয়ে দিতে হবে,

ট্যাক্সিতে সবে মাত্র উঠে বসেছি, কোথা থেকে আইরিণ ছুটে এসে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়ালে।

—"ঠিক সময়ে আপনাদের ধ'রে ফেলেছি। দুজনে মিলে এমন বেলাবেলি কোথায় বেরুচ্ছেন? কোথাও হাওয়া খেতে যাচ্ছেন না কি?"

আমার বিরক্তি বোধ হোলো। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হ'য়ে গেছে, পাশে পাঞ্চালী ব'সে অবাক হ'য়ে দেখছে, পথের মাঝে গাড়ির দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে এ কী আপ্যায়িত?

গম্ভীর হ'য়ে বললাম—"সে কথা জানবার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

তবুও সে বললে—"আপনি বলুন তো দিদি, কোথায় যাচ্ছেন? সিনেমায় বুঝি?"

আরো গম্ভীর হ'য়ে আমি বললাম—"যেখানেই যাই, তুমি তোমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছো। গাড়ির দরজা ছেড়ে দাঁড়াও, অনর্থক আমার সময় নষ্ট ক'রে দিও না।"

মুখ চোখলাল ক'রে আইরিণ স'রে দাঁড়ালো, আমি ড্রাইভারকে গাড়ি চালিয়ে দিতে বললাম।

পাঞ্চালী হয়তো খুশি হোলো, কিন্তু আমার মনটা একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠলো। ইচ্ছা ছিল, যেন কাল কিছুই হয়নি এমনি ভাবে গিয়ে বৌদিদির সঙ্গে পূর্বের ন্যায় হাস্যালাপ করবো, যদি তবু কালকের কথা আজ উত্থাপন করে তাহ'লে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়ে তাকে তীক্ষ্ণবাণ আঘাত করবো, কিন্তু কিছুই হোলো না। বৌদিদিকে দেখবামাত্রই আমার মন এমন বিমুখ হ'য়ে উঠলো যে বাড়ির মধ্যে আমি তিষ্ঠাতে পারলাম না, দাদার বৈঠকখানায় গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম। অনেকক্ষণের পর দাদা বাসায় ফিরলো, আমাকে বৈঠকখানায় ব'সে থাকতে দেখে হয়তো কিছু আশ্চর্যও হোলো। নানারকম সাংসারিক

কথাবার্ত্তার পর ভিতর থেকে খাবার ডাক এলো। দাদার সঙ্গে খেতে বসলাম, কিন্তু কিছুতেই খেতে পারলাম না। বৌদিদি খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করলে, কথা বলবার চেষ্টা করলে, অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না। সমস্ত আবহাওয়াটাই আমার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে উঠলো। দাদা জিজ্ঞাসা করলে—"তুই অমন চুপ ক'রে আছিস কেন?" আমি বললাম—"শরীরটা ভালো নেই।"

সারাক্ষণ কেবল আমার এই মনে হচ্ছিল, একজন নিরীহ নিরপরাধের প্রতি আমি অন্যায় আচরণ করেছি। সে বেচারা কোনোই দোষ করেনি, আর কিছু জানেও না। সে রাস্তায় আমাদের দেখে আনন্দ ক'রে ছুটে এসেছিল, আর আমি দিলাম তাকে আঘাত। আমাকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে, কত অযাচিত উপকার করবার জন্য ব্যগ্র হয়, তার বদলে তার এই শাস্তি। মানুষকে আঘাত করলেই তৎক্ষণাৎ তার নিষ্পত্তি হয় না। সে আঘাত পরে নিজেকেও দ্বিগুণ ক'রে পেতে হয়,—একবার নয়, শত শত বার।

২৭

পরদিন সকালে হাঁসপাতালে গিয়েই প্রথমে আইরিণের সঙ্গে দেখা। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম—"কাল আমার মেজাজটা অত্যন্ত খারাপ ছিল, তাই তোমার সঙ্গে অমন অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলাম।"

আইরিণ বললে—"জানি জানি, সেজন্যে আমি কিছুই মনে করিনি। আমি বুঝতেই পেরেছিলাম যে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে।"

—"তবু তোমার যা আঘাত দিয়েছি তার জন্য আমি দুঃখিত।"

—"আঘাত আমার একটুও লাগেনি। আমি চিনি যে, আপনি ঐ রকমের মানুষ। যখন রাগ হয় তখন যা বলেন সে আপনার নিজের মনের কথাই নয়। ওতে আমার কিছু হয়নি।"

—"সত্যি বলছো? আমি কিন্তু তারপর থেকে সারাক্ষণ ধ'রেই ভেবেছি যে অযথা তোমার মনে কষ্ট দিলাম। আমাদের দেখে তুমি আমোদ ক'রে গাড়ির কাছে এলে, আর আমি তোমায় কতকগুলো কটুকথা ব'লে তাড়িয়ে দিলাম।"

—"ভুল ভেবেছেন। সত্যিকার কটু ব্যবহার আপনি করেননি। কতকগুলো শক্ত কথা বললেই বুঝি কটু ব্যবহার হ'য়ে যায়? কিন্তু কেন আমি অমন ক'রে আপনাদের পথে আটক করেছিলাম, তা তো জানেন না? ঐ সময় আমারও ডিউটি থেকে ছুটি ছিল। আমি যাচ্ছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে। সে এরোপ্লেন চালায়। মনে করলাম আপনারাও তো হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন, আপনাদের যদি বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম না থাকে তো সেইখানে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেড়িয়ে আনবো, এরোপ্লেন ওড়া দেখিয়ে আনবো। এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। চলুন না একদিন দেখে আসবেন। আজ যাবেন? আজও আমার ছুটি আছে।"

—"যেতে পারি, কিন্তু আমার স্ত্রীকে নিয়ে নয়। সে হয়তো পছন্দ করবে না। আমি একাই যেতে পারি। বরং ডক্টর গাঙ্গুলিকেও সঙ্গে নাও। তিনজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে তারই মোটরে।"

—"সে বেশ কথা। তাহ'লে এই কথা রইল। ডক্টর গাঙ্গুলিকে আমিই ব'লে রাজি করিয়ে নেবো।"

বৈকালে আমরা তিনজনে মিলে গেলাম দমদম এরোড্রোমে আইরিণের বন্ধু একজন ডাচ্ ইঞ্জিনিয়ার, গলায় তার লাল নেকটাই বাঁধা। আমরা যখন গেলাম তখন কয়েকজন লোক একটা ছোট এরোপ্লেনের

কলকব্জা মেরামত করছিল, ঐ ইঞ্জিনিয়ার তাদের কাজের পরিচালনা করছিল। আইরিণকে দেখেই সে একগাল হেসে তাকে অভিনন্দন করলে, কালিঝুলিমাখা হাত দুখানা তাড়াতাড়ি ঘাসের উপর [illegible] নিয়ে একখানা ময়লা কাপড়ে মুছে ফেলে করমর্দন করবার অ[illegible]য়ে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। আইরিণ তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে যে আমাদের কাল সঙ্গে আনবার সুবি[illegible] হয়নি ব'লেই সে কাল আসেনি।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজী ভাষায় আমাদের আপ্যায়িত ক'রে ঐ ভদ্রলোক বললে—"আমাদের চেয়ে আপনারা ঢের বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। আমরা মানুষের তৈরি যন্ত্রকে মেরামত করি, আর আপনারা মানুষযন্ত্রকেই মেরামত করেন। শরীরযন্ত্রকে নকল ক'রেই আমাদের এই সব যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং আপনাদের পক্ষে এরোপ্লেনের কলকব্জা বুঝতে পারা কিছুই কঠিন হবে না। দেখতে চান এর কলকব্জা?

আমি বললাম—"হাঁ, দেখিয়ে দিন কেমন ক'রে এরোপ্লেন চলে।"

সে বললে—"মোটরগাড়ির চেয়েও এর ওড়ার কৌশল সহজ। পাখীরা যেমন ক'রে মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়, এরোপ্লেনও তেমনি ক'রে মাটি ছেড়ে যায়। লেজের দিকটা নীচু করতে থাকলেই নাকের দিকটা ক্রমশ ওপর দিকে ওঠে, তখন গতির বেগে আপনিই মাটি ছেড়ে ওঠে। তারপর জলে ভাসা নৌকাকে যেমন আপনারা হাল ধ'রে চালনা করেন, হাওয়ায় ভাসা এরোপ্লেনকেও আমরা তেমনি রাড্ডার দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে চালাই।"

এই ব'লে সে এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলো। কাকে বলে প্রোপেলার, যেটা সামনে ঘুরতে ঘুরতে হাওয়া কাটে,—কাকে বলে ফিউসিলাজ, যেটা এরোপ্লেনের শরীরকাণ্ড,—কাকে বলে রাড্ডার, যেটা দুপায়ে ঠেলে এরোপ্লেনকে যেদিকে ইচ্ছা চালানো

যায়,—কাকে বলে জয়-ষ্টিক্, যেটার দ্বারা লেজের হাল এবং ডানা-গুলোকে চালনা করা যায়, ইত্যাদি।

আমি বললাম—"পাখীরা যেমন ইচ্ছামত খুব ধীরেও উড়তে পারে আবার দ্রুতবেগেও উড়তে পারে, এরোপ্লেনেও কি তাই হয়?"

সে বললে—"তা হয় না। খুব ধীরে এরোপ্লেন উড়তে পারে না, ওড়ার গতিবেগের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তার কম গতিবেগ হ'লেই সে আর আকাশে ভাসতে পারে না, ধপ্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে যাবে। এরোপ্লেনের গতিবেগ ঘণ্টায় অন্তত ৪৫ মাইলের নীচে হ'লে চলবেই না। প্রথম চালাবার সময় থেকেই গতিবেগটা পুরোপুরি দিতে হবে। আপনারা যদি ওঠেন, তাহ'লে দেখিয়ে দিতে পারি কেমন ক'রে চালাতে হয়।"

আমরা উঠতে রাজি হলুম, কিন্তু ড্রাইভারের পিছনে মাত্র দুটি বসবার জায়গা। তিনজনকে সেখানে ধরে না। ইঞ্জিনিয়ার বললে, প্রথমে দুজনে আসুন, তারপর যিনি বাকি থাকবেন তাঁকে আবার নিয়ে যাবো।

প্রথমে দুজন কে কে উঠবে? আমি বললাম যে আমি থাকি, গাঙ্গুলি আর আইরিণ একসঙ্গে যাক। কিন্তু আইরিণ বললে—তা হ'তে পারে না, আপনি আগে চলুন। অগত্যা তার সঙ্গে আমিই উঠলুম। আমাদের দুজনের কান আর মাথা ঢেকে দুটো হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হোলো, ইঞ্জিনিয়ার নিজেও একটা পরলে।

সুইচ্ টিপে প্রোপেলার ঘুরিয়ে এঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়া হোলো। এরো-প্লেন কিছুক্ষণ মাটির উপর চ'লে তারপর আকাশে উঠতে লাগলো। একে এঞ্জিনের ভীষণ শব্দ, তাতে আমাদের কান দুটো একেবারে ঢাকা, সুতরাং কথা বলার চেষ্টা করা বৃথা। আইরিণ আমার হাতটা সজোরে চেপে-ধরলে। মনে হোলো যেন ভয় পেয়েই ধরেছে, কিন্তু ওর হাতের সেই নির্ভরতার স্পর্শ আমার খুব ভালো লাগলো, একটা অপ্রত্যাশিত রকমের আনন্দ আমি হঠাৎ অনুভব করলাম। অবলম্বন পাবার জন্য ও আমার

হাত ধরেছে, কিন্তু সেই স্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হ'য়ে উঠলো কেন? আইরিণের স্পর্শে ইলেকট্রিসিটি আছে নাকি? আশ্চর্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, সেই দুটি উজ্জ্বল চোখ, তাতে সেই নবপরিচয়ের প্রশ্ন। সে পরিচয় বহির্লোকের নয়, সে অন্তরলোকের। চোখ দেখলেই বোঝা যায় সকল অঙ্গে ভালো-লাগার তরঙ্গ উঠছে। সেই তরঙ্গই কি আমার অঙ্গেও সঞ্চালিত হয়েছে? আমি ওর চোখের দিকে আর চাইতে পারলাম না, বাইরের দিকে দৃষ্টি অপসারিত ক'রে নিলাম।

অতি দ্রুতগতিতে এরোপ্লেন আকাশে অনেক উপরে উঠে গেছে। নীচের দিকে চাইলে দেখা যায় পৃথিবী সমতল আর সবুজ। স্থানে স্থানে ঘন সবুজ, ফিকা সবুজ, হরিদ্রাভ সবুজের ছোপ্‌ধরা। গাছের মাথার সবুজ আর মাঠের সবুজ এক হ'য়ে গেছে, উঁচুনীচু বোঝা যায় না। শহরের বাড়িগুলো ইঞ্জিনিয়ারের নক্সার মতো আঁকা, গঙ্গানদীর ক্ষীণ ধারাটি তার মাঝে চক্‌চক্ করছে।

আইরিণের হাতের মুষ্টি শিথিল হ'য়ে এসেছে। সেও পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখছিল, আমি ফিরে চাইবামাত্র সেও ফিরে চাইলে। আমি হাসছি দেখে সেও দৃষ্টি নত ক'রে হেসে উঠলো। সে কি লজ্জার হাসি, না তৃপ্তির হাসি?

এরোপ্লেন দ্রুতগতিতে নীচের দিকে নামতে লাগলো। তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নামতে থাকলেই গা শিউরে ওঠে, নাগরদোলায় যেমন হয়। এবার আমিও তার হাতখানা চেপে ধরলাম। গাছপালাগুলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে আকাশমার্গে আমরা কিছুক্ষণ [illegible] হ'য়ে উড়ে গিয়েছিলাম, আবার সেই পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি। মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবার এক রকম নূতন আনন্দ আমরা দুজনেই উপভোগ করেছি। মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু এই আনন্দের বার্তা আমাদের স্মরণ থাকবে।

ধীরে ধীরে এরোপ্লেন মাটি স্পর্শ করল। তবু আমরা একটু ধাক্কা

খেলুম। পাশাপাশি ছিলুম, হেলে পড়াতে আইরিণের দেহের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো। দুজনেই সোজা হ'য়ে বসলুম। আমার হাতখানা একটু জোর ক'রেই ছাড়িয়ে নিলুম।

আমাদের নামিয়ে দিয়ে এরোপ্লেন গাঙ্গুলিকে নিয়ে আবার আকাশে উড়লো। আমরা নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

আমি আইরিণকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?"

সে বললে—"তা নয়, এর আগেও আমি দু'একবার এরোপ্লেনে চড়েছি। কিন্তু হাতে ধ'রে থাকবার একটা অবলম্বনের দরকার হয় আমার। কিছু না ধ'রে বসলে ভরসা হয় না।"

আমি বললাম—"তোমার সঙ্গে এসে আমার এরোপ্লেনে ওঠা হ'য়ে গেল।"

আইরিণ বললে—"তার চেয়েও বেশি লাভ আমার হয়েছে। সেদিন মোটরে আমার কাছে বসতে আপনার সঙ্কোচ হয়েছিল, কিন্তু আজ আর কোনো সঙ্কোচ হয়নি।"

আমি বললাম—"তখন তুমি অচেনা ছিলে, কিন্তু এখন যে তোমার অনেক পরিচয় পেয়েছি।"

সেদিন বাসায় ফিরে পাঞ্চালীকে বললাম যে ডক্টর গাঙ্গুলি আর আইরিণের সঙ্গে আমি এরোপ্লেন চড়তে গিয়েছিলাম। শুনে সে খুব ভয় পেলে, বললে ওরকম অসমসাহসিক কাজ করতে যাওয়া আমার উচিত হয় নি। আগে জানলে সে কিছুতেই যেতে দিত না। তার এই অহেতুক ভয় আমি হেসেই উড়িয়ে দিলাম।

এর পর থেকে আমরা প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। কোনো দিন বা সিনেমায়, কোনোদিন শহরের বাইরে, কোনোদিন আউটরাম ঘাটে। ডক্টর গাঙ্গুলির মোটর থাকায় বেড়াতে যাবার কোনো অসুবিধা ছিল না।

একদিন যোগাড়যন্ত্র ক'রে সদলবলে পিকনিক করতে যাওয়া গেল। রবিবারে সাধারণত কোনো অপারেশন হয় না, সুতরাং কাজের বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারলেই সেদিন ছুটি পাওয়া যায়। আমরা অটলদা'কে বললাম সেদিনকার কাজটা চালিয়ে দিতে, আইরিণও নিজের কাজের ব্যবস্থা ক'রে নিলে। ভোর রাত্রি চারটার সময় আমরা রওনা হলাম। এবার পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। আইরিণও তার ছেলে জনকে সঙ্গে নিয়েছিল। সাত-আট বছর বয়সের চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট ছেলে, সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, সেখানকার হষ্টেলেই থাকে। গাঙ্গুলি সঙ্গে নিয়েছিল তার দোনলা বন্দুক।

যশোর রোড ধ'রে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে যখন একটা বনের ধারে আমরা থামলুম তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। গাঙ্গুলি বললে, এইখানে একটা গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া যাক্, চা খাবার প্রয়োজন হয়েছে। বনের মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে একটা বটগাছের তলা বেছে নিয়ে সেইখানেই গাড়ি রাখা হোলো। সঙ্গে ছিল সতরঞ্চি আর দুটো মোড়া, সেইখানেই সেগুলো পাতা হোলো। গাঙ্গুলি বললে—"এইবার চা তৈরি করার ভার দেওয়া হোক আইরিণকে। ও চমৎকার চা করতে পারে। আমরা ততক্ষণ বনের ভিতর ঢুকে কিছু শিকার ক'রে নিয়ে আসি। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থার ভার থাকবে বৌদির উপর। যে কাজে যে পটু তাকে সেই কাজের ভারই দেওয়া উচিত। কী বলেন বৌদি?"

পাঞ্চালী হেসে বললে—"আমি তাতে রাজি আছি।"

গাঙ্গুলি বললে—"তবে চলুন আইরিণ যতক্ষণ চা তৈরি করবে ততক্ষণ আমরা একটু শিকার ক'রে আসি।"

পাঞ্চালী বললে—"তা চলুন, বনজঙ্গলের মধ্যে যেতে আমার খুব ভালো লাগে, ছেলেবেলায় কত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু বন্দুক নিয়ে যাবেন না, ও আমার বড় ভয় করে। পাখীটাখী মেরে কাজ নেই।"

গাঙ্গুলি বললে—"আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু বন্দুকটা আমার হাতেই থাক, বনের মধ্যে বন্দুক না নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।"

জন্ বললে সেও যাবে, সুতরাং তাকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে গেল।

আইরিণ ষ্টোভ নিয়ে বসলো, কিন্তু সেখানে এমন হাওয়া যে ষ্টোভ জ্বালা অসম্ভব ব্যাপার। সে অনেকবার অনেক রকম ক'রে চেষ্টা করলে, ব্যর্থকাম হ'য়ে তার মুখচোখ লাল হ'য়ে উঠলো। আমি দেখলাম ও ষ্টোভ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছে, আর আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, এটা ঠিক নয়। বললাম—"আমি সতরঞ্চি ধ'রে হাওয়াটা আড়াল ক'রে দাঁড়াই, তাহ'লেই ষ্টোভ জ্বলবে।"

হাওয়া আড়াল ক'রে দাঁড়াতে ষ্টোভ জ্বললো। আইরিণ জল চড়িয়ে দিয়ে বললে—"আর কষ্ট করতে হবে না, আপনি আড়াল ছেড়ে দিয়ে বসুন, এইবার ও আপনিই জ্বলবে।"

সতরঞ্চিটা পেতে নিয়ে আমি সেইখানেই ব'সে পড়লাম। আইরিণ বললে—"কী চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে দেখছেন? আমার খুব ভালো লাগছে এই জায়গাটা।"

আমি বললাম—"সকালবেলায় এমন বনের ভিতরকার টাটকা গন্ধ আর গাছপালার ঠাণ্ডা হাওয়া সকলেরই ভালো লাগে। এমন হাওয়া তুমি শহরে কোথায় পাবে?"

সে বললে—"শুধু তাই নয়, আমার মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। এমনি চারিদিকে গাছপালার বন, বাতাসের শন শন শব্দ, ঐ দূরে ছাগল

ডাকচে, আমার আত্মীয়-বন্ধুরা বনের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনার মতো কেউ একজন আমার কাছে ব'সে গল্প করচে, আর আমি গাছতলায় ষ্টোভ জেলে সকলের জন্যে চা তৈরি করছি,—এ যেন আমার পক্ষে নতুন নয়, স্বপ্নে অনেকবার এইরকম দেখেছি।"

আমি বললাম—"ওটা হোলো কল্পনার স্বপ্ন। মানুষের মনে যে কল্পনা জাগে, তাই নিয়ে কেউবা স্বপ্ন দেখে, কেউবা কাব্য রচনা করে। কল্পনা আর স্বপ্নে বিশেষ তফাৎ নেই। আজ হয়তো কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের অনেকটা মিল হয়েছে, তাই ঐকথা তোমার মনে হচ্ছে।"

আইরিণ বললে—"ঠিক বলেছেন, আজ আমার সেইজন্যই এত ভালো লাগছে। কিন্তু এতে আমরা কত আনন্দ পাই দেখুন। নিত্যদিনের কাজের মধ্য থেকে একটু ছুটি পাওয়া, নিজের প্রিয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে লোকের ভিড় ছেড়ে বাইরে কোথাও পালিয়ে যাওয়া, সেখানে গিয়ে—"

বলতে বলতে আইরিণ থেমে গেল। আমি বললাম—"থামলে কেন? ব'লে যাও সব কথা, তোমার কল্পনাকাহিনী শুনতে আমার খুব আমোদ হচ্ছে।"

আইরিণ বললে—"আর শুনতে হবে না। এইবার আপনি বরং পাউরুটিগুলো কাটুন দেখি, আমি ততক্ষণ চায়ের সরঞ্জামগুলো বের ক'রে সাজাই।"

আমি বললাম—"বেশ তো, কাজও করা যাক তোমার কাহিনীও শোনা যাক।"

আমি পাউরুটি কাটার কাজে ব্যাপৃত হলাম, আইরিণ দুধ চিনি চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে লাগলো আর বক্ বক্ ক'রে বকতে লাগলো। কোথায় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে, কত রকমের আমোদ করা যেতে পারে, পাহাড়ে উঠতে কেমন মজা লাগে, হাত ধরাধরি ক'রে সমুদ্রে ঢেউ খেতে কেমন আরো মজা লাগে, নদীতে সবাই মিলে

সাঁতার কাটলে কত আনন্দ, বরফের ওপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পা পিছ্‌লে আছাড় খাওয়া সে আরো কত আনন্দ, এই সমস্ত নানাবিধ আনন্দ উপভোগের পরিকল্পনা সে একটার পর একটা ক্রমাগতই ক'রে যেতে লাগলো। আশ্চর্য এই যে আমিও উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিয়ে যেতে লাগলুম। কত যে সময় কেটে যাচ্ছে তার কোনো খেয়াল নেই। মনে মনে ভাবছি, আমি আজ এত মুখর হ'য়ে উঠলুম কেমন ক'রে? বলবার কথা আমার মনে এতই ছিল?

হঠাৎ একসময় আমার দিকে চেয়ে সে ব'লে উঠলো—"ও কী রকম পাঁউরুটি কাটা হচ্ছে? সব যে বাঁকাচোরা হ'য়ে গেল! আর অতো মোটা মোটা রুটি কি মানুষ খেতে পারে? দিন আমাকে, আমি দেখিয়ে দিই কেমন ক'রে কাটতে হয়। ততক্ষণ বরং আপনার চা-টা খেয়ে নিন।"

—"সে কি, এর মধ্যেই চা হ'য়ে গেল? ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে, ওরা এসে ঠাণ্ডা চা খাবে?"

—"সে ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি, চা তৈরি ক'রে ফ্লাস্কের মধ্যে ভ'রে রেখেছি।"

আমি রুটি কাটা ছেড়ে দিয়ে চা খাচ্ছি, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গেল। উপর্যুপরি দুবার শব্দ হোলো। আমরা ভাবলুম যে ওরা কিছু শিকার পেয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই ওরা ফিরলো। দেখা গেল গাঙুলি হাসতে হাসতে আসছে, কিন্তু পাঞ্চালীর মুখের ভাব অপ্রসন্ন।

—"কী শিকার হোলো?"

—"কিছুই না, গাছের পাতা শিকার। বৌদি বললেন পাখী মারতে পাবো না, জন্ বললে একটা কিছু শিকার করুন। দুজনের কথাই রাখলুম' গাছের পাতা লক্ষ্য ক'রেই গুলি করলুম।"

আইরিণ বললে—"আপনার বন্দুক ফায়ার করাই অন্যায় হয়েছে, মিসেস্ মুখার্জি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। জন্ বড় দুষ্টু ছেলে, ওর কথা আপনি শুনতে গেলেন কেন ?"

গাঙ্গুলি বললে—"বন্দুকটা এনেছি, একটু ফায়ার করবো না ? তাতে আর কী হয়েছে ? বৌদি কখনো আমার ওপর রাগ করতে পারেন ?"

পাঞ্চালী গম্ভীর মুখে বললে—"বন্দুকের আওয়াজ আমি মোটে পছন্দ করি না।"

সকলে মিলে চা-রুটি খাওয়া হোলো। তারপর রন্ধনের পালা পাঞ্চালী আর আইরিণ দুজনে মিলে তার ব্যবস্থা করতে লাগলো। গাঙ্গুলি আর জন্ গাছে চড়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত হোলো, আমি একা চ'লে গেলাম বনের মধ্যে বিচরণ করতে। অনেক দেরী ক'রে যখন ফিরলাম তখন দেখি রান্না হ'য়ে গেছে—খিচুড়ি আলুভাজা আর বেগুনভাজা। সকলে মিলে তাই খেলাম। আইরিণ খুব আমোদ করেই খেলে, কিন্তু পাঞ্চালী কিছুই খেলেনা, সে সমস্ত দিন উপবাস ক'রে রইল। যদিও সে বললে তার ক্ষুধা নেই, কিন্তু আমি বুঝলাম আইরিণের স্পর্শদোষই এর কারণ।

বৈকালে আবার আমরা চায়ের মতলব করেছিলাম, কিন্তু বৈকালের দিকে খুব বৃষ্টি এলো। আমরা সকলে আনন্দ ক'রেই ভিজলাম এবং ভিজা কাপড়েই গাড়িতে উঠলাম। যখন কলকাতায় পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

বাসায় ফিরে পাঞ্চালী বললে—"ওদের সঙ্গে কোথাও যেতে ভালো লাগে না।"

আমি বললাম—"তবে আর কখনো তুমি যেওনা।"

বৃষ্টিতে ভিজে আইরিণের ছেলে জনের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হোলো। তাকে হস্টেল থেকে এনে আইরিণ নিজের কোয়ার্টার্সে রাখলে। হাঁসপাতালে ভর্তি ক'রে দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আইরিণ বললে, তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভালো হবে, রাত্রে ও ছেলের কাছে থাকতে পারবে। ওদের সিস্টারকে ব'লে ছেলের অসুখ না সারা পর্যন্ত রাত্রের ডিউটি রেহাই করিয়ে নিলে। নার্সদের কোয়ার্টার্সে আইরিণের পাশের ঘরখানা ওর ছেলের থাকবার জন্য ছেড়ে দেবার ব্যবস্থাও হোলো। আইরিণ আমাকেই বললে তার ছেলের চিকিৎসা করতে। আমি অটলদা'র নাম করেছিলাম, কিন্তু তাঁর চিকিৎসার ওর বিশ্বাস ছিল না।

আইরিণের ছেলের চিকিৎসার ভার নিয়ে আমাকে রোজ দুবেলা সেখানে যেতে হোতো। একবার যেতাম খুব সকালে, হাঁসপাতালের কাজে যাবার আগে,—আর একবার যেতাম রাত্রে, হাঁসপাতালের সমস্ত কাজ শেষ ক'রে। এ-ছাড়া প্রয়োজন হ'লে মাঝে আরো দু-তিন বার গিয়ে দেখে আসতাম। সে আমার বাবার অসুখের সময় যথেষ্ট করেছে, সুতরাং আমারও কিছু করা উচিত। রাত্রে গিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ থাকতাম, ওর ছেলের কাছে ব'সে আইরিণের সঙ্গে গল্প-গুজব করতাম। আইরিণ আমাকে তখন নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে খাওয়াতো, কোনো দিন বা আইসক্রীম পুডিং তৈরি ক'রে খাওয়াতো। ঐ জিনিষটির প্রতি আমার বড় লোভ ছিল।

ডক্টর গাঙ্গুলিও প্রায় যেতো আইরিণের ছেলেকে দেখতে, অটলদা'ও মাঝে মাঝে যেতেন।

যথোচিত ভাবেই চিকিৎসা করা হচ্ছিল, কিন্তু তবু আরোগ্যের অনেক

বিলম্ব হ'তে লাগলো। জ্বর কিছুতেই ছাড়তে চায় না, ছেলেটাও ক্রমশ দুর্বল হ'য়ে যাচ্ছে। আমি বরং একটু উদ্বিগ্নই হ'য়ে উঠলুম, কিন্তু দেখা গেল আইরিণ মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। ছেলের অসুখের প্রথম থেকেই দেখে আসছি আইরিণ বেশ নির্ভাবনায় আছে, সম্পূর্ণ সহজভাবেই হাসছে, গল্প করছে, ছেলের অসুখে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি, বরং মনে হয় যেন খুশি হয়েছে। আমি ভাবতুম, ছেলের অসুখে মায়ের প্রাণ একটুও বিচলিত হয়না কেন? ওটা যেন গ্রাহ্যের বিষয়ই নয়, এমনি ভাব ও দেখায়। এত স্ফূর্তিই বা কিসের? ভাবলুম, ছেলেকে অষ্টপ্রহর নিজের কাছে রাখতে পেরেছে, সেইজন্যই বুঝি।

ওকে একদিন আমি বললাম—"অনেকদিন হ'য়ে গেল, জ্বরটা ছাড়চে না, এ ভালো কথা নয়। একদিন প্রিন্সিপ্যালকে ডেকে এনে দেখালে হয় না?"

—"কিছু দরকার নেই, ও আপনার ওষুধেই ঠিক সেরে উঠবে।"

—আচ্ছা, তাই না হয় হোলো, কিন্তু আমার এত ভাবনা হচ্ছে, আর তোমার একটুও ভাবনা হয়না কেন? দিব্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো দেখতে পাই। ছেলের অসুখে তুমি যেন বরং খুশি হয়েছো, এই কথাই মনে হয়।"

—"তা তো নিশ্চয়ই। ওর অসুখ দুদিনেই সেরে যাবে। কিন্তু এই অসুখটি না হ'লে কি আপনি রোজ এতবার এখানে আসতেন? কতবার আপনাকে আসতে হয় সেটা ভেবে দেখুন। ওর ভাগ্যিস অসুখ হয়েছে, তাই না আসেন!"

—"এ কেমন কথা? আমি এলেই কি যথেষ্ট একটা লাভ হোলো? আমার আসাটা এমন কিছু দুর্লভ ব্যাপার নয়। হাসপাতালে তো রোজ অসংখ্যবার তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। এ তো একঘেয়ে ব্যাপার।"

—"সেখানে দেখা পাওয়া আলাদা, আর এখানে আলাদা। সেখানে আপনি আমার হাউস-সার্জন, আর এখানে আপনি বন্ধু। বন্ধুকে

যতবারই দেখা যায় ততবারই ভালো লাগে। তাই কখনো একঘেয়ে হয়?"

আমি আর ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কথা বললাম না, অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেললাম।

এরপর একদিন সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি, ছেলেটি বিছানায় ছট্‌ফট্ করচে, আর আইরিণ তার কাছে গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। আমার সেদিন যেতে একটু দেরী হয়েছিল। আমাকে দেখেই আইরিণ বললে—"দেখুন তো, ছেলেটা যেন কেমন করচে।"

রোগীর মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখি মারাত্মক ব্যাপার। ওর মুখ একেবারে নীলবর্ণ হ'য়ে গেছে, হাতের নখগুলো পর্যন্ত নীলাভ দেখাচ্ছে এদিকে ও ছট্‌ফট্ করছে আর হাঁপাচ্ছে, রীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম—"এই দেখে তুমি চুপ ক'রে ব'সে আছো? ওঠো ওঠো, এখনই অক্সিজেন আনবার ব্যবস্থা করো।"

—"ও, আচ্ছা,—আপনি তাহ'লে এইখানে বসুন, আমি আনিয়ে দিচ্ছি"—এই ব'লে সে তখনই চ'লে গেল।

তখন আমি নাড়ীতে হাত দিয়ে দেখি, নাড়ী খুব দ'মে গেছে, প্রায় পাওয়াই যায় না। হার্ট পরীক্ষা ক'রে দেখি অনিয়মিত গতিতে চলেছে, প্রায় হার্টফেল হবার উপক্রম। কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়না। অথচ ওর মা কোথায় চ'লে গেল, তার আর কোনো পাত্তাই নেই।

আমি বিলক্ষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ডাক্তারি বিদ্যার সঙ্গে একটি জিনিষ আমরা শিখি,—সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকার—কৌশল। যতই সর্বনাশ হোক, কর্তব্যগুলো ক'রে যেতে পারি। পাঁচ মিনিট অন্তর ক'রে কয়েকটা ইনজেকশন দিতে লাগলুম। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে ইনজেকশন দেবার পর হার্ট যেন একটু সবল হোলো,

মুখের নীলবর্ণ টা মিলিয়ে আসতে লাগলো। আরো একটা ইনজেকশন দিলাম। যখন নাড়ী অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে, তখন অক্সিজেন নিয়ে আইরিণ এসে উপস্থিত।

—"এতক্ষণ দেরী ক'রে এলে, তোমার একটু ভয় হোলো না?"

—"ভয় কিসের? আপনি তো রয়েছেন। এই তো অনেকটা সেরে উঠেছে দেখ্‌চি।"

—"এমনিই বুঝি সেরে উঠেছে? আমি ওকে পাঁচটা ইনজেকশন দিয়েছি। হার্টফেল হবার উপক্রম হয়েছিল, তাতো তুমি জানো না!"

—"জানি, আগের থেকেই ওরকম হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যে তো আপনি নিজেই এসে পড়লেন। আর কি অক্সিজেন দেবার প্রয়োজন আছে?"

প্রয়োজন বিশেষ ছিল না, তবুও কিছুক্ষণ অক্সিজেন দেওয়া হোলো। রোগী সুস্থ হ'য়ে কিছু খেলে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

আইরিণ তখন বললে,—"আমি কি ভয় পাইনি মনে করচেন? খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি আর কী করতে পারি, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জানি যে আপনি এসেই ওর যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।"

—"আমার যদি আসতে আরো দেরী হোতো? কিংবা যদি নাই আসতুম?"

আশ্চর্য ধরণের একটুখানি হেসে আইরিণ বললে—"আপনি নিশ্চয়ই আসবেন, আমি তো জানি।"

আইরিণের ছেলে ক্রমে ক্রমে সেরে উঠতে লাগলো, কিন্তু সে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে না হ'তেই আইরিণ নিজে জ্বরে পড়লো। সম্ভবত ছোঁয়াচ লেগে হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো ভাব। আমিই চিকিৎসা করতে লাগলুম এবং পূর্বের মতোই প্রত্যহ ওকে দেখতে যেতে লাগলুম।

রোগ আর প্রেম,—এ দুটোই সংক্রামকধর্মী, দুইয়ের আক্রমণপদ্ধতি একই রকম। প্রথম কখন যে ওর সংক্রমণ প্রবেশ করলো তা জানাই যায় না। অতি অতর্কিতে, অতি সূক্ষ্মভাবে, অতি ধীরে এই ব্যাপার একদিন ঘটে যায়, তার কোনো ইতিহাস নেই। তারপর হঠাৎ একদিন টের পাওয়া যায় কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণের দ্বারা। তখন জানা যায় রোগ হয়েছে। পূর্বের থেকে সাবধান হ'য়েও অনেক সময় নিবারণ করা যায় না, একজনকে ধরলেই প্রায় আর একজনকে ধরে।

এইবার যা লিখতে যাচ্ছি, সে কথা অত্যন্ত গোপনীয়। তবু সবই আমাকে লিখতেই হবে, নইলে গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাধারণের মধ্যেও যে অসামান্যতা আছে, সে ক'জন জানে? সাধারণভাবে দেখা যায় ব'লেই তার অপরূপত্ব সকলের অগোচর থেকে যায়। যে সৌন্দর্য অসূর্যম্পশ্য, তাকে দেখবার জন্যই সকলে উৎসুক, দেখতে পেলেই অমনি নজরে পড়ে। কিন্তু যে সৌন্দর্য সাধারণ, তার অসামান্যতা দেখবার জন্য স্বতন্ত্র দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টি কখন যে কার খুলে যাবে তা কিছুই বলা যায় না।

আইরিণ নিতান্ত সাধারণ মেয়ে এই কথাই আমি জানতুম। তার অন্তরের পরিচয় অনেক পেয়েছি, শ্রদ্ধাও করি যথেষ্ট। কিন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে ওর যে কোনো সম্পদ আছে সে কথা কখনো ভাবিনি। ওর চোখের দৃষ্টিতে কী যেন একটা রহস্য আছে, ওর মুখের ভাবে থেকে-থেকে কিছু যেন একটা নূতন জিনিষের আভাষ পাওয়া যায়,—একথা ইদানিং কয়েকবার মনে হয়েছে বটে, কিন্তু তারপর তখনই সেকথা ভুলে গিয়েছি।

যে দিন দেখলুম জ্বর হ'য়ে আইরিণ বিছানায় শুয়ে আছে, সেদিন ওর কেমন একটা যেন নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করলুম। সমস্ত দেহ রয়েছে আবৃত, কেবল নিরাভরণ নগ্ন বাহু দুটি নিস্পন্দ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে আছে। এতদিন লক্ষ্য করিনি, কিন্তু আজ দেখলুম ওর বাহুমূলের গঠন অতি সুন্দর। নিদ্রিত লাবণ্য বুঝি ওখানে একটি স্পর্শের আশায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে, স্পর্শ ক'রে দিলেই একেবারে চঞ্চল হ'য়ে সচেতন হ'য়ে উঠবে। একবার স্পর্শ করতে আমার খুব ইচ্ছা হোলো, সে ইচ্ছা আমি দমন করলুম।

যথারীতি পরীক্ষা করতে লাগলুম। বুক পরীক্ষার সময় বিনা সঙ্কোচে ও জামার বোতাম খুলে দিলে।

অনাবৃত-বক্ষ দেখে আমি চমকে উঠলুম। এখানে এত কমনীয়তা, এত শুভ্রতা? বাইরের থেকে যাকে মনে হয় সাধারণ, তার বুকের ভিতর লুকানো এতই বিস্ময়? ধব্ধবে বস্ত্রাবরণের শুভ্রতা ওর দীপ্তির কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। সাদা মেঘের অন্তরালে যেন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল লুকিয়ে, আবরণ সরিয়ে দিতেই একেবারে ঝক্মকিয়ে ভেসে উঠলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে ওঠানামা করছে, সেই বক্ষের আধখানা মাত্রই পরিদৃশ্যমান, পত্রান্তরালবর্তী পুষ্পগুচ্ছের মতো। বস্ত্রের কিছু অন্তরালে থাকলেও স্পষ্ট দেখা যায়, নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র, নাতিকঠিন, নাতিকোমল,—

কিন্তু বৃথাই আমার চেষ্টা। যে অ্যানাটমি আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি, আমার এ ভাষায় তা সম্ভব নয়। ও বর্ণনার ভাষা স্বতন্ত্র।

অনাবৃত নারীবক্ষ আমরা অনেক দেখে থাকি। যা নিত্যই দেখি, সহস্র সহস্রবার যে দৃশ্য দেখে কখনো কোনো মানসিক চাঞ্চল্য জাগে নি, আজ এতকাল পরে কেন তাই দেখে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য আমার মনে জেগে উঠলো?

কিসে যে কী হয় তা আমি জানি, যৌনবিজ্ঞানের বইগুলো আমার পড়া আছে। কিন্তু আমারই হবে এই বিহ্বলতা? সে কার জন্য? কিসের জন্য? ঐ রূপটি, কিংবা ঐ মানুষটি?

সে সময় আমার যা মনে হয়েছিল তাই বলি।

মনে হোলো ঐ অনাবৃত বক্ষে আমি এক অপূর্ব্ব বর্ণলীলা দেখছি। একটা অনির্বচনীয় [illegible] স্বচ্ছতা ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে, চারিদিক তাতে আলোকিত হ'য়ে গেল। এ যেন রেডিয়ম হিলিয়মের মতো এমন কোনো পদার্থ দিয়ে গড়া, যার স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতি আমার দৃষ্টি ভেদ ক'রে, আমার মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে, আমার সর্ব অবরোধ ভেদ ক'রে, পরম চৈতন্যস্থলের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হোলো। এই জ্যোতি বুঝি সর্বসন্তাপহারী, অন্তরে লুকায়িত দারুণ ক্যানসার রোগও এতে আরোগ্য হ'য়ে যায়। রূপ সামান্যই জিনিষ, কিন্তু তার জ্যোতি কেন এমন অসামান্য?

এই নারীবক্ষ? মাতৃবক্ষ কেমন তা আমি জানি না, পত্নীর বক্ষ কেমন তা জানি। কিন্তু এই প্রথমদৃষ্ট নারীবক্ষ নূতন রকমের। ও যেন এক তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ, যাতে অবগাহন করলেই আনন্দ।

যে সৌন্দর্য দেখলাম তাকে আমি পূজা করি, না কামনা করি? সে কথা জানি না, কিন্তু মনে হোলো এ স্বতন্ত্র একটা আবিষ্কার,—গভীর রাত্রে অকস্মাৎ চন্দ্রোদয়ের মতো, অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ আমেরিকা আবিষ্কারের মতো। ছেলেবেলায় যত রুদ্ধ দেবমন্দির দেখেছি, তার দ্বারগুলো আজ খুলে গেছে। সব মন্দিরগুলো আজ একটিমাত্র মানুষের দেহে রূপান্তরিত হয়েছে, সেখানে স্বয়ং দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সেই দেবতাকে আর অবিশ্বাস করা চলবে না।

নারী যে বুকের আবরণ উন্মোচন করে না, সে খুবই ভালো। যে পূজারী পূজা করতে জানে, সেই এসে এই মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করুক

অনেক কথাই তখন আমার মনে উদয় হয়েছিল, সেই জন্য পরীক্ষা করতেও কিছু বিলম্ব হোলো। আইরিণের চোখ ছিল মুদ্রিত, সে বোধ হয় আমার ভাবান্তর কিছু লক্ষ্য করেনি। বিহ্বলতা কাটিয়ে নিয়ে আমি অভ্যাসমতো পরীক্ষা করলুম। বুকে অল্প সর্দি বসেছে, সে কথা তাকে বললাম।

এর পর থেকে প্রত্যহই আমি ঐ সময়টির প্রতীক্ষা ক'রে থাকতুম, কখন আবার পরীক্ষা করবো, কখন আবার সেই সৌন্দর্য দেখবো। আমার সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত সংযম, সমস্ত গর্বকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মন ঐ সময়টির জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠতো। কার সাধ্য সে ব্যগ্রতার প্রতিরোধ করে? প্রাণপণে সঙ্কল্প করতুম যে চোখ দিয়ে আমি কিছুই দেখবো না,—আমি ডাক্তার, শুধু কান দিয়েই আমার শোনার কাজ, কিন্তু বৃথাই সে সঙ্কল্প। চোখ থাকতো উন্মুক্ত হ'য়ে। কোনো তর্কের বাধাই সে মানতো না।

এমনি ক'রেই কয়েকদিন কাটলো। আইরিণ ক্রমশ সেরে উঠতে লাগলো। শেষে একদিন এমনি ক'রেই আমার নিজের অজ্ঞাতসারে অনাবৃত সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সংযমের বাঁধ ভেঙে আমার মাথাটা ওর বুকের উপর নত হ'য়ে পড়লো। যদি বলি তখন আমার অনুভূতিমাত্র ছিল কিন্তু বাহ্যজ্ঞান কিছু ছিল না, তাহ'লে একটুও মিথ্যা বলা হবে না। পাশেই শুয়ে ছিল আইরিণের ছেলে জন্, সে নিদ্রিত না জাগ্রত সে দিকে কোনোই লক্ষ্য নেই। একটা উত্তপ্ত কোমলতার স্পর্শে আর নারী-বক্ষের সৌগন্ধে আমার অন্তরাত্মা বিভোর। মনুষ্যমাংসের এমন একটা অনির্বচনীয় আস্বাদ আমি সেই মুহূর্তে পেয়ে গেলুম যা চিরদিনের জন্য আমার ওষ্ঠে মুদ্রিত হ'য়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে আইরিণের কথায় আমার চৈতন্য ফিরলো। অস্ফুটস্বরে সে বললে—"উঠে বসুন, জন্ এখনো ঘুমোয়নি।"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে আমি উঠে বসলুম।

আইরিণ বললে—"পাশের ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

আমি ধীরে ধীরে তার সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে বসলুম।

একটা চেয়ারে গিয়ে আমি বসলাম, আইরিণ বসলো আমার পাশে। কিছুক্ষণ পরে বললে—"আমাকে কি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইছিলেন ডক্টর মুখার্জি ?"

স্খলিতকণ্ঠে বললাম—"তোমার কথাটা বুঝতে পারলুম না।"

—"আমার চরিত্র কেমন তাই বুঝি পরীক্ষা করছিলেন ?"

—"না না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারলে না ?"

—"বুঝতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করছি। আপনি হঠাৎ এ কী করলেন ?"

—"আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি। একটা দুর্বলতা। তুমি বিশ্বাস করো, জীবনে কখনো আমি—"

"আমি জানি, জানি ডক্টর মুখার্জি, আপনাকে আর আমি চিনি না ? কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কারোই কোনো হাত নেই। ঐ দুর্বলতা আমারো তো, এতদিন তা চেপেই আছি। মনের ভিতর যে জিনিষ জন্মায় সে আপনিই হয়। নইলে আমিও অনেক মানুষ দেখেছি, আপনার সম্বন্ধেই বা আমার এমন হবে কেন ? আর আপনিও মেয়েদের যথেষ্ট দেখেচেন, আমার সম্বন্ধেই বা আপনি এমন হ'য়ে যাবেন কেন ? অবশ্য এ কথা আমি অনেকদিন থেকেই জানি যে আপনি খুব সুখী নন, আপনার মনে অনেক অশান্তি আছে তা আমি দেখেছি। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিন। ভালোবাসলেই একদিন তার ওপর একটা অধিকার-বোধ এসে পড়ে, সেই কথাটাই কেবল ভাবছি। আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি। সেইজন্যেই আজ আমার এত ভয় হচ্ছে।"

—"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"যতক্ষণ অধিকার নেওয়া হয় নি, ততক্ষণই ভালোবাসা থাকে প্রবল। অধিকার নিলেই ভালোবাসা ফুরিয়ে যায় দেখতে পাই। সেই ভয় আমার হচ্ছে। বেশ আমরা ছিলুম, মনে মনে দুজনে খুবই ভালোবাসছিলুম কিন্তু আর বুঝি কিছু রইলো না। এইবার অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে, তার পরেই সব ফুরিয়ে যাবে। যতক্ষণ আপনি আমাকে তাচ্ছিল্য করেছেন, আঘাত করেছেন, ততক্ষণ একরকম নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু এইবার মহা বিপদ হোলো।"

—"এত কথাই বা তুমি ভাবছো কেন ?"

—"আমি ঠেকে শিখেছি, সেইজন্য এত কথা ভাবছি। আমার জীবনের ইতিহাসটা আগে শুনুন, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন। ইউরোপে আমার জন্ম, কিন্তু আমি ভারতবাসীর মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন ভারতীয়, আর মা ছিলেন ইউরোপীয়। এই দেশ থেকে বিলাতে গিয়ে বাবা আর ফেরেন নি, মাকে বিয়ে ক'রে সেইখানেই থেকে গেলেন। আমি তাঁদের একটিমাত্র মেয়ে। বিলাতেই আমার জন্ম, বিলাতেই আমার শিক্ষা। একজন ইংলিশম্যান আমাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হোলো। বাবার মৃত্যুর পর আমার স্বামী চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে এলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে এলুম। এখানে এসে কিছুকাল পরেই আমার স্বামী মারা গেলেন। নার্সিং কাজের প্রতি আমার বরাবর একটা ঝোঁক ছিল, সংসারের বন্ধনমুক্ত হ'য়ে আমি নার্সিং এর কাজে লেগে গেলুম। এই আমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।"

"আমার স্বামী প্রথমে আমাকে যথেষ্টই ভালোবাসতেন, আমিও তাঁকে কম ভালোবাসিনি। বিয়ে হবার পরেও আমরা বেশ ছিলাম, মোটামুটি কোনো অশান্তি হয় নি, সংসার আমাদের সুখেই চলতো। কিন্তু এখন বলতে বাধা নেই, আমার মন যেন কখনই পরিতৃপ্ত হয়নি, ভিতরকার আশাটা মেটেনি। যা আমি চেয়েছিলুম, তাঁর কাছে সেটুকু পাইনি

আমার প্রকৃতি একরকম, তাঁর প্রকৃতি অন্য একরকম। তিনি ভাবতেন, আমি যেন তাঁর স্থূল প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যই আছি, আমারও সেই ভাবেই চলা উচিত। তাঁর মন যে কিছু অনুদার ছিল তা নয়, কিন্তু তার গণ্ডী ছিল সঙ্কীর্ণ। আমার যা কিছু শক্তি আর যা কিছু সম্পদ সবই কেবল তাঁর জন্য নিযুক্ত থাকবে, সে অপর কারো কাজে প্রয়োগ করা চলবে না। আমাকে নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। লোকের কাছে বলতেন যে অমূল্যরত্নের মতো তিনি আমাকে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ আবিষ্কার তাঁর নিজের প্রয়োজনে, যদি অন্যের প্রয়োজনে লাগতুম তাহ'লে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, তখন আমাকে বিদ্রূপ করতেন, দমন করতেন। ক্রমাগতই তিনি আমাকে নজরবন্দী রাখতে চাইতেন, বাড়ির বাইরে যেতে দিতেন না, কারো সঙ্গে মিশতে দিতে চাইতেন না। যদি কখনো বাইরের থেকে এসে আমাকে দেখতে না পেতেন তাহ'লে মহা হাঙ্গামা বেধে যেতো। অযথা সন্দেহে কোনো কোনো দিন আমার উপর অত্যাচার করেছেন, আমাকে চাবুক পর্যন্ত মেরেছেন। যেন আমি তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু ও রকম সম্পত্তি হ'য়ে থাকবার প্রকৃতি আমার নয়। আমার দয়ামায়া আছে, স্নেহমমতা আছে, সেগুলো কোথায় যাবে? পরের দুঃখ-দারিদ্র্য আমি সইতে পারি না, কেউ আমার সাহায্যপ্রার্থী হ'লে তাকে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এ তাঁর কিছুতেই সহ্য হোতো না। কাজেই অনেক সময় আমাকে লুকোচুরি করতে হোতো। তিনি আমাকে ঐশ্বর্য দিয়ে মুড়ে রাখতেন, কিন্তু সে ঐশ্বর্য তাঁর নিজের কাজে ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগতো না। এই অধীনতা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠতো। মাঝে মাঝে স্পষ্টই তাঁকে বলতাম যে অধিকারের একটা সীমা আছে, বেশি জোর করলেই আমি বিগড়ে যাবো। আমি রেগে উঠলেই তিনি ভয়ে কাঁচুমাচু হ'য়ে যেতেন, কিছুদিন আর কোনো রকম বাড়াবাড়ি করতেন না। তখন আমি আবার অনেক কথাই

তাঁকে বলতুম। কিন্তু আমার এই যুক্তিপ্রিয়তা হাজার চেষ্টাতেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পূর্বেকার স্বভাব প্রবল হ'য়ে উঠতো। বারে বারে রাগ করতে আমার মায়া হোতো। আমি জানতুম, তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, তাই অমন করেন। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থপর হ'লেও সেটা ভালোবাসা। আমাকে তিনি নিজের স্ত্রী হিসাবেই দেখেন, মানুষ হিসাবে দেখতে পান না। আমিও তাঁকে ভালোই বাসতুম—হাঁ সত্যিই ভালো বাসতুম। নইলে নিজের আদর্শকে সঙ্কুচিত ক'রে অমন লুকোচুরির দ্বারা তাঁর প্রতি আঘাত বাঁচিয়েই বা চলবো কেন? তিনি ছিলেন আমার সঙ্গী, আমার হৃদয়ের বল-ভরসা। তিনি যখন মারা গেলেন তখন হঠাৎ আমি যেন নিরর্থক হয়ে গেলুম, জীবনের সমস্ত আস্বাদটুকুই চ'লে গেল। ভয় হোলো যে আমার কোনো অবলম্বন নেই, কেমন ক'রে আমি বাঁচবো? আমি জানতুম যে পরের সেবাতে একরকম সুখ আছে, তাতে জীবনের একটা আস্বাদ পাওয়া যায়। যতদিন স্বামী ছিলেন ততদিন ইচ্ছা থাকলেও এটা করতে পাইনি। তাঁর মৃত্যুর পর এখন আমি সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করলাম। এতে এখন আমি একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। পরের সেবা করা আমার একটা জন্মগত স্বভাব, ওতেই আমার মন ভালো থাকে। আমার মনে হয় পরের সেবা করবার জন্তেই আমার জন্ম হয়েছিল। এতদিন তাই থেকেই আমি বঞ্চিত ছিলুম। যাই হোক, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ আমার স্বামীর কাছে হ'তে পারেনি, আমার চরিত্র ভালো ক'রে খুলতে পায়নি। ভালোবাসার ফুলের মালা গলায় পরতে খুবই চমৎকার, কিন্তু সে মালা যখন অধিকারের লোহার শৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে তখন তার ভার অন্য রকম হ'য়ে যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা আমি বুঝেছি।"

আমি বললাম—"তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে কথা বললে, আমার সম্বন্ধেও যে সেই কথাই খাটবে, এ ভয় তুমি করছো কেন? আমি তো কোনো বন্ধনেই তোমাকে বাঁধতে চাইনি।"

আইরিণ বললে—"যদিও আমি আপনাকে অত্যন্তই ভালোবাসি, তবু আপনাদের পুরুষ জাতকে আমি চিনেছি, সেইজন্যেই এত কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তারপর আরো শুনুন, বাকি অভিজ্ঞতার কথা এখনো আমার সব বলা হয়নি। জীবনে আমার একটা স্নেহের অবলম্বন চাই, নইলে বাঁচতে পারি না। অনেক বন্ধুই আমি পেয়েছি, কিন্তু তেমন বন্ধু একজনও পাইনি যার ওপর একান্ত নির্ভর করা চলে। যাকেই দেখি তাকেই প্রথমে মনে হয় খুব ভালো, কিন্তু পরীক্ষা করতে গেলে একজনও টেঁকে না, স্বার্থটা যে কোথায় সেটা বেরিয়ে পড়ে। প্রথম থেকেই তা'রা ভারী মিষ্টি কথা বলতে সুরু করে তাই আমার আর বুঝতে বিলম্ব হয় না যে এত ঘনিষ্ঠতার কারণ কী। ডক্টর গাঙুলি আমার প্রকৃত বন্ধু বটে, কিন্তু সে তেমন বন্ধু নয় যাতে আমার মন ভরে। এতদিন পরে কেবল এই আপনাকে পেয়েই আমার মন ভ'রে উঠেছে, সেকথা বলতে আর কোনো বাধা নেই। কেন তা জানেন? আপনি আমাকে মুগ্ধ করবার কোনো চেষ্টা করেন নি আমি আপনিই মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে কখনই একটাও মিষ্টি কথা বলেন নি। যতদিন পেরেছেন, প্রাণপণে আমাকে অস্বীকার করেছেন। যখন দেখলেন যে ভালোবাসাটা সত্যই, তখন সেটা স্বীকার ক'রে নিলেন। আপনার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। আপনার স্নেহ পেয়ে আমি এতদিনে মনের তৃপ্তি পেয়েছি। সেইজন্যেই বলছি, আমার এই তৃপ্তিটুকু ভেঙে দেবেন না, এটুকু থাকতে দিন। আমার সব কিছুই আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু নিতান্ত দখল করবেন না, এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।"

আমি বললাম—"যে দুর্বলতা আমার একবার মাত্র প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এবার থেকে যেমন ব্যবহার তুমি চাও তেমনই পাবে। অধিকার করতে আমি কোনো দিনই চাই না।"

আইরিণ বললে—"তবুও আপনি রাগ করছেন? আমার বুঝি কোনো রকম ইচ্ছা হচ্ছে না? ইচ্ছা হয় না বুঝি, যে আমিও ঐ বুকের মধ্যে মাথাটা রেখে একটু আরাম পাই? দেখুন, যতদিন আমাদের মাঝে অন্তরাল ছিল, ততদিন একবারও ভাবিনি যে এ অন্তরাল কখনো ভাঙবে। অনেকদিন থেকে আপনাকে দেখছি, জানতুম যে আপনার কোনো আকাঙ্খা নেই, এ অন্তরাল যে আপনিই ভেঙে দেবেন এতটা পর্যন্ত আমি কোনো দিন কল্পনাই করিনি। দেখা যাচ্ছে যে এটা অনিবার্য, ভালো-বাসলে অন্তরাল একদিন ভাঙতেই হবে। কিন্তু দেখুন আমরা আর ছেলেমানুষ নই, দুজনেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা জানি, বাঁধটা যতক্ষণ টিঁকে আছে ততক্ষণ ওপারে বন্যা এলেও এপারের জমিতে জল ঢুকবে না। কিন্তু বাঁধে একবার একটু ফাটল ধরলেই আর রক্ষা নেই, তখন এপার-ওপার সমস্ত প্লাবন হ'য়ে যাবে। যা আমরা মুখে কখনো উচ্চারণ করি না, কল্পনা করতেও যা সাহস করি না, সুযোগ পেলে তাই আমরা মনে মনে বেশি ক'রে ভাবি তাই আমরা পাবার আগ্রহ করি। কোন্ কামনা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় সে কথা চেপে রেখে কোনো লাভ নেই, স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো। দেখুন, কলের দেশে আমার জন্ম, কলের মতোই আমার শিক্ষা দীক্ষা, তবু আমি কল হ'য়ে যেতে পারিনি, রক্তমাংসের মানুষই আছি।"

আমি বললাম—"আমার দিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। একবার যা ঘটলো, বারবার তা ঘটবে না। তুমি যাকে অধিকার বলছো তা আমি চাই না। সেদিক থেকে তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।"

আইরিণ বললে—"তাই বলুন ডক্টর মুখার্জি, আমরা দুজনে সেই

প্রতিজ্ঞাই করি আসুন। ভালোবাসাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু তাকে অধিকার পেতে দিলেই অনিষ্ট আসে, অমঙ্গল আসে। আমরা চাই মনের সম্মিলন, কিন্তু কেউ কাউকে বিপদে ফেলবো কেন? প্রেমের অনিবার্য দিকটা আমরা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছি, কিন্তু খুশি মনেই ওটা আমরা আমাদের সম্বন্ধের ভিতর থেকে বাদ দিয়ে রাখলুম। সকলেই যে ভুল করে, আমরা সেটা করবো না। আমরা দুজনেই দুজনকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, অথচ কারো কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা রইলো না। আমাদের লুকোবার কিছুই নেই, অদেয়ও কিছু নেই, সেই জন্যে আমাদের প্রাপ্তির প্রয়োজনও কিছু নেই। কিন্তু আপনি বোধ হয় রাগ করচেন?"

—"না না, রাগ করবো কেন, তুমি অন্যায় তো কিছু বলোনি, ঠিক কথাই বলছো। আমাকে ঠিক সময়ে তুমি সাবধান ক'রে দিয়েছো।"

—"আরো একটা কথা ভেবে দেখুন, আমার দিক থেকে কোনো বাধা না থাকলেও আপনার দিক থেকে অনেক বাধা আছে। আপনার ঘরে স্ত্রী আছে। আপনি আদর্শ-প্রিয় মানুষ, আপনার মনে অনেক রকমের গ্লানি আসতে পারে। যেখানে গ্লানি আসে সেখানে ভালোবাসার মাধুর্য নষ্ট হ'য়ে যায়। আমরা সে দিক দিয়েই যেতে চাই না। আমাদের ভালোবাসায় কোনো কলঙ্ক থাকবে না, কোনো স্বার্থ থাকবে না, আমাদের ভালোবাসা হবে অক্ষয়।"

৩২

যখন বাসায় ফিরলাম তখন অনেক রাত্রি হয়েছে। পাঞ্চালী যদি তখন জেগে থাকতো তাহ'লে তাকে কী বলতাম? সবটাই বলতাম না

সবটাই লুকোতাম, না খানিকটা বলতাম আর খানিকটা লুকোতাম? তা জানি না। বাসায় গিয়ে দেখি পাঞ্চালী ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত হ'য়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। খাওয়াও হোলো না, ঘুমও হোলো না।

তখনকার আমার মনস্তত্ত্বটা লেখা বড় কঠিন। প্রথমে হোলো লজ্জা, তারপর অভিমান, তারপর রাগ, তারপর অনুরাগ,—কোনো সেন্টিমেন্টই বাদ যায় নি। শেষকালে অনুরাগই জয়ী হোলো। এই এক আশ্চর্য কথা, যেখানে অনুরাগ জাগে সেখানে কোনো কিছুতেই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আমার মনের মধ্যে যা হ'য়ে রইলো সে এক জটিল ব্যাপার, আত্মাভিমানের সঙ্গে অনুরাগ মেশানো। আত্মাভিমানটা ক্ষণে ক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু অনুরাগ ভিতরে ভিতরে আপন কাজ করতে থাকে।

আরো এক আশ্চর্য কথা, আমার মনে কিছু গ্লানি আসে নি। একবারও মনে হয় নি যে পাঞ্চালীর প্রতি কিছু অন্যায় কিংবা বিশ্বাস-ঘাতকতা হয়েছে। পূর্বে আমার যা ধারণা ছিল সব এখন উল্টেপাল্টে গেল। আগে আমার ধারণা ছিল যে মনের রাজ্যে একজনের বেশি দুজনের স্থান হয় না, যারা স্থান দেয় তারা বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এখন দেখলাম, পাঞ্চালীর রাজ্যের সীমানার বাইরেও অনেক পতিত জমি ছিল, আইরিণের জন্য সেখানে নূতন রাজ্যের স্থাপনা হয়েছে। পাঞ্চালী যেখানে দখল নিতে কোনো চেষ্টা করে নি, আইরিণ সেখানে দখল নিয়ে বসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সে স্থান নিতান্ত অল্প নয়, অনেকখানি তার বিস্তৃতি।

কিন্তু আত্মাভিমানের বহির্বেগ বড় প্রবল। একটা কথা আমার মনে থেকে থেকে বিঁধতে থাকে, আইরিণ বুঝি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যাখ্যান করবার কথা আমারই, চিরদিন আমি তাই ক'রে এসেছি, একবার মাত্র একটা দুর্বল মুহূর্ত এসেছিল, এই বুঝি তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ? আইরিণ আমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই, তাতে কোনো

সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ভালোবাসা আমার স্পর্শটুকু বাঁচিয়ে। বেশ তাই ভালো, অস্পর্শিত ভালোবাসা আমিও তো চাই। তাই ভালো, স্পর্শ বাঁচিয়েই আমি চলবো। মনের গতিকে ফেরাবার কোনো উপায় নেই, তবে ওটুকু আমি পারবো।

কিন্তু অভিমান যতই হোক, আইরিণের প্রতি শ্রদ্ধা আর অনুরাগ আমার বেড়েই চললো। সেই রাত্রের পর দিনকয়েক যা ঘটলো তাকে ঘটনা বলা যায় না, সে উন্মাদনা। স্বপ্নের মধ্যেই আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতুম, পাঞ্চালীকে দেখে মনে হোতো আইরিণ, পাঞ্চালীর সঙ্গে কথা বলতে মনে হোতো আইরিণের সঙ্গে কথা বলছি। আবার আইরিণকে দেখে ভাবতাম, এই কি সেই আইরিণ?

মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতাম। তখন ভাবতাম, সন্দেহই তবে সত্যে পরিণত হোলো? লোকেরা যা বলে তা বুঝি মিথ্যা নয়? আগুনের কাছে ঘি থাকলেই বুঝি একদিন গলবে?

আইরিণের প্রতি আমার এমন অনুরাগ কেন হয়? এর একটা সদুত্তর খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি। ভেবে ভেবে কল্পনা করি যে ও একজন সাধারণ নার্স মাত্র নয়, ও হোলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতীক। আমি ডাক্তার, তাই ও আমার সহকারিণী নার্স। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মন্দিরে দুজন পূজারীর প্রয়োজন,—একজন করবে চিকিৎসা, একজন করবে সেবা,—একজন দেবে ঔষধ, একজন দেবে পথ্য। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, তবেই পূজা সম্পূর্ণ হবে। বিধাতাই সেইজন্য ওকে নার্স ক'রে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। এমন আশ্চর্য যোগাযোগ বিধাতা ভিন্ন অপর কেউ ঘটাতে পারে না। এই যোগাযোগ অপার্থিব, সেইজন্যে পার্থিব সম্পর্ক কিছু আমাদের ঘটলো না। আমাদের সম্পর্ক নতুন ধরণের।

তখন যা কিছু ভেবেছি, কোনোটাই সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নয়। কেবল নানারকম স্বপ্ন দেখে গেছি। আবোলতাবোল স্বপ্ন, লিখতেও লজ্জা হবার মতো।

আইরিণও স্বপ্ন কম দেখে নি। একদিন সে আমাকে ধ'রে বসলো—"একখানা লটারির টিকিট কিনুন।"

—"কেন, লটারির টিকিট কিনবো কেন?"

—"আমিও একখানা কিনেছি, আপনিও একখানা কিনবেন। দুজনেরই কেনা রইলো, ফার্স্ট প্রাইজ চার লাখ টাকা। হয় আপনিই পান কিংবা আমিই পাই, একই কথা।"

—"তা কেমন ক'রে হয়? আমি পেলে সে আমারই অধিকারে এলো, আর তুমি পেলে গেলো তোমার অধিকারে,—এক কথা কেমন ক'রে হবে?"

—"আবার সেই অধিকারের কথা? টাকা পাবার উদ্দেশ্য যদি দুজনেরই এক হয়, তবে যে-ই টাকাটা পা'ক, সে একই কথা নয়?"

—"উদ্দেশ্য যে কী তাই তো আমি জানি না।"

—"থামুন থামুন বলছি, আগে টিকি[illegible] তো কিনে ফেলুন। নম্-ডি-প্লু ম কী লিখবেন? লিখুন,—নার্স। আমি [illegible] লিখেছি জানেন? ডক্টর। বুঝলেন?"

যা বললে তাই করলাম।

ও তখন বললে—"এর মানে কী বুঝেছেন [illegible] আমি যদি পাই, সেটা আপনার জন্য। আর আপনি যদি পান, সেটা আমার জন্য। অর্থাৎ যে-ই পা'ক, দুজনেরই কাজে লাগবে।"

—"কোন কাজে লাগবে তাই তো এখনো বুঝতে পারছি না।"

—"কেন পারছেন না? অতো টাকা পেলে আর আমাদের ভাবনা কী? আপনিও আপনার সংসারের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলবেন, আমিও

আমার ছেলের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলবো, তারপর সব ছেড়ে দুজনে মিলে চ'লে যাবো সুইজারল্যাণ্ডে।"

—"সেখানে গিয়ে কী হবে?"

—"একসঙ্গে দুজনে থাকবো। আপনিও খুব বেশি ক'রে ডাক্তারি শিখবেন, আমিও খুব বেশি ক'রে নার্সিং শিখবো। তারপর দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজে লেগে যাবো। আপনি যেখানে চিকিৎসা করবেন, আমি সেখানে নার্সিং করবো। যত রোগী আসবে আমাদের হাতে, একসঙ্গে আরাম ক'রে তুলবো। যেখানে আপনি ডাক্তার, সেইখানেই আমি নার্স। চিকিৎসাজগতে এক নতুন রকমের জিনিষ।"

—"তুমি বুঝি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে যেতে বলছো? তা তো আমি পারবো না!"

—"আঃ, ত্যাগ কেন করতে যাবেন, ভারী বুদ্ধির কথাই বললেন! আমিই কি আমার ছেলেকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো? দুজনেই মাঝে মাঝে এরোপ্লেনে চ'ড়ে এখানে বেড়াতে আসবো, ওদের দেখাশোনা ক'রে ফিরে যাবো। সবই ঠিক বজায় থাকবে। পৃথিবীতে আমাদের আসল পরিচয়টা কী? আপনি হচ্ছেন ডাক্তার, আর আমি হচ্ছি আপনার নার্স। এ ছাড়া আর যা কিছু পরিচয় সেগুলো থাক না, তাতে আর ক্ষতি কী আছে? আমরা আমাদের কাজ ক'রে যাবো, বাকি সব দিক বজায় রেখে।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। আইরিণও ঠিক একই রকমের স্বপ্ন দেখেছে। কল্পনাতেও আমাদের মিল, স্বপ্নেও আমাদের মিল?

আবার একদিন আইরিণ বললে—"জানেন ডক্টর মুখার্জি? কাল রাত্রে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন একটা বাড়িতে রয়েছি, সেখানে আমার স্বামী আছেন, বাবা আছেন, মা আছেন, সকলেই আছে। আমার সেখানে যেন একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়েটাকে একদিন কোলে

নিয়ে খুব আদর করছি, এমন সময় আপনি আমাকে টেলিফোনে ডেকে বললেন,—আমি এখনই সুইজারল্যাণ্ড চ'লে যাচ্ছি, তুমি যদি যেতে চাও তো এখনই চ'লে এসো স্টেশনে। মেয়েটাকে তখনই বাড়ির লোকদের কাছে দিয়ে বললাম,—তোমরা ওকে একটু রাখো, সময়মত খেতে দিও, আমি চললাম। সবাই বললে—শোন শোন, কোথায় যাবি? কারো কথায় কান না দিয়ে আমি একেবারে ছুট। ওরা আমার পিছু নিলে। আমি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে হাজির। ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে, আপনি মুখ বাড়িয়ে একটা জানলা থেকে দেখচেন। আমাকে দেখেই আপনি তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে নিলেন। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, ওরা আসছে, এখনই আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে। আপনি তখন আমাকে বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে অনেক সুটকেস দিয়ে আড়াল ক'রে দিলেন। বাড়ির লোকেরা এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে, ট্রেণের ভিতর ঢুকে চারদিক খুঁজলে, কিন্তু আমাকে কোথাও দেখতে পেলে না। ইতিমধ্যে ট্রেণটা দিল ছেড়ে। তখন কী মজা!"

আইরিণও স্বপ্ন দেখে, আমিও দেখি। আইরিণ সব বলে, আমি কিন্তু কিছু বলি না। আইরিণের স্বপ্ন শুনতে আমার ভালো লাগে, ওর সেই চোখের দিকে চাইতে ভালো লাগে, ও কাছে এলেই আমার ভালো লাগে,—কিন্তু কোনো কথাই আমি জানাই না। চুপ ক'রে কেবল শুনে যাই এবং চেয়ে থাকি, যেন আমি নির্লিপ্ত।

৩৩

বিশ্ব জুড়ে চলেছে কর্মরত মানুষের বিরাট শোভাযাত্রা। সারে সারে মানুষ চলেছে মিছিল ক'রে, বেজায় তার ভিড়, বিষম কোলাহল। পাঁচ-মিশালি ঐক্যতানের সুরে পা ফেলে তা'রা ক্রমাগতই চলেছে, ক্রমাগতই

চলেছে। ডঙ্কা বাজে মরণের, তারই সঙ্গে মোহন সুরে বাঁশি বাজে জীবনের, আশা উদ্দীপনার তালে তালে বেজে চলে কালের করতালি, তারই সঙ্গে পা ফেলে মানুষ ক্রমাগতই চলেছে, চলেছে। মাঝে মাঝে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উড়ছে দেখা যায় প্রেমের পিঙ্গলবর্ণ জয়পতাকা, কিন্তু ঐগুলোই মিছিল-যাত্রার নিশানা, তাকে নিয়ে বিশ্লেষণের অবসর কোথায়? ভিড় ক'রে পথ চলাই আমাদের কাজ ;—যেতে যেতে কারো সঙ্গে আলাপ হোলো, কিংবা পাশের মানুষটির সঙ্গে মনের মিল হোলে, এগুলো পথচলার আনুষঙ্গিক আছেই। আমরা বুঝতে পারি না, তাই ভেবে মরি।

পাঞ্চালীর প্রতি এখন আমার অত্যন্ত মনোযোগ। ওর কাছে এমন একটি কথা আমি গোপন ক'রে রেখেছি, যা কখনই ওকে বলতে পারবো না। পাঞ্চালীর মন যদি উদার হোতো তাহ'লে হয় তো বলতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব না হ'লেও ওকে স্নেহদান করতে যেন আমি বিমুখ না হই, ওর প্রতি কর্তব্যের যেন ত্রুটি না হয়। সুতরাং ওকে আমি অতিরিক্ত আদর আপ্যায়িত করতাম, আর নিজেকে প্রতি পদে বিচার ক'রে দেখতাম। কিন্তু সেখানেও ছিল বাধা। পাঞ্চালীকে যদি আমি বেশি যত্ন করি, বেশি কথা বলি, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাই, তবুও সে হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায়, মনে মনে যেন কী সন্দেহ করে। আমি দেখতে পাই, হাসতে হাসতে পাঞ্চালী কঠিন হ'য়ে গেল।

আমার মনে কোনো অপরাধ নেই, তবু পাঞ্চালীর কাছে আমাকে অপরাধী হ'তেই হয়। মিথ্যা বলবার কোনোই প্রয়োজন নেই, তবু পাঞ্চালীর কাছে আমাকে মিথ্যা বলতেই হয়। অল্প যেটুকু লুকোবার জিনিষ, তার চেয়ে অনেক বেশি লুকোতে গিয়ে আমাকে অনর্থক বিব্রত হ'য়ে পড়তে হয়। ওকে আমি স্নেহ করি, ওর প্রতি মায়া হয়, সকল দিক দিয়ে ওর প্রতি আঘাত বাঁচিয়ে চলতে যাই।

সে দিন সামান্য জিনিষ নিয়ে এক বিশ্রী কাণ্ড হোলো।

গিয়ে পাঞ্চালীর দিকে চেয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আইরিণ আর পাঞ্চালীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই! হাত দুখানি তেমনি শরীরের দুপাশে এলায়িত, নিস্পন্দ, একটিমাত্র স্পর্শের আশায় উন্মুখ হ'য়ে আছে, স্পর্শ পেলেই এখনই চঞ্চল হ'য়ে সচেতন হ'য়ে উঠবে। মুখখানি তেমনি প্রশান্ত, নিরীহ, অসহায়। বুকের বোতাম কয়েকটা খোলা, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে স্ফীতবক্ষ তেমনি স্পন্দিত হচ্ছে দেখা যায়, তেমনি প্রভাম্বিত, তেমনি অপরূপ! ঘুমন্ত অবস্থায় আইরিণের সঙ্গে পাঞ্চালীর কোনোই পার্থক্য নেই, জাগ্রতেই যত পার্থক্য! নারী মূলতঃ সকলেই সমান, কেবল পারিপার্শ্বিকেই ওদের মধ্যে যতকিছু প্রভেদ ঘটায়? ভাগ্যের অবস্থা অনুসারেই কেউ হ'য়ে যায় বৌদিদি, কেউ হ'য়ে যায় পাঞ্চালী, আর কেউ হ'য়ে যায় আইরিণ? তাই হবে, তাই হবে। তবে আর জাগন্তে কাজ নেই, ঘুমন্তই ভালো। আমি ধীরে ধীরে ঘুমন্ত পাঞ্চালীর বুকের কাছে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখি ঝমঝম্ ক'রে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, খোলা জানালা দিয়ে বাদলা হাওয়ার সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। পাঞ্চালীর বুকের কাছে মাথাটা আমার তেমনই রয়েছে, মাথাটাকে সে এক হাতে আবেষ্টন ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সম্ভবত ওর শীত করছে। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডেকে বললাম—"শীত করছে বুঝি তোমার? চাদর ঢাকা দিয়ে দেবো?"

ঘুম ভেঙে পাঞ্চালী উঠে বসলো। চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে। তারপর কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একটু তকাতে স'রে গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো, কোনো কথা বললে না।

ঘুমন্ত পাঞ্চালী আর জাগ্রত পাঞ্চালী,—অনেক তফাৎ।

এর কিছুদিন পরে দাদা এলো পাঞ্চালীকে নিয়ে যেতে। বৌদিদি আসন্নপ্রসবা, পাঞ্চালীকে সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে।

এতে পাঞ্চালীও কোনো আপত্তি করলে না, আমিও করলাম না।

৩৪

ক্রমশ আমি যেন কেমন অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। বাসায় একা একা থাকি, কোনো দিন খাই, কোনো দিন বা কিছু খাই না। রাত্রে অনিদ্রা হয়, কোনো কোনো দিন সমস্ত রাতই জেগে থাকি। কী আর করবো, কেবল বই পড়ি।

আইরিণের সঙ্গে দেখা হ'লে যেন খানিকটা তৃপ্তি পাই, কিন্তু সে কতটুকু বা সময়?

কাজেও আমার ত্রুটি হ'তে লাগলো। সকল কাজে তেমন নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগ করতে পারি না, অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই, অনেক সময় অনেক কাজ করতে ভুলে যাই। ভুল দেখে সার্জন বনারজি আমার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকেন, সচকিত হ'য়ে উঠে আমি আমার ভুল সংশোধন ক'রে নিই। থেকে থেকে আমার বিরক্তি হয়, রাগ হয়।

সময়ে অসময়ে আবোল তাবোল নানা রকমের কথা ভাবতে থাকি। হঠাৎ মনে পড়ে যায় আমাদের কালীচরণকে, সেই যে একজন মানুষের মধ্যে ছিল দুজন কালীচরণ। একজন রসও খায় না আর নারীও চায় না, আর অন্য একজন রসও খায় এবং নারীও চায়।

বৌদিদির একটি মেয়ে হয়েছে। শুনলাম অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে, দাদার অনুরোধে একদিন তাকে দেখতে গেলাম। জ্বর তেমন কিছুই নয়, তবে বৌদিদি একটু রোগা হ'য়ে গেছে। সেই কথাই তাকে বললাম—"তুমি একটু রোগা হ'য়ে গেছ দেখছি। ভালো ক'রে খাওয়া দাওয়া করো, তাহ'লেই সব সেরে যাবে।"

বৌদিদি বললে—"তুমিও তো রোগা হ'য়ে গেছ দেখছি। তোমার খাওয়াদাওয়ার বুঝি কোনো যত্ন হয় না?"

—"আমার কথা থাক, এখন নিজের কথা ভাবো।"

—"সেদিন কী বলেছিলাম, তাই বুঝি রাগ করেছো ভাই ঠাকুরপো? আমরা হলাম মেয়েমানুষ ঝোঁকের মাথায় যা খুশি তাই ব'লে ফেলি, সে কথা কি ধরতে হয়? ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে কত রকমের কড়া কথা শুনতে হয় জানো তো?"

এ কথার কী জবাব দেবো, আমি চুপ করেই থাকলাম।

—"সে হবে না, বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো। চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, বলতেই হবে।"

তাই বললাম। ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি ছিল না।

একদিন আইরিণও আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করলে। সে বললে—"আপনি দিন দিন অমন ক্লিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছেন কেন ডক্টর মুখার্জি? চোখ দুটো যেন ছোটো হ'য়ে গেছে। রাত্রে ঘুমোন না বুঝি?"

আমি বললাম—"ও কিছু নয়।"

আইরিণ বললে—"আমার কাছে লুকোবেন না, আমি জানি আপনার কী হয়েছে। আগের থেকেই জানতাম। চলুন একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।"

বেড়াতে গিয়ে সব কথাই তাকে বললাম। বলবার বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার কাজ করতে ভালো লাগছে না, খেতে ভালো লাগছে না, ঘুমোতে ভালো লাগছে না। চারিদিক থেকেই যেন কী একটা বাধা পাচ্ছি, জীবনের কোনো কিছুকেই স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারছি না। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

আইরিণ বললে—"বাধা আপনি কোথাও পান নি, বাধা পাচ্ছেন নিজের সংস্কারে। কিন্তু ওরকম চলবে না, সত্যকে গ্রহণ করতে হ'লে

অনেক সংস্কার আপনাকে ছাড়তে হবে। নিজের মনকে শক্ত করলেই দেখবেন বাধা কোথাও নেই। অপরাধ আপনি কিছুই করেন নি। খানিকটা সত্য মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন, এই তো কথা? কিন্তু সমাজে বাস ক'রে সব সত্য জানানো যায় না। কী আর করা যাবে বলুন, সমাজ এখনো ঐ রকম ভাবেই চলছে। যতদিন এমন সমাজ থাকবে ততদিন ব্যক্তিগত মানুষকে কতক লুকিয়ে রেখে কাজ চালাতে হবে। সত্যকে সহ্য করবার উপযুক্ত হ'য়ে সমাজ যখন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক আদর্শ নেবে তখন আপনিও আপনার সত্য বলবেন, আমিও আমার সত্য বলবো। আপনি তো জানেন, আমি আমার ভিতরকার কথা কাউকে বলি না আমার স্বামীকেও বলতুম না। লুকোবার যা আছে তা অবশ্য লুকোবেন এবং নিশ্চিন্তভাবেই লুকোবেন, তার জন্য ক্ষুণ্ণ হবেন কেন? পাছে সংস্কারে লাগে, সেই ভয়ে সত্যকে আপনি নিবৃত্ত করতে পারেন না। তা করতে গেলেই হবে নিউর্যাস্থিনিয়া, আপনার যা হয়েছে। মস্তিষ্কের নার্ভগুলো অতি মূল্যবান জিনিষ, তাকে অমন ক'রে নষ্ট করবেন না। বেশি মাত্রায় দিনকতক ব্রোমাইড খান দেখি? কারো নার্ভাসনেস দেখলে আপনিই তো বলেন ব্রোমাইড খেতে!"

আইরিণের কথায় আমি ব্রোমাইড খেতে লাগলাম। শরীরটা কিছু সুস্থ হোলো।

ঠিকই বলেছে আইরিণ। নার্ভাস সিস্টেমের মতো অমন বিগড়ে যাবার জিনিষ শরীরে আর কিছু নেই। শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো কিছু ব্যতিক্রম হ'লে ঐগুলোই আগে বিকল হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলে এই দেখা যায় যে শরীরের সমস্তই ঠিক আছে, অথচ নার্ভ বিগড়েছে ব'লে সমস্তই যেন বিগড়ে গেছে। নার্ভগুলোকে যদি মজবুত রাখতে পারতাম, তাহ'লে আমাদের অনেক সমস্যা ঐখানেই মিটে যেতো। কিন্তু তা যে রাখতে পারি না, সে নার্ভের দোষে নয়, আমাদের নিজেদেরই

বোধে। আমরা যাকে বলি শিক্ষা, তাই আমাদের নার্ভকে জখম ক'রে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ স্নায়ু স্বাভাবিক আনন্দানুভূতির জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা কেবল অস্বাভাবিক দুঃখানুভূতিতেই নিযুক্ত রাখি। ক্রমাগত বাধানিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী দিয়ে আর কৃত্রিম জিনিষ দিয়ে আমরা নার্ভগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছি। সব হ'য়ে গেছে অস্বাভাবিক, অথচ তাকেই মনে করি স্বাভাবিক। আনন্দ পেতেও আমরা ভয় পাই, ভয় পেতেই আমরা অভ্যস্ত। কেউ আনন্দ পাচ্ছে দেখলেই আমাদের বিকৃত মন ব'লে ওঠে ও ভালো নয়, ও অন্যায়। আমরা আনন্দ পাওয়া দেখতে ভয় পাই। চারিদিকে উদ্যত হ'য়ে আছে নিষেধের আইন, সমস্তকে বাঁচিয়ে রেখে যদি নিজেকে গোঁজামিল দিতে থাকো, লোকে বলবে বেশ আছো। কিন্তু তোমার হবে নিউর‍্যাসথিনিয়া। খোঁজ করলেই দেখতে পাবে, যারা সচ্চরিত্র, শিষ্ট, শিক্ষিত, সভ্য, সদাচারী,—তা'রা অধিকাংশই নিউর‍্যাসথিনিয়াতে ভুগছে। জীবনযুদ্ধে তা'রা হয়তো সফল, কিন্তু নিজের জীবনকে তা'রা জখম করেছে। তা'রা মোটরগাড়ি চড়ে কিন্তু আরাম পায় না, অট্টালিকায় বাস করে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য পায় না, সুন্দরী স্ত্রীর সেবা পায় কিন্তু সুখ পায় না, সুখাদ্য খায় কিন্তু তৃপ্তি পায় না। কুলি-মজুর সাঁওতাল-ফেরিওয়ালাদের এরা মনে মনে হিংসা করে। সম্পদের বিনিময়ে এরা সাঁওতালের নার্ভ কামনা করে। সম্পদ রয়েছে, অথচ তাকে সম্ভোগ করবার নার্ভ নেই, এর চেয়ে মর্মান্তিক নির্যাতন আর কী কল্পনা করতে পারো? মানুষকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তাদের নার্ভগুলোকে আগে বাঁচাও, কৃত্রিম জিনিষের খোরাক দিয়ে সেগুলোকে নষ্ট কোরো না। ম্যালেরিয়া হ'লে তার চিকিৎসা আছে, যক্ষ্মারোগ হলেও তার চিকিৎসা করা যায়, কিন্তু বিগ্‌ড়ে যাওয়া নার্ভের কোনো চিকিৎসা নেই।

আমি সঙ্কল্প করলাম, আত্মনির্যাতন আর কিছুতেই হ'তে দেবো না। এর একটা বিহিত করতে হবে। মনের সত্য আমার মনের কাছেই থাক, কিন্তু ভেবে দেখলুম, জটিলতা দূর করতে হ'লে আইরিণের সংস্রব ছেড়ে আমার নিজেরই দূরে চ'লে যাওয়া দরকার। ঘিকে যদি গলতে দিতে না চাই, তাহ'লে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা দরকার। অন্তত যতটা দূরে রাখা যায় ততটাই ভালো। এতে হয়তো আমার খানিকটা কষ্ট হবে, কিন্তু নির্যাতন দিয়েই নির্যাতন দমন করতে হয়। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

একদিন আইরিণকে এই কথাই স্পষ্ট বললাম।

সে বললে—"নিশ্চয়। যা ভালো মনে করবেন নিশ্চয় তাই করবেন। আপনাকে বাঁচতে হবে, কাজ করতে হবে, আমার তাতে বাধা না দিয়ে সাহায্যই করা উচিত। আমিও নিজেকে যতটা সম্ভব তফাতে রাখবো। মাঝে মাঝে দেখা পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যা দেবার, তা যথেষ্টই আমার দেওয়া হয়ে গেছে,—যা পাবার ছিল, সবটুকুই আমি পেয়ে গেছি। আমি আপনার কাছে আনন্দের সন্ধান পেয়েছি, তাই ব'লে আরো স্বার্থপরের মতো বাধ্যতার বন্ধনে আপনাকে বাঁধবো? আপনার যাতে কোনো অনিষ্ট না হয় সেইটাই আমার আগে দেখা দরকার।"

আমি বললাম—"সব তুমি পেয়েছো? এতই নিশ্চিন্ত?"

আইরিণ বললে—"নিশ্চয়। যা চিরকাল চেয়েছিলাম, যা কখনো পাই নি, তারই সন্ধান আমি পেয়েছি। আর আমার চাই কি? আপনাকে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমি জানি, এ জিনিষ একবার পাওয়া গেলে আর কখনো হারায় না, কিছুতেই না। কেন আমি আর আপনাকে নিজের চোখে চোখে রাখতে চাইবো? চব্বিশ ঘণ্টাই আপনি

আমার মনের মধ্যে রয়েছেন, দেখতে না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। আপনাকে খুঁজে পেয়ে আমি নিজেকেও খুঁজে পেয়েছি, আমার পাওয়া ঢের হ'য়ে গেছে।"

আইরিণের কথাগুলো শুনে মনে আনন্দ হোলো। ঐরকম কথা আমিও বলতে চাই, পারি না। মেয়েরা বোধ হয় একটু অবাস্তব, আমরাই একটু বেশি রকমের বাস্তব।

চারিদিক ভেবেচিন্তে দেখলুম। মনে করলুম, চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করি। হাঁসপাতালের সংশ্রব ছেড়েই চ'লে যাই। কিন্তু কোথায় প্র্যাকটিস করবো? কলকাতা শহরে? অসম্ভব ব্যাপার। যদি বিলাত-ফেরত ডাক্তার হতাম, তাহ'লে বরং চেষ্টা করা যেতো। যারা বিলাত-ফেরত, তাঁরাও এখানে পাত্তা পায় না। এখানে প্র্যাকটিস জমাতে হ'লে অন্তত পাঁচ বছরের খোরাক নিয়ে বসা চাই, নিজের একটা ডিসপেনসারি থাকা চাই, মোটরগাড়ি থাকা চাই, বহুলোকের সঙ্গে আলাপ এবং আত্মীয়তা থাকা চাই, বহুলোকের বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখবার ধৈর্য থাকা চাই, সামান্য রোগকে মারাত্মক বলবার এবং মারাত্মক রোগকে সামান্য বলবার কৌশল জানা চাই, মুখ মিষ্টি থাকা চাই, এবং আরো অনেক রকমের বিদ্যা থাকা চাই। তার পরে যা উপার্জন হবে, হয় তো গাড়ি আর বেশভূষাতেই সব ফুরিয়ে যাবে, খাবার কিছু থাকবে না। সাধারণ ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসা এখানে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নয়, ব্যবসাদারী। সে ব্যবসা শিখতে আমার অনেক সময় লাগবে। কয়েকজন বন্ধুকে দেখেছি, ছাত্রাবস্থায় তা'রা নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু প্র্যাকটিসে উন্নতি করেছে। লোককে তা'রা খুশি করতে জানে, পয়সা উপায় করতে জানে। আমি তা জানি না।

মফঃস্বলে কিংবা পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিস করা আরো বিড়ম্বনা। আমার এক সহপাঠী বন্ধু মফঃস্বলে ডাক্তারি করে, প্রায়ই হাঁসপাতালে রোগী নিয়ে

আগে। চেহারাটা তার হ'য়ে গেছে বিশ্রী, ম্যালেরিয়াতে ভোগে। কোটপ্যাণ্ট পরে এমন ভাবে যে দেখলেই হাসি পায়, নেকটাই কখনো সোজা ক'রে বাঁধে না অথচ বাঁধা চাই, ঠোঁট দুটো রাঙা ক'রে পানদোক্তা খায়, কানে গোঁজা থাকে একটা দাঁত খোঁটবার কাঠি, ষ্টেথোস্কোপের নল দুটো পাশের পকেট থেকে অনেকখানি ঝুলতে থাকে। একদিন তাকে বললাম—"দেখ ভাই, পকেটের নল দুটো ঢুকিয়ে রাখ, আর সাহেব যখন সাজবি তখন পানদোক্তাগুলো খাস্‌নি। লোকে বলবে কী?" সে বললে, —"কী করবো ভাই, আমরা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার, আমাদের এই রকমই হবে। তোদের মতো ফিটফাট থাকা আমাদের চলে না। নিতান্ত কাজের গন্তিকে এইগুলো পরি, নইলে লোকে ডাকে না। সেখানে যদি তোরা প্র্যাকটিস করিস, তবে তোরাও এই রকম হ'য়ে যাবি। সাইকেল আর ঘোড়ায় চ'ড়ে ডাক্তারি করতে যেতে হয়, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম। রোদ বৃষ্টি সবই মাথার উপর দিয়ে যায়। সেখানে বাবুগিরি চলে না।"

কলকাতায় থেকে কোনো রকমের চাকরি করা আরো শোচনীয় ব্যাপার। ডাক্তারদের এক নতুন রকমের চাকরির সুযোগ আছে, বড় বড় দেশী এবং বিলাতি কম্পানির ক্যানভাসারের চাকরি, অনেকেই আজকাল করে। পুলিনবিহারীর কথা আগে বলেছি, সে এখন এই কাজ করে। চমৎকার ফিটফাট ড্রেস পরে, কোথাও কিছু খুঁৎ নেই। একদিন সে এসে আমাকে অনুরোধ করলে—"ডক্টর মুখার্জি, আমার যদি একটু উপকার করেন।" কী উপকার করতে হবে? সে বললে—"আমার এই ওষুধটা হাঁসপাতালে একবার ট্রায়াল দিন, আমি কতকগুলো নমুনা দিয়ে যাচ্ছি। ট্রায়াল দিন কিংবা নাই দিন, একটু আপনাকে লিখে দিতে হবে যে ওষুধটা ব্যবহার ক'রে আপনি ফল পেয়েছেন। নইলে আমার চাকরি থাকবে না।" কেন চাকরি থাকবে না? সে বললে—"হাঁসপাতালে ব্যবহার করা হয়েছে প্রমাণ করতে না পারলে বাইরের ডাক্তার কেউ এটা

নিতে চায় না। বন্ধুবান্ধব যার কাছে যাই, কেউ ভালো ক'রে কথা পর্যন্ত কয় না, সকলেই বিরক্ত হয়। কিন্তু ওষুধ না কাটাতে পারলে কম্পানি আমাকে রাখবে কেন? মাইনে পাই ভালো, কিন্তু অপমান যে কত গায়ে লাগে তা বলা যায় না।"

সব দিকই ভেবে দেখেছি। হাঁসপাতালের সরকারী চাকরি করা ছাড়া অন্য কোথাও চাকরি করা কিংবা প্র্যাকটিস করা আমার পোষাবে না।

আমি হাঁসপাতালেই অন্যত্র বদলি হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সুযোগ পেতে বিলম্ব হোলো না। প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে একটা জায়গা খালি হোলো, আমি চেষ্টা করবামাত্রই সেখানে বদলি হ'য়ে গেলাম। সন্তুষ্ট চিত্তে আমি নতুন কাজে লাগলাম। এ একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের কাজ, রোগীর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ নেই, মানুষের সঙ্গেই আর সংশ্রব নেই, সংশ্রব কেবল রোগবীজাণুর সঙ্গে। হাঁসপাতাল নেই, নার্স নেই, রাত্রে ডাকাডাকি নেই, কেবল টেস্ট্-টিউব আর মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে নিছক বিজ্ঞানের চর্চা।

হাঁসপাতালের কোয়ার্টার্স আমাকে ছেড়ে দিতে হোলো। কাজেই একটা ছোটো বাড়ি ভাড়া করলাম। হাঁসপাতালের সম্পর্ক ত্যাগ করেছি দেখে পাঞ্চালী খুব খুশি হোলো, নতুন উদ্যমে গৃহস্থালী পাতলে। বৌদিদিও কন্যাসমেত এসে অনেক সুব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেল।

আইরিণের সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হোতো, সব দিন নয়।

৩৬

ল্যাবরেটরির আবহাওয়া স্বতন্ত্র রকম। সেখানকার কর্মীদের কোনো আড়ম্বর নেই, কোনো বাচালতা নেই। নীরবে আসে, নিবিষ্টমনে নিজের কাজ করে, নীরবে চ'লে যায়। মারাত্মক বীজাণুদের চিড়িয়াখানা,—ইন-

কিউবেটরের মধ্যে তাদের জিয়ানো হয়, তাদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়, খরগোষ গিনিপিগ প্রভৃতি জন্তুর শরীরে তাদের প্রয়োগ ক'রে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়। অনেক রোগ-সমস্যার মীমাংসা হয় এইখানে। হাসপাতালের যাবতীয় রোগীর রক্তাদি এখানে পাঠানো হয় রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য, পরীক্ষা ক'রে ব'লে দেওয়া হয় কোন রোগের বীজাণু পাওয়া গেল, কোন জাতীয় রোগের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার উপর নির্ভর ক'রে চিকিৎসা চলে, আন্দাজে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এখানকার কর্মীরা সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিক, যা দেখে শুধু তাই বলে। এরা নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, নিছক বিজ্ঞানেরই সেবা করে।

আবহাওয়া অনুসারে মানুষের রুচি আর প্রকৃতি বদলায়। ক্রমে ক্রমে আমারও বেশভূষা বাহুল্যশূন্য হ'য়ে এলো। নেকটাই বাঁধা এক রকম ছেড়েই দিলাম, প্যাণ্ট-কোটের ভাঁজের প্রতি আর তেমন লক্ষ্য নেই, মোজাও অনেক সময় পায়ে পরি না। মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে নিজের কাজ করি, মনে মনে আত্মস্থ হ'য়ে থাকি।

এই আবহাওয়া প্রথমটায় আমার ভালো লাগে নি। যারা রোগী নিয়ে কারবার করতে অভ্যস্ত, তা'রা এই কাজে সুখ পায় না। অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার আনন্দ আলাদা, আর বীজাণুতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার আনন্দ আলাদা। সেই জন্য ডাক্তারেরা দুই দলে বিভক্ত, কাজ অনুসারে তাদের মনোবৃত্তিও স্বতন্ত্র। যারা চিকিৎসা-কর্মী তা'রা ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে অস্বস্তি বোধ করে, যারা ল্যাবরেটরি-কর্মী তা'রা রোগীর কাছে যেতে ভরসা পায় না।

জোর ক'রে বীজাণু-পরীক্ষকের কাজ বরণ ক'রে নিয়েছি, কিন্তু এ কাজ হয় তো বেশিদিন করতে পারতাম না, যদি সেখানে ডক্টর দাসগুপ্তকে না পেতাম। এই বিভাগে এসে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম যার দৃষ্টান্তে আমার মনে আবার নূতন উৎসাহ এলো, যার পদাঙ্ক অনুসরণ

করতে আমার আপনা থেকেই আগ্রহ হোলো, যার সান্নিধ্যে গিয়ে আমি রিসার্চ করবার অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করতে পারলাম। মনে মনে বললাম, ইনিই আমার গুরু। বৈজ্ঞানিক রিসার্চের মতো তন্ময় হ'য়ে থাকার আনন্দ আর কিছুতে নেই, এই আনন্দের মন্ত্র আমি এঁর কাছে পেলাম।

বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত ক'রে রাখবার উপায় কী? একমাত্র উপায় কোনো কিছু সমস্যার মধ্যে একান্তভাবে মনঃসংযোগ ক'রে লেগে যাওয়া। আমাদের ডাক্তারদের পক্ষে এর একটা সহজ রাস্তা আছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে রিসার্চের স্থান সব চেয়ে উঁচুতে। অনেক রোগের উৎপত্তির কারণ আর চিকিৎসা এখনো অজ্ঞাত। এমন অনেক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র প'ড়ে আছে যেখানে রিসার্চ ক'রেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া চলে। এই আমার জীবনের লক্ষ্য হোক।

ডক্টর দাসগুপ্তের কর্মনিষ্ঠা অসাধারণ। এঁর নাম বৈজ্ঞানিক জগতের রিসার্চমহলে বিখ্যাত। বীজাণু সম্বন্ধে ইনি অনেক রকমের নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এঁর আবিষ্কৃত বীজাণুরহস্য-ভেদের পদ্ধতিগুলি দেখাবার জন্য রকফেলার ইনস্টিট্যুট থেকে এবং ইউরোপের অনেক ল্যাবরেটরি থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল, সেখানে গিয়ে তিনি নিজের কাজ দেখিয়ে সাফল্য অর্জন ক'রে এসেছেন। হাঁসপাতালের বড় বড় ডাক্তারেরা এঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে, বীজাণু সম্বন্ধে এঁর অভিমত একবারে অকাট্য। অথচ মানুষটি এমন নিরীহ যে চাক্ষুষ দেখে কিছুমাত্র বোঝবার যো নেই। বেঁটেখাটো চেহারা, বাহুল্যবর্জিত বেশভূষা, অন্যমনস্ক দৃষ্টি, মাথার চুল অবিন্যস্ত। মুখে কোনো কথাটি নেই, বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বীজাণুজগতে বিচরণ করছেন আর অনবরত মাইক্রোস্কোপে স্লাইডের পর স্লাইড চড়িয়ে রোগরহস্য প্রত্যক্ষ করছেন। চোখেরও ক্লান্তি নেই, হাতেরও অবসর নেই। সন্ধ্যা হ'য়ে যায়, ছুটির পর সকলেই চ'লে যায়,

আলো জ্বলে ওঠে, ফটক বন্ধ করবার সময় হয়, তখন তিনি ল্যাবরেটরি পরিত্যাগ করেন। দুপুরে টিফিনের ছুটি হয়, কেউবা টিফিনরুমে যায় টিফিন খেতে, কেউবা বাইরে চ'লে যায় আড্ডা দিতে, অনেকে লাইব্রেরিতে ব'সে জটলা করে, কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্তের টিফিনের অবসর নেই। বেয়ারাটার যখন দয়া হয় তখন শুধ্ এক কাপ চা মাইক্রোস্কোপের কাছে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে চ'লে যায়। ডক্টর দাসগুপ্ত যদি বীজাণুরাজ্য থেকে একবার চোখ তোলেন, যদি অসংখ্য শ্লাইডের স্তুপের মধ্যে চায়ের বাটিটা তাঁর নজরে পড়ে, তখন তাড়াতাড়ি কাজের হাতেই বাটিটা ধ'রে চুমুক দিয়ে এক নিশ্বাসে সমস্ত গলাধঃকরণ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ আবার বীজাণুরাজ্যে প্রবেশ করেন। কোনো কোনো দিন তাও হয় না, পরিপূর্ণ চায়ের বাটি প'ড়েই থাকে, বেয়ারা এসে ফেরৎ নিয়ে যায়। সিগারেট পান কিছুই অভ্যাস নেই। একটি ময়লা এপ্রন সর্বদা গায়ে থাকে, সেটি ঘামে ভিজে যায়, মাথার ঘাম টস্‌টস্‌ ক'রে গড়িয়ে পড়ে, গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে তিনি আপন কাজ করতে থাকেন। পাছে বীজাণুদর্শনে কোনো ব্যাঘাত হয় এইজন্য মাথার উপর পাখা থাকলেও কখনো সেটা চালাতে দেন না। ক্লাসে যেদিন তাঁর লেকচার থাকে সেদিন নিরবচ্ছিন্ন লেকচার দিয়ে যান, কোথাও একটু থামা নেই। এলার্ম ঘড়ির মতো যেন তাঁর দুরকমের দম দেওয়া আছে। কাঁটা ঘোরাবার সময় ক্রমাগতই কাঁটা ঘুরবে, আবার বাজবার সময় ক্রমাগতই বাজবে।

ডক্টর দাসগুপ্তের দৃষ্টান্তে আমার অনেক উপকার হোলো। একনিষ্ঠার এমন উদাহরণ দেখলে কার মনে না প্রেরণা আসে?

জীবনে বিজ্ঞান সেবাই ওঁর একমাত্র ব্রত, এ ছাড়া আর কিছু জানেন না। আমিও অন্তত কিছুটা ওঁর আদর্শমতো ক'রে নিতে পারবো।

একদিন দেখি একজন গুজরাটি জুয়েলার ল্যাবরেটরিতে ডক্টর দাসগুপ্তের কাছে এসে হাজির। তাকে দেখেই উনি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

বললেন—"এখানে কেন? এখানে কেন? আমার বাড়িতে যেও।" সে বললে—"আজই আমায় দেশে চ'লে যেতে হচ্ছে, আর সময় নেই, তাই এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। জিনিষটা আপনি নিয়ে রেখে দিন। দামের হিসাব পরে হবে।" এই ব'লে সে একটা জুয়েলারি ভেলভেট কেস্ ওঁর হাতে দিয়ে চ'লে গেল। উনি তাড়াতাড়ি সেটা নিজের ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন।

আমি মনে মনে হাসলুম। স্ত্রীর জন্য গহনা গড়াচ্ছেন? এইটুকু সখ তাহ'লে এখনো আছে, সব নষ্ট হয় নি। আমার এই নিয়ে একটু বিদ্রূপ করবার লোভ হোলো। আমি বললাম—"ওটা বুঝি মিসেস্ দাসগুপ্ত গড়াতে দিয়েছিলেন? আপনি তো না দেখেই নিয়ে নিলেন, কিন্তু তিনি যদি না পছন্দ করেন? একবার খুলে দেখেও নিলেন না, ঠিক হয়েছে কি না।"

ডক্টর দাসগুপ্ত একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন—"আমার তো স্ত্রী নেই, অনেক দিন মারা গেছেন।"

—"ও, এক্সকিউজ মি, আমি জানতুম না। তবে বুঝি ও মেয়ের জন্যে?"

—"আমার মেয়েও নেই, কেবল দুটি ছোটো ছোটো ছেলে।"

—"আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে এ রকম ভাবে কৌতূহল প্রকাশ করা।"

—"অন্যায় কেন হবে? ওতে গহনা আছে, ঠাকুরের। অনেকদিন ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরের গলায় একটা হার পরিয়ে দেবো, তাই আর কি। চলুন না একদিন আমার বাড়িতে, দেখে আসবেন। চলুন আজই চলুন।"

ডক্টর দাসগুপ্তের আবার ঠাকুর কী? দেখবার জন্য কৌতূহল হোলো। বাসায় পাঞ্চালীকে ব'লে এসে সন্ধ্যার সময় ডক্টর দাসগুপ্তের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম।

শহরের বাইরে অনেক দূরে ঢাকুরিয়ার লেকের কাছে ডক্টর দাসগুপ্তের বাড়ি। জায়গাটা নিরিবিলি, বাড়িখানি ছোটো, নতুন তৈরি হয়েছে,

খানিকটা ফুলবাগান দিয়ে ঘেরা। ভিতরে আসবাবপত্র খুব কম, বাইরের ঘরে মাত্র একখানি টেবিল, একটি চেয়ার, আর একটি বেঞ্চ। দেয়ালে কোনো ছবি টাঙানো।

বাইরের ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি ভিতরে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে কাপড় ছেড়ে এসে বললেন—"চলুন ঠাকুর দেখবেন।"

তিনতলার ছাদের উপরে একমাত্র ঘর, চারিদিকেই তার জানলা। সেইটাই ডক্টর দাসগুপ্তের শোবার ঘর, সেইটাই ওঁর ঠাকুরঘর। এক পাশে ওঁর নিজের খাট, অন্য পাশে সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।

মেঝের উপর একটি আসন পেতে আমাকে বসতে দিয়ে বললেন—"এইবার আমি হারটা বের ক'রে পরিয়ে দিই।"

সোনার হার রাধিকার গলায় পরিয়ে দেওয়া হোলো। কৃষ্ণের গলায় দেওয়া হোলো ফুলের মালা।

—"দেখুন তো, সুন্দর দেখাচ্ছে কি না? আপনারা সৌখিন মানুষ, আপনারাই ঠিক বলতে পারবেন।"

—"বেশ দেখাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের পূজো করে কে?"

—"আমিই করি। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার। বেশি কিছু তো না, অল্পেই হ'য়ে যায়।"

—"এত বড় সায়ান্টিস্ট হ'য়ে আপনি এই কাজ করেন? আমি ভাবতুম যে বিজ্ঞানের সেবা ছাড়া আর কিছু আপনি জানেন না, দিনরাত ঐ নিয়েই তন্ময় হ'য়ে থাকেন। তার মধ্যেও যে আবার এই সব ব্যাপার আছে, আমি ভাবতেই পারিনি।"

—"সমস্ত দিন তো আপনাদের বিজ্ঞানের কাজই করি, নিজের কাজ একটু করবো না? পেট ভরানোর জিনিষ দিয়ে মন ভরানো যায় না, মনের তৃপ্তির জন্যেও তো একটু কিছু চাই।"

—"আমি ভাবতুম যে বিজ্ঞান চর্চাতেই আপনার সমস্ত মন ভ'রে আছে। যারা বিজ্ঞান নিয়ে থাকে তাদের আর কি [illegible] দরকার হয়? ঠাকুরের পূজা সকলেই করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে[illegible]াধনা ক'জন করবার সৌভাগ্য পায়? আমি যদি আপনার মতো শক্তি সামান্যও পেতুম তাহ'লে কি আর অন্য কোনোরকম জিনিষ দিয়ে মন ভুলিয়ে রাখবার আমরা দরকার হোতো?"

—"তা জানি না। তবে বিজ্ঞান হচ্ছে এক স্তরের জিনিষ, আর এই সব হোলো অন্য স্তরের জিনিষ। বিজ্ঞানের সাধনা খুব শক্ত ব্যাপার নয়, সুযোগ আর সুবিধা পেলে সকলেই করতে পারে। আমি যে সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি আপনি যদি সেগুলো পেতেন তাহ'লে আপনিও ডক্টর দাসগুপ্ত হ'য়ে যেতেন। ওতে বিশেষ কিছু বাহাদুরী নেই। বিজ্ঞান সাধনার একটা বিশিষ্ট সাড়া আছে, সেইটে যদি একবার মনের মধ্যে এসে যায়, তাহ'লে আর কোনো ভাবনা নেই, আপনা আপনি কাজ চলতে থাকে। বেহালা বাজানো দেখেছেন—বেহালা? যতক্ষণ ভালো শেখেন নি ততক্ষণ যেমন তেমন বাজিয়ে যান, কিন্তু ওর ভিতরকার সাড়াটা একবার হাতে এসে গেলেই আপনি ওস্তাদ হ'য়ে গেলেন, তখন ওস্তাদির ঝোঁকে আপনিই সেরা জিনিষ হাত দিয়ে বেরোতে থ[illegible]। বিজ্ঞানেও আনন্দ আছে বৈ কি, কিন্তু তবু তার একটা সীমা আছে। [illegible]ন্তু এদিকের সাধনার কোনো সীমা নেই। যতই বাড়াতে থাকবেন তত[illegible]াড়ে যাবে, কখনো শেষ হবে না।"

—"স্পিরিচুয়াল কথাও আপনি জানেন দেখছি। নি[illegible]জর কানে না শুনলে আমি কখনো ধারণাও করতে পারতুম না।"

—"মানুষ মাত্রেই প্রধানত স্পিরিচুয়াল জীব। আর সকল জানোয়ারের সঙ্গে এইখানেই তার তফাৎ। যতই বৈজ্ঞানিক হই, মানুষের আসল চরিত্রটা কোথায় যাবে?"

আমি আরো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দুটি রেকাবিতে ভরা অনেক রকমের ফল আর মিষ্টান্ন এসে হাজির হোলো। ডক্টর দাসগুপ্ত বললেন—"নিন, একটু প্রসাদ খান, প্রসাদ খান ও সব কথা পরে হবে।" খেলেন তিনি অল্পই, খেতে খেতে বললেন—"এই আমার ইভনিং লাঞ্চ।"

প্রসাদ খাবার পরেই ডক্টর দাসগুপ্তের ছেলে দুটি এসে বসলো। তিনি বললেন—"এইবার আমাদের একটু কীর্তন শুনুন।" তিনজনে মিলে হাততালি দিয়ে দিয়ে কীর্তন গাইতে লাগলেন।

আমি অবাক হ'য়ে ওঁদের গান শুনতে লাগলাম।

৩৭

হাঁসপাতালে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। সার্জন বনারজি অন্যত্র বদলি হ'য়ে গেছেন। অটলদা' আবার আমার জায়গায় ফিরে গেছেন। গাঙ্গুলিও এখন সেখানে নেই। হাঁসপাতালে যক্ষ্মা রোগের একটা আলাদা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, সে ঐ বিভাগের কাজ নিয়ে গেছে। ইচ্ছা ক'রেই সে ঐ কাজ নিয়েছে, যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে চর্চা করবার খুব আগ্রহ।

একদিন দেখতে গেলাম, গাঙ্গুলি নতুন জায়গায় কেমন কাজ করছে। সেখানে অনেক রোগীর ভিড়, সেই ভিড় ঠেলে গাঙ্গুলির কাছে পৌছানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইতিমধ্যেই ডক্টর গাঙ্গুলির খুব সুনাম হয়েছে, রোগীরা দলে দলে আসছে চিকিৎসার জন্য, গাঙ্গুলিকেই তা'রা দেখাতে চায়, ওর উপর অগাধ বিশ্বাস। গাঙ্গুলি প্রত্যেক রোগীকে আলাদা আলাদা দেখে। রোগীরা বারান্দায় ঘরে ভিড় ক'রে অপেক্ষা করতে থাকে,

দারোয়ান একটির পর একটি রোগী ভিতরে প্রবেশ [illegible] দেয়। এদের মধ্যে ভদ্রবেশী রোগীই অধিকাংশ। তা'রা সর্বক্ষণ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে থাকে, পাছে নিশ্বাসের পথে অন্য লোকের দূষিত বীজাণু তাদের নিজেদের নাকে ঢুকে পড়ে। সকলেই যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য ওখানে এসেছে, কিন্তু এদের বোধ হয় ধারণা, অন্যদের যক্ষ্মা যত মারাত্মক, এদের নিজেদের ততটা নয়। সকলেই বোধ হয় ভাবে নিজের রোগটা কম, আর অপরের বেশি।

কোনোমতে ভিড় ঠেলে গাঙ্গুলির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সে তখন একটি রোগিনীকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে, প্রথমটা আমাকে দেখতে পেলে না। পরীক্ষা অনেকক্ষণ ধ'রেই চললো। তারপর হঠাৎ আমাকে দেখে খুব খুশি হ'য়ে উঠলো।

—"এই যে ডক্টর মুখার্জি! ল্যাবরেটরির মানুষ পথ ভুলে হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে, এ কী আশ্চর্য ব্যাপার? তারপর খবর কী? শুনতে পাই আজকাল ভয়ানক রিসার্চ ওয়ার্কার হ'য়ে পড়েছো, ল্যাবরেটরি ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়ো না, কারো সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করো না, ব্যাপার কী?"

—"তুমিই বা কোন দেখা করো? হাসপাতাল থেকে ল্যাবরেটরি বুঝি অনেকটা দূর, একবারও যাওয়া যায় না? আমি তো বরং দেখতে এলাম, কেমন কাজকর্ম করছো।"

—"কী করবো ভাই এখান থেকে বেরোতে আমার বেলা প্রায় দুটো হ'য়ে যায়, তখন আর কোথাও যাবার এনার্জি থাকে না। আচ্ছা, নিশ্চয় একদিন যাবো তোমার ল্যাবরেটরিতে, অড্ডা দিয়ে আসবো।"

—"তুমি যতক্ষণ সময় নিয়ে এক একটি রোগীকে দেখছো, তাতে দুটো কেন, চারটে বেজে যাবে। বাইরে এখনো অনেক ভিড়।"

—"এই মেয়েটিকে দেখতেই একটু বেশি সময় লাগলো, সকলের পক্ষে এত সময় লাগে না। এর রোগটা কিছুতেই ধরতে পারছি না, অনেক দিন

থেকে এখানে আসছে। কে জানো তো? থিয়েটারের একজন ভালো গায়িকা। গান গাওয়া ওর বন্ধ ক'রে দিয়েছি, কিন্তু গলাটুকুই ওর সম্বল, না গাইলে খেতে পাবে না।"

—"সে তো বুঝলাম, কিন্তু এই সব রোগীদের নিয়ে অতো বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। পুরুষ হ'লে বোধ হয় এতটা করতে না। মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব করা তোমার কখনো ঘুচবে না।"

—"ঠিক বলেছো। জানোই তো, স্বভাব যায় না ম'লে।"

এরপর অনেকদিন গাঙ্গুলির আর কোনো খবর পাইনি। হাঁস-পাতালের খবর মাঝে মাঝে কানে আসে। পাটের গুদামে আর খড়ের নৌকায় আজকাল খুব আগুন লাগছে, অনেক বার্নিং-কেস হাঁসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করবার হুজুগটা বেড়েই চলেছে। সে দিন এক ভদ্রলোকের চারিটি বড় বড় অবিবাহিতা মেয়ে একসঙ্গে আফিম খেয়ে হাঁসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটে মরেছে, একটা বেঁচে গেছে। ব্লাডপ্রেসার বেড়েও আজকাল অনেকে মরছে, যখন হাঁসপাতালে নিয়ে আসে তখন কিছুই করবার থাকে না।

এই সকল খবরের সঙ্গে শুনলাম ডক্টর গাঙ্গুলি কয়েকদিন থেকে হাঁস-পাতালে আসছে না, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে শয্যাগত হ'য়ে আছে।

দেখা করতে যাবো ভাবতে ভাবতেই কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন গাঙ্গুলি নিজেই ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির। বললে—"রিটার্ণ ভিজিট দিতে এলাম। দেখছো, কথা দিয়ে আমি ভুলে যাই না। দেখাও তোমার মাইক্রোস্কোপে আজ কোন বীজাণুর আবিষ্কার করলে।"

চেহারাটা ওর শুকিয়ে গেছে, মুখের ভাব অসুস্থ।

বললাম—"তোমাকে দেখতে যাবো যাবো মনে ক'রেও হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু শরীর এখনো তোমার সারে নি! খুব বেশি রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল নাকি?"

—"না তেমন কিছু নয়, তবে দিন পনেরো বিছানায় ফেলে রেখেছিল।"

—"এখনো তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কাজে জয়েন করেছো না কি ?"

—"হাঁ, জয়েন করেছি বটে, কিন্তু কাজ করতে পারছি না। ভাবছি দিন কতক ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসি।"

এর কিছুদিন পরে আইরিণের সঙ্গে দেখা। সে বললে ডক্টর গাঙ্গুলির আবার জ্বর হয়েছে। এবার নিশ্চয় ওকে দেখতে যাওয়া আমাদের উচিত। আইরিণ বললে সেও যাবে আমার সঙ্গে। দুজনে মিলে সন্ধ্যার সময় তার বাড়ি গেলুম।

গাঙ্গুলি বিছানায় শুয়ে আছে আর অনবরত কাসছে। গায়ে বেশ জ্বর। বললে—"আবার রিল্যাপ্স হোলো।"

আমি বললাম—"আরো বিশ্রাম নেওয়া তোমার উচিত ছিল।"

—"সে তো জানি, কিন্তু বাড়িতে একা শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না।"

আইরিণ এসেছে দেখে গাঙ্গুলী খুব খুশি হোলো। বললে—"এসেছো যখন, তখন তোমার একটা কাজ কর। ঐ টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি আছে, এক দাগ আমাকে খাইয়ে দাও। অনেকক্ষণ ওষুধ খাবার সময় হ'য়ে গেছে, অতটা খেয়াল ছিল না।"

আইরিণ ওষুধ খাওয়ানোর একটা গ্লাস খুঁজতে লাগলো।

"গ্লাসের হাঙ্গামায় কাজ নেই, ওতে হবে। শিশির থেকে এক দাগ ওষুধ একেবারে আমার মুখে ঢেলে দাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কী ওষুধ ওটা ?"

—"কি কি আছে তা জানি না। এই পাড়ার একজন নামজাদা প্রাইভেট ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে দেখে যান, তাঁরই ওষুধ চলছে। ও সব ওষুধ না খেলেও চলে, রেষ্ট নিয়ে কিছুদিন প'ড়ে থাকলে আপনিই সেরে যাবে। কিন্তু তাই যে আমি পারি না।"

—"কী বলছেন তিনি ?"

—"পরশু বলছিলেন ডানদিকে একটুখানি প্যাঁচ হয়েছে। সেইদিনই ঐ ওষুধটা দিয়ে গেলেন। বলেছিলেন আজ আবার আসবেন, কিন্তু ব্যস্ত মানুষ, বোধ হয় সময় করতে পারেন নি।"

ওর বুকটা পরীক্ষা করলাম। কেমন একটু সন্দেহ হোলো। বললাম, স্পুটামটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই। রক্তপরীক্ষাও করা উচিত।

গাঙ্গুলি হেসে উঠলো।—"তোমার মাথায় এখন ল্যাবরেটরি ঢুকেছে কি না, ওসব না হ'লে আর চলবেই না।"

তবু আমি জেদ করতে লাগলাম, আইরিণও অনেক অনুরোধ করতে লাগলো, শেষে গাঙ্গুলি স্পুটাম দিতে রাজি হোলো।

পরের দিন স্পুটাম পরীক্ষা করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। ডক্টর দাসগুপ্তকে দিয়েও একবার পরীক্ষা করিয়ে নিলাম। তিনি বললেন, একদিনের পরীক্ষায় নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, অন্তত তিন দিন দেখা উচিত, কারণ অনেক সময় বীজাণু থাকলেও রং ধরে না, সেইজন্য দেখা যায় না। সেই ব্যবস্থাই করা হোলো। তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় পাওয়া গেল অতি ক্ষুদ্র লাল লাল বীজাণু। ডক্টর দাসগুপ্ত বললেন, টি. বি. যত ছোটো হয় ততই মারাত্মক।

সেদিন আমি আর আইরিণ দুজনে মিলেই আবার গেলাম। গিয়ে দেখি গাঙ্গুলির জ্বর সেদিন একেবারে ছেড়ে গেছে, সে বিছানা ছেড়ে চেয়ারে উঠে বসেছে।

আমার মুখের ভাব দেখে সে বললে—"মুখখানা তোমার অমন কেন মুখার্জি ? স্পুটামে কিছু পেয়েছ বুঝি ?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

—"টি. বি. পেয়েছ নিশ্চয়। ড্যাম ইট্—তাতে কী হয়েছে ? ও কিছু না, অমন অনেকের পাওয়া যায়, অথচ তা'রা চমৎকার হেল্‌দি, থাকে।

টিউবারকল্‌ ব্যাসিলাইকে ভয় করবার যুগ আর নেই, কত খারাপ খারাপ রোগীকে আমিই সারিয়ে দিয়েছি। ও হয়তো আমার অনেকদিন থেকেই আছে, ছেলেবেলায় একবার ডাক্তারদের সন্দেহও হয়েছিল। জেনেশুনেও আমি বিশেষ কেয়ার করি না, ও রোগ আমার পোষা হ'য়ে গেছে। শরীরে টি. বি থাকা প্রতিভার লক্ষণ, বড় বড় জিনিয়াস্‌দের প্রায় এই রকম থাকে। লেনেকের কথা জানো তো, যিনি আমাদের ষ্টিথোস্কোপ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন? রবার্ট ককের ইতিহাস জানো তো? আজকালকার বড় বড় লেখকদের মধ্যেও এইচ. জি. ওয়েলসের আছে, সোমারসেট মমের আছে, টমাস্‌ মানের আছে। কার নেই? ওটা থাকা আজকাল গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভয় নেই, আমি মরবো না। জ্বর হয়েছিল ব'লে দেখতে পেয়েছ, আজ জ্বর ছেড়ে গেছে, দুদিন পরে দেখবে আর কিছু নেই। চলো আজ একটু সিনেমা দেখে আসি, অনেকদিন দেখি নি।"

আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম। আইরিণ খুব রাগ করতে লাগলো। কিন্তু গাঙ্গুলি নাছোড়বান্দা, সিনেমা দেখতে সে যাবেই। আইরিণকে বুঝিয়ে দিলে, শরীরটা কেবল ভয় করবার যন্ত্র নয়, কেবল পুতুপুতু ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার যন্ত্র নয়, ওটা আনন্দ উপভোগ করবার যন্ত্র। ওর দ্বারা যতটা আনন্দ পাওয়া যায় সেটুকু পুরোপুরি উসুল ক'রে নেওয়া উচিত। বললে,—আজ সিনেমায় না গেলে ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে যাবে, তাতেই বরং শরীরের অনিষ্ট হ'তে পারে।

গাঙ্গুলিকে কিছুতে নিবৃত্ত করা গেল না, সিনেমায় ওকে নিয়ে আমাদের যেতেই হোলো। খুব আনন্দ ক'রে আমাদের সঙ্গে ব'সে সিনেমা দেখলে, যেন কিছুই হয় নি।

পরের দিন থেকে ওর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো।

সেদিন অটলদা, আমি, আর আইরিণ, তিনজনে মিলে ওকে দেখতে গেলাম।

আমরা গিয়ে দেখি গাঙ্গুলি চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে আছে, খাটের নীচে একটা পিকদানি টাটকা রক্তে ভরা, গাঙ্গুলির বুড়ো বাপ কাছে ব'সে বুকের উপর আইসব্যাগ দিচ্ছে। রক্তটা সম্ভবত সবে মাত্র বেরিয়েছে।

আমাদের দেখে বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন—"কী হবে বাবা, রক্ত তো কিছুতেই থামচে না?"

—"আমাদের কোনো খবর দেন নি কেন?"

—"ও বারণ করলে। বললে, কাউকে খবর দিতে হবে না, আমি নিজেই ওষুধ খাচ্ছি, তাতেই সেরে যাবে। বলে কি, যে রক্তটা খানিক উঠে যাওয়া ভালো।"

সাড়া পেয়ে গাঙ্গুলি চোখ চাইলে, আমাদের দেখে খুশি হ'য়ে উঠলো। বললে—"এই এদেরই জিজ্ঞাসা করুন, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। রক্তটা কিছু বেরিয়ে গেলেই ভালো। আমাদের কেতাবে বলে—ব্লীডার্স ডু বেস্ট্। আমি এখন বেশ ভালো বোধ করছি। আপনি এখন যান, এদের সঙ্গে একটু গল্প করি।"

অটলদা' বললেন—"আপনার কোনো ভয় নেই, বিশ্রাম নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকলে আর ইনজেকশন দিলেই ওটা ক্রমে ক্রমে সেরে যাবে। আমরা তার ব্যবস্থা করছি।"

গাঙ্গুলির বাবা চ'লে গেলে ও বললে—"বাবা বড্ডো ভয় পেয়ে গেছেন।"

আমি বললাম—"ভয় পাবার তো কথাই। যাই হোক, তুমি আর

একটিও কথা বলবে না, একেবারে মুখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে হবে। যা কিছু বলবার থাকে, কাগজে লিখে জানাবে। কথা বলা বন্ধ করো একেবারে।"

—"ঐটি মাপ করতে হবে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার আনন্দটুকুও আমাকে পেতে দেবে না? যতটুকু সময় তোমরা আছো ততটুকু কথা বলতে দাও, তোমরা চলে গেলে আর একটিও কথা বলবো না।"

অটলদা' বললেন—"তুমি নিজের ইচ্ছায় যদি এমনি ক'রে আত্মহত্যা করো, তাহ'লে কে আর তোমাকে বাঁচাবে বলো।"

—"ড্যাম ইট্, অটলদা আপনি ভগবান মানেন?"

—"নিশ্চয় মানি।"

—"নিশ্চয় মানেন না, কেবল মুখে বলেন। ভগবানের নিয়ম, যাকে দিয়ে যতদিন পর্যন্ত এখানে কোনো কাজ করাবার প্রয়োজন আছে ততদিন সে কিছুতেই মরে না, যতই অত্যাচার করুক, বেঁচে থাকে। নেপোলিয়ন কী বলতো মনে নেই? বন্দুকের সামনে সে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতো, সে জানতো যে সে মরবে না। আমিও তাই এবার দেখতে চাই। একটা কাজ আমি হাতে নিয়েছি। যদি ম'রে যাই তাহ'লে বুঝবো আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করানো ভগবানের অভিপ্রায় নেই, আমাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই।"

আমি বললাম—"বাজে তর্ক ছেড়ে দাও, কথা বলা বন্ধ না করলে আমরা এখান থেকে চ'লে যাবো।"

—"না ভাই মুখার্জি, যতই রক্ত বেরুক, কথা আমি বলবোই,—টু দি লাষ্ট ড্রপ্ অফ্ মাই ব্লাড্। মুখ বুজে মরতে আমি পারবো না। তোমাকে একটা কথা বলি শোনো। যদি বেঁচে উঠি, তাহ'লে যে কাজ হাতে নিয়েছি সে কাজে আমি শেষ পর্যন্ত একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো।

টিউবারকিউলোসিস্ নিয়ে কাজ করবার আমার বরাবরই ঝোঁক ছিল, সেইজন্যেই আমি আগে সার্জারিটা কিছু শিখে নিলুম। ভালো সার্জন না হ'লে আজকাল ঐ রোগের ভালো চিকিৎসা করা যায় না। প্রস্তুত হ'য়েই আমি কাজে নেমেছিলুম, ইচ্ছা ছিল যে নিজের দেশের লোককে এই রোগ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচাবো। ডাক্তার হ'য়ে যদি লড়তে হয় তাহ'লে আমাদের এই রোগের সঙ্গেই লড়া উচিত। ভেবেছিলুম যে সুইজারল্যাণ্ডে কোনো স্যানাটোরিয়মে গিয়ে চিকিৎসাগুলো একবার আরো ভালো ক'রে শিখে আসবো। তার ব্যবস্থাও করেছিলুম, ইটালি থেকে একটা স্কলারশিপেরও যোগাড় করেছিলুম। কিন্তু যদি এখন আমি ম'রে যাই, তাহ'লে স্কলারশিপটা নষ্ট হ'য়ে যাবে। ওটা তুমিই তাহ'লে নিয়ে নিও, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে রাখছি। আমার কাজের ভারটা তখন তুমি নেবে, এই কথা রইলো। আমার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ সুরু করবে। আমার চেয়ে এ কাজ তুমিই ভালো পারবে। তোমার আন্তরিকতা আছে, উচ্চাভিলাষ আছে। আমি দেখেছি, তোমার ডাক্তারি কেবল পয়সা রোজগারের জন্য নয়।"

অনেকগুলো কথা বলতে বলতে ওর আবার কাসির ঝোঁক এলো, কাসির সঙ্গে আবার খানিকটা রক্ত উঠলো।

ওর চিকিৎসার আমরা রীতিমত ব্যবস্থা করলুম। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে আইরিণ ওকে নার্স করতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে রক্ত ওঠা বন্ধ হ'য়ে গেল, গাঙ্গুলি ধীরে ধীরে একটু সেরে উঠতে লাগলো। জ্বরও ক্রমশ কমতে লাগলো, আবার যেন গায়ে একটু রক্ত হোলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন অনেকখানি রক্ত উঠে বেচারা হার্টফেল ক'রে মারা গেল।

ওর সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয় সেদিনের সব কথা এখনো আমার মনে আছে। ও তখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে, একটু আধটু

চলাকেরা করতে পারে। ইদানিং দেখতুম গাঙ্গুলি অনেক বই পড়তো, বই প'ড়েই সারাদিন কাটাতো। বিছানার পাশে টেবিলের উপর নানারকমের বই স্তূপীকৃত হ'য়ে থাকতো।

সেদিন গিয়ে দেখি তন্ময় হ'য়ে একটা বই পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলুম—"কী বই পড়ছো?"

গাঙ্গুলি বললে—"এ একটা নভেল, এতে একজন ডাক্তারের চরিত্র আঁকা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই ধরণের অনেকগুলো বই আমি পড়লুম। অনেকেই দেখি ডাক্তারের চরিত্র আঁকতে যায়, কিন্তু সকলেই বিকৃত ক'রে ফেলে, কোনোটা স্বাভাবিক হয় না। কেউ আঁকে হৃদয়-হীন, কেউ আঁকে প্রতারক, কেউ আঁকে দুশ্চরিত্র এমন,—দেখলেই বোঝা যায় যে ডাক্তারের উপর লেখকের কোনো সহানুভূতি নেই, ঠুকতে পেলে ছাড়ে না। বেছে বেছে কেন এরা ডাক্তার আঁকতে যায় তা জানো? ডাক্তারকে এরা ভয় করে, মনে করে ভয়াবহ জানোয়ার। কিন্তু এরা জানে না যে মানুষকে বাঁচানো বিজ্ঞানের ধর্ম, সেই বিজ্ঞানের সেবকের নাম ডাক্তার। ডাক্তারি ছাড়া আর সব বিজ্ঞানই মানুষের অনিষ্টের কাজে নিযুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু ডাক্তারি বিজ্ঞান কখনো তা হয় না। ডাক্তার দুষমন হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক জিনিষ দেখিয়ে মানুষকে তাক্ লাগানো যায় বটে,—কিন্তু তাতে আর্ট হয় না। ডাক্তারের চরিত্র আঁকা সবচেয়ে কঠিন, তার কারণ ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা মানুষের সব চেয়ে অকৃত্রিম চরিত্র নিয়ে। মানুষের রক্ত-মাংসের ব্যথা বেদনা নিয়ে তাদের কারবার, জীবনমৃত্যু নিয়ে তাদের কারবার। প্রকৃত মানুষের স্বরূপ তা'রা দেখে, তাই থেকেই তাদের চরিত্র গঠিত হয়। ডাক্তারও মানুষ, স্বার্থপরতাও তার থাকতে পারে, কিন্তু ঐ সব অভিজ্ঞতার দরুণ একটা এমন বৈরাগ্য, এমন উদারতা তার থাকবে যা অন্য কারো থাকতে পারে না। যে নিজে কখনো ডাক্তার হয় নি, সে

কেমন ক'রে এটা বুঝবে? কল্পনায় রাজাও হওয়া যায়, ফকিরও হওয়া যায়, কিন্তু ডাক্তার হওয়া যায় না।"

আমি বললাম—"বেশ তো, এই সব নিয়ে তুমি কিছু লেখো না কেন? এখন তোমার যথেষ্ট অবসর রয়েছে, ইচ্ছে করলেই লিখতে পারো।"

সে বললে—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই লিখবো, মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি যে একটু জোর পেলেই আমি এই নিয়ে লিখতে আরম্ভ করবো। ডাক্তারদের তরফে বলবার কথা অনেক কিছুই আছে, সেটা তাদের নিজেদেরই বলা উচিত। চেষ্টা করলে হয়তো বাস্তব মানুষের চরিত্র তা'রা ভালোই আঁকতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে ডাক্তারদের লেখবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তা'রা চুপ ক'রে থাকে। আজকাল দু'একজন ডাক্তার লিখচেন বটে। আমিও একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে যে ডাক্তারেরা অস্বাভাবিক জীব, এটা ভেঙে দেওয়া দরকার।"

আমি বললাম—"আগে তো তুমি এ সব কথা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে না, কেবল মেয়েদের নিয়েই থাকতে, তাদের সম্বন্ধেই অনেকরকম কথা বলতে। অসুখ হ'য়ে তোমার মন অনেক বদলে গেছে দেখছি। এখন তুমি ভগবানের কথা বলো, সাহিত্যের কথা বলো, অনেক রকমের কথাই বলো।"

সে বল্‌লে—"অসুখ হ'লে মানুষ অনেক রকমের কথাই ভাবে। কিন্তু এটা ঠিক যে আমি মেয়েদের কথা খুবই বলতুম। ওটা কী জানো? ওরা হচ্ছে নিষিদ্ধ ফল। আর আমার স্বভাব তো জানো? নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতিই আমার ঝোঁক। বহুদিন থেকে আমার ঝোঁক ছিল যে মেয়েদের আমি একটু স্টাডি করবো। কেনই বা আমরা ওদের বুঝতে পারবো না? সেই জন্যেই আমি ওদের সঙ্গে এত মিশেছি, নতুন কাউকে দেখলেই তার ভিতরে ঢুকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। ওদের আমি বেশ ক'রে চিনে

নিয়েছি। ইচ্ছে আছে যে সেরে উঠে আমি ওদের সম্বন্ধেও একটা বই লিখবো, তাতে এমন সব কথা লিখবো যা কেউ কখনো লেখে নি।"

আমি বললাম—"যাদের তুমি অবিশ্বাস করো তাদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে লিখবে কেমন ক'রে? তোমার ধারণা, ওদের মধ্যে ভালো কেউই নেই।"

গাঙ্গুলি বললে—"এ কথা আমি কখনই বলি না। ভালো মেয়ে অনেক আছে। কিন্তু ভালো মেয়ে মাত্রেরই একটু মাথা-খারাপের ছিট আছে, একটা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি তাদের একটা অস্বাভাবিক রকমের আতিশয্য। ওরা কেমন তা জানো! যেন এক একটা রাগিণীর সুর,—কেউ বা ভৈরবী, কেউ বা পূরবী, কেউ বা আশাবরী। প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট সুরের ধুয়া আছে, বারেবারে সুরটা সেইখানেই ফিরে ফিরে আসে, অন্তরাতে কিংবা সঞ্চারীতে গেলেও বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। ঐ ধুয়াটা শুনলেই বোঝা যায় কোন সুরের আসল রূপটা কী। ঐ দেখ না আইরিণ মেয়েটি,—খুব নোবল্ হার্ট। কিন্তু জগতে ও কাউকে তেমন বিশ্বাস করে না, কেবল দেখতে পাই তুমি ছাড়া। তোমার ওপর ওর কী যে অগাধ বিশ্বাস হোলো তা জানি না, কিন্তু ঐ টুকুর জোরেই ও এখন দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখতে পাই। একজনকে একান্ত বিশ্বাস করবে, এইটেই ওর জীবনের টেন্‌ডেন্‌সি ছিল। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু তোমার প্রতি বিশ্বাস ভাঙতে পারিনি। তুমি যদি নিজে কোনো দিন ওর বিশ্বাস ভেঙে দাও, তাহ'লে ও হয়তো মরেই যাবে। কিন্তু তুমি তো জানো, কোনো মানুষই এতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

আমি বললাম—"আইরিণের কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝি এই সব হরেক রকমের অদ্ভুত আইডিয়া নিয়েই তুমি দিনরাত আলোচনা করো?"

গাঙ্গুলি বললে—"আইডিয়া নিয়েই তো বেঁচে আছি। মানুষের চেয়ে

তার আইডিয়া বড়ো, এক মিনিটও ছেড়ে থাকা যায় না। এই অসুখের মধ্যেই দেখলাম ভয়ানক যন্ত্রণার সময়েও তার ফাঁক দিয়ে আইডিয়াগুলো ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসে, তার মধ্যেই ওর কতদিকে বিস্তার চলতে থাকে। কতদিন আরো বিছানায় প'ড়ে থাকতে হবে তা তো জানি না, আইডিয়া না থাকলে সময় কাটাবো কেমন ক'রে ?"

আরো সেদিন কত রকমের কথা হোলো গাঙ্গুলির সঙ্গে।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে আবার গেছি। সদর দরজায় ঢুকতে গিয়ে দেখি আইরিণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, অশ্রুধারায় তার চোখমুখ ভেসে যাচ্ছে।

৩৯

আমাদের নিয়ে কার যেন এই পুতুলখেলা। নিতান্ত ছেলেমানুষির খেলা। কোথা থেকে দুটো পুতুলকে টেনে নিয়ে আসে, কোনোটার বা ঠ্যাং ভাঙা, কোনোটার বা নাক নেই। পুঁতির মালা গলায় জড়িয়ে পোষাক পরিয়ে বর ক'নে সাজিয়ে খেলাঘরের বিছানায় তাদের একজোড়ে রাখা হোলো, যেন চিরকাল তা'রা এমনিই থাকবে। তারপর কখন খেলা যায় ভুলে, পুতুলগুলো যায় হারিয়ে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো প'ড়ে থাকে। আবার হঠাৎ কখন খেলবার খেয়াল হয়, পুতুলগুলোকে খুঁজে এনে আবার একত্র করে। কিন্তু হয়তো মাত্র একদিন, হয়তো মাত্র একবেলা। তারপর আবার খেলা ভুলে যাবে, আবার পুতুলগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে থাকবে।

আইরিণের সংসর্গ ছাড়িয়ে আমি দূরেই স'রে গিয়েছিলুম, কিন্তু গাঙ্গুলির মৃত্যু আবার আমাদের দুজনকে কাছে টেনে এনে ঘনিষ্ঠ ক'রে দিলে।

আইরিণ বললে—"দিনান্তে অন্তত একবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার, নইলে আমি আর থাকতে পারছি না। সমস্ত যেন ফাঁকা মনে

হচ্ছে, জগতে যেন আমার কেউ নেই। ডক্টর গাঙ্গুলির মৃত্যুর আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে যে ক'দিন সময় লাগে সেই ক'দিন একবার ক'রে দেখা দেবেন, তা হ'লেই আমি সামলে নোবো। ওঁর অসুখের মধ্যে রোজই আপনার সঙ্গে দেখা হতো তাই হয়তো এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে, এ সময় সে অভ্যাসটা ছাড়তে পারছি না।"

জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যুও অনিশ্চিত, তার মধ্যে দৈবাৎ যে যার কাছে আসতে চায় তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে কোনো লাভ নেই। আমি স্বীকার হলুম রোজই ওর সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু হাঁসপাতালের ভিতর এখন কাজও করি না, সেখানে থাকিও না। রোজ দেখা সাক্ষাৎ হ'লেই সেটা পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা তাই স্থির করলুম, রোজ বৈকালে মাঠে বেড়াতে যাওয়া হবে, সেইখানেই দেখাসাক্ষৎ হবে। যখন বৈকালে আইরিণের ডিউটি থাকবে তখন হাঁসপাতালে দেখা করবো।

প্রত্যহ বৈকালে আইরিণ মসজিদের কাছে বকুল গাছের ধারে ফুট-পাথের উপর অপেক্ষা করতো। আমি হাঁসপাতালের ফটক দিয়ে বেরিয়ে ওর দিকে না চেয়ে ট্রামে গিয়ে উঠতুম। আইরিণ তখন পরবর্তী ট্রামে উঠতো। আগের ট্রাম থেকে নেমে আমি অপেক্ষা করতুম, আইরিণ এসে আমার সঙ্গে মাঠের দিকে বেড়াতে যেতো।

কিন্তু এইরকম ভাবে দেখাসাক্ষাৎ হোলো মাত্র কিছুকালের জন্য। তারপর কিছুকালের জন্য আবার একেবারেই ছাড়াছাড়ি।

চেষ্টাচরিত্র ক'রে গাঙ্গুলির জায়গায় আমি বদলি হলাম। গাঙ্গুলির স্কলারশিপটাও যোগাড় ক'রে নিলাম। তারপরে একদিন সুইজারল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করার আয়োজন করতে লাগলাম।

আইরিণ বললে—"দেখলেন তো, আমার স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না।"

আমি বললাম,—"এতে আর তোমার স্বপ্ন কৈ সফল হোলো বলো। আমি চ'লে যাচ্ছি একা আর তুমি রইলে এখানে।"

আইরিণ বললে—"তা হ'লেই বা, আমার মন চ'লে যাবে সেখানে, কেউ আটকাতে পারবে না। আমার জন্মভূমির দেশটা একবার দেখে আসুন, ডক্টর গাঙ্গুলির মনের সাধটা আপনি পূর্ণ ক'রে আসুন। আমি তো আছিই, এখানে থাকলেও বা, সেখানে গেলেও তাই।"

বাসা ছেড়ে দিয়ে পাঞ্চালীকে দাদার কাছে নিয়ে রাখলাম। পাঞ্চালী একটু কান্নাকাটি করতে লাগলো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম। তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে প্রত্যেক সপ্তাহে তাকে খুব বড়ো বড়ো চিঠি লিখবো, কোনো সপ্তাহ বাদ যাবে না।

দাদা বললে,—"ভালোই হোলো, বিজ্ঞান সাধনা এবার আসল জায়গা থেকেই শিখে আসবি। তোর খুব ভালোই লাগবে, কেবল বৌমারই এখানে কষ্ট হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশি পয়সাকড়ি যেন নষ্ট করিস্ নে।

বৌদিদি মেয়ে কোলে নিয়ে এসে হাজির হোলো। বললে,—"ঠাকুরপো, অনেক সুন্দরী সেখানে দেখতে পাবে, কিন্তু আমাদের যেন ভুলে যেওনা। পাঞ্চালীকে তো চিঠি লিখবেই, আমাকেও লিখবে। সেখানে যা যা দেখবে সব কথা চিঠিতে লিখতে হবে। আগে স্বীকার হও, তবে যেতে দেবো।"

ট্রেণে গিয়ে উঠলাম। দাদা আমাকে ট্রেণে তুলে দিতে গেল। পাঞ্চালীও গেল, আইরিণও গেল। আমার মনে প'ড়ে গেল আইরিণের স্বপ্নের কথা। ওর স্বপ্নেও আমি এমনি ক'রে ট্রেণে উঠেছিলুম, ওকে সঙ্গে নিয়েছিলুম বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখে। কিন্তু সকলের সামনে ওকে সে বিষয়ে কোনো কথা বলা যায় না। আমি বার কয়েক বেঞ্চের তলাটা দেখলুম, মিছামিছি একটা স্যুটকেস সেখানে ঢুকিয়ে রাখলুম। আইরিণ সেটা লক্ষ্য করলে, আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলে। পাঞ্চালী কাঁদছে, দাদার চোখও ছলছল করছে, কিন্তু আইরিণের চোখে

কোনো অশ্রু নেই, একটা শান্ত করুণ বহুদূ[illegible] দৃষ্টি। যেন সুদূর পর্যটনে যাত্রার জন্য সে প্রস্তুত, যতদূরেই আমি যাই, সেও যাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

৪০

অনেক দেশ ঘুরে প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র নিয়ে দাভোস্‌এর একটি বিখ্যাত স্যানাটোরিয়মে গেলাম। কী চমৎকার সে দেশ, কী চমৎকার দৃশ্য! তুষারাবৃত আল্‌পস্‌ পাহাড়ের গায়ে ছোট দাভোস্‌ শহরটি স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার জন্য বিখ্যাত, সেখানে অনেকগুলো স্যানাটোরিয়ম আছে। কোনটা বা ইংরেজের, কোনটা জার্মান, কোনটা ফরাসী, কোনটা বা প্রাইভেট। এই শহরের চারিদিকেই স্যানাটোরিয়ম।

দাভোসে ওঠবার রেল অনেকটা দার্জিলিংএ ওঠবার রেলের মতো, পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। আল্‌পস্‌ পাহাড়ের দৃশ্য হিমালয়ের মতো মহিমান্বিত নয়, কিন্তু তার চেয়েও মনোমুগ্ধকারী। নীচের থেকে উপর দিকে যত ওঠা যায় ততই দৃশ্যাবলীর আমূল পটপরিবর্তন হ'য়ে যায়।

আমি যখন গেলাম তখন সেখানে শরৎকাল পড়েছে। পাহাড়ের নীচের দিকের উপত্যকায় চারিদিকে কাঁচা সবুজ রঙ, যেমন সবুজ নূতন ঘাসে হয়। চারিদিকে স্নিগ্ধ সবুজ, ছোটো ছোটো গাছপালা দূর থেকে মখমল বিছানোর মতো দেখায়। খানিকটা ওঠবার পরেই দৃশ্য বদল হ'য়ে যায়, তখন দুধারে কেবল বড় বড় গাছের সারি, তার পাতায় পাতায় বিচিত্র বর্ণসমাবেশ। পাতাগুলো সবুজ নয়, কেবল হলদে, লালচে, আর সোনালি, দৈবাৎ কোথাও আধখানা মাত্র সবুজ। গাছগুলো যেন কোনো বহুবর্ণ-বিলাসী শিল্পীর রঙিন তুলিতে আঁকা, সবুজ রংটা সে তেমন পছন্দ করে না। গাছগুলোর দিকে চাইলে পাতায় পাতায় রঙের খেলা দেখে অবাক হ'য়ে

যেতে হয়। শরতের হাওয়া লেগে অনেক গাছ রিক্ত হ'য়ে গেছে, রঙিন পাতাগুলো গাছের নীচে ঘন হ'য়ে বিছিয়ে আছে, হাওয়ায় উড়ছে। চারিদিকেই রং ছড়ানো।

আরো উপরে উঠলে এ দৃশ্য মুছে গেল। সেখানে সমস্তই তুষারে ঢাকা, চারিদিকে কেবল সাদা ধবধব করছে। কেবল এক রকমের মাত্র সবুজ গাছ দেখা যায়, মাঝে মাঝে তুষার ভেদ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্য বড় চমৎকার, চতুর্দিক তুষারাচ্ছন্ন শুভ্রতার মধ্যে একটু একটু সবুজ। একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ঐ গাছের নাম কি। সে বললে, ওগুলো টানেন বাউম। ও নাকি সকল সময় চিরসবুজ হ'য়ে থাকে।

দাভোস্ ষ্টেশনে গিয়ে নামলুম বিকেল বেলা। তখনই অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, সমস্ত ষ্টেশন তুষারে ঢেকে একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। ষ্টেশনে জিনিষপত্র রেখে উল্দিষ্ট স্যানাটোরিয়মে গেলুম। ভাবলুম যে ডিরেক্টরের সঙ্গে আগে দেখা ক'রে তারপর জিনিষপত্র নিয়ে একটা কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো।

ডিরেক্টরের নাম ডক্টর মাওরার। সারা ইউরোপে যক্ষ্মা চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর অলৌকিক খ্যাতি। সপরিবারে তিনি কফি খাচ্ছিলেন, আমার কার্ড পেয়ে সেইখানেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। পরিচয়াদির পর আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করলেন, ফ্রাউ (মিসেস) মাওরার কফি পরিবেশন করিলেন। ট্রেণে খুব শীত করছিল, ধূম্রায়িত সুস্বাদু সুইস্ কফি আর গরম দুধ একত্রে তিনি মিশিয়ে দিলেন, খেয়ে শরীরটা গরম হ'য়ে উঠলো।

দু'একটা কথাবার্তার পর আমি বললাম—"এইবার আমি উঠি। একটা কোনো হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাল কখন আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলুন।"

ডক্টর মাওয়ার বললেন—"কালকের কথা কাল হবে, আমার সঙ্গে সব সময়েই দেখা হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ অসুবিধা না হয় তাহ'লে আজ রাত্রিটা আমার এখানেই থাকতে পারো, তোমার থাকবার মতো জায়গা এখানে যথেষ্ট আছে। আজ রাত্রে আমাদের স্যানাটোরিয়মে তোমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করছি।"

আমি বললাম, আমার জিনিষপত্র সব ষ্টেশনে প'ড়ে আছে। তিনি বললেন, তার জন্য কোনো ভাবনা নেই, রসিদটা আমাকে দাও, আমি সেগুলো এখানে আনাবার ব্যবস্থা করছি।

কাচ দিয়ে ঘেরা বারান্দাসংলগ্ন একটি প্রশস্ত ঘর আমার জন্য নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হোলো। আমার সুটকেস প্রভৃতি সেখানে এসে হাজির হোলো। গরম জলে স্নান সেরে আমি ডিনারে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলাম।

রাত্রি আটটায় ডিনার। ডক্টর মাওরার, তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর আমি, একসঙ্গে চললাম ডিনার খেতে। এঁরা বাড়িতে ডিনার খান না, স্যানাটোরিয়মে সকলের সঙ্গে একত্রে খাওয়া হয়।

স্যানাটোরিয়মের ডাইনিং হল খুব প্রকাণ্ড, তার চারিদিকের দেয়াল লালবর্ণে চিত্রিত। বিচিত্র আসবাবপত্রে সমস্ত হলটা সাজানো, খাবার টেবিলগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। প্রত্যেক টেবিলে হরেক রকমের ফুলে ভরা ফুলদানি। এখানে রোগীরা এবং ডাক্তারেরা সকলে একসঙ্গে খায়। হলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা লম্বা টেবিল, সেটা কেবল ডাক্তারদের জন্য। আর হলের চতুর্দিক ঘিরে সাজানো রয়েছে ছোটো ছোটো টেবিল, প্রত্যেক টেবিলে চারজন ক'রে লোকের বসবার স্থান। স্যানাটোরিয়মের যে সকল রোগী শয্যাগত নয়, যাদের চলাফেরা করবার অনুমতি আছে এবং যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ, তাঁরা সকলে ডিনারের ঘণ্টা পড়লে ঐখানে খেতে বসে।

আমি সেদিন সেখানে নিমন্ত্রিত অতিথি, আমাকে বসতে দেওয়া হোলো ডিরেক্টরের পাশে। তিনি সমস্ত ডাক্তারদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন,—আমি সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি এখানে কিছু শিক্ষা নিতে। ডাক্তারদের মধ্যে অধিকাংশই জার্মান ও সুইস্, তবে ইংরেজও আছে, ফরাসীও আছে, হাঙ্গেরিয়ানও আছে, ইটালিয়ানও আছে। একজন মাদ্রাজী আর একজন পাঞ্জাবীকেও সেখানে দেখলাম। হরেক দেশের লোক এখানে মিলিত হয়েছে।

খাওয়াদাওয়ার পর অনেক ডাক্তার টেবিল থেকে উঠে গেল, তা'রা ভোজনরত রোগীদের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে নানারকম হাসিগল্প করতে লাগলো।

এখানকার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলাম। রোগী এবং ডাক্তারদের মধ্যে খাওয়াদাওয়া এবং মেলামেশার কিছুমাত্র বাচবিচার নেই, সকলে এমনিভাবে মিশছে ?

আশ্চর্য হ'য়ে ডিরেক্টরকে আমি এই প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন— "এইটেই স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসার সর্বপ্রধান নীতি। রোগীরা যেন আমাদের আত্মীয়ের মতো, আমরা তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করছি। কেবল তাদের শরীর নিয়েই আমাদের সম্পর্ক নয়, তাদের অন্তরের সঙ্গেও আমাদের ব্যক্তিগতভাবের সম্পর্ক হয়েছে, আমরা তাদের সকল রকম সুখ-দুঃখের বন্ধু। যক্ষ্মারোগের এই রকম ভাবেই চিকিৎসা করতে হয়, রোগীদের শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে মনেও আনন্দ দিতে হয়, নইলে কোনোই কাজ হয় না। আমরা যদি তফাৎ হ'য়ে থাকি তাহ'লে ওদের মন দ'মে যায়। তফাৎ হ'য়ে থাকবার কোনো প্রয়োজনও নেই। যক্ষ্মারোগ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো ছোঁয়াচে নয় যে কাছে গেলেই অমনি আক্রমণ করবে। রোগটা একটু বাড়াবাড়ি অবস্থায় না হ'লে রোগীদের নাক মুখ দিয়ে সর্বদা বীজাণু বৃষ্টি হচ্ছে না। আর আমাদের ধারণা, এই রোগ আক্রমণ করা

না-কয়া নির্ভর করে যতটা নিজেদের স্বাস্থ্যের উপর, রোগীদের দেওয়া সংক্রমণের উপর ততটা নয়। আমরা এক-জায়গায় ব'সে খেয়ে আর ওদের সঙ্গে মিশে এইটেই প্রমাণ করি যে রোগটা তেমন মারাত্মক নয়, ভয় করবার মতন তেমন কিছু নেই। এতে একটা নৈতিক সাফল্য পাওয়া যায়, রোগীদের মন সর্বদা প্রফুল্ল হ'য়ে থাকে। সেটা তুমি ক্রমশই দেখতে পাবে। আমার নিজের ছেলেমেয়েও রোজ এইখানে ব'সে খায়, ওরা দেখে যে তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।"

ডিনার শেষ ক'রে আমরা ডিরেক্টরের বাড়িতে ফিরে এলাম। সেখানে আবার কফি খেতে খেতে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে নানারকম গল্প করলাম। লোকটির বড় উদার মন, সহানুভূতি-ভরা হৃদয়।

নানা কথার পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—"দেখ, তুমি কি সত্যিই স্যানাটোরিয়মের কাজ ভালো ক'রে শিখতে এসেছো?" না ওপর ওপর কেবল দেখে যেতে চাও?"

আমি বললাম, তা নয়, কাজ আমি তাঁর কাছে, রীতিমত হাতেকলমে শিখতে চাই, কেবলমাত্র দেখে যাওয়া নয়।

তিনি বললেন—"এখানে শিক্ষা দেবার জন্য সাধারণত কোনো ছাত্রকে নেবার ব্যবস্থা নেই। এটা ছাত্রদের ইউনিভার্সিটি নয়, রোগীদের চিকিৎসার স্যানাটোরিয়ম। কিন্তু তুমি যার কাছ থেকে পরিচয়পত্র এনেছো তিনি আমার বিশেষ বন্ধু, আর তোমার ব্যবহারেও আমি খুশি হয়েছি। এখানে যদি কিছু শিখতে চাও তাহ'লে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে। আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাতে যদি রাজি হও তাহ'লে তোমার শেখবার সুবিধা হ'তে পারে।"

আমি বললাম—"কী প্রস্তাব বলুন, যা বলবেন তাই আমি করতে রাজি আছি।"

তিনি বললেন—"আমার একজন অ্যাসিস্টেন্ট কয়েকমাসের ছুটি নিয়েছে, তার জায়গাটা খালি আছে। সেই জায়গায় আমি তোমাকে ঢুকিয়ে নিতে পারি। এতে মাইনে বিশেষ কিছুই পাবে না, সামান্য হাতখরচের মতো পেতে পারো, কারণ তাকেও আমাদের মাইনে দিতে হচ্ছে। তবে এখানে থাকবার জায়গা আর খাবার ফ্রী পাবে। এখানে বাইরে স্পোর্টস্ হোটেল ছাড়া অন্য কোনো রকম হোটেল নেই, সেখানে থাকবার খরচ খুব বেশি। বড় লোকেরা ঐসব হোটেলে আসে হাওয়া বদলাতে। সেখানে থেকে তোমার অজস্র খরচ হ'তে থাকবে, অথচ বেশি কিছু শিখতে পারবে না। এখানে থাকলে অবশ্য তোমাকে যথেষ্টই খাটতে হবে, পয়সাও বিশেষ কিছু পাবে না, কিন্তু তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, কিছু কাজ শিখে যেতে পারবে। দেখ যদি এতে রাজি হও।"

এ তো অযাচিত অনুগ্রহ! এতটা সুবিধা পেয়ে যাবো এ আমি স্বপ্নেও আশা করিনি। আমি তৎক্ষণাৎ সানন্দে রাজি হ'য়ে গেলাম। তিনি তখন বললেন যে কাল থেকেই আমাকে কাজে লাগিয়ে দেবেন, আর থাকবার খাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সেদিন রাত্রে ডিরেক্টারের বাড়িতেই শুলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্যোদয় হয়েছে। সে যেন কোন মায়ালোকের সূর্যোদয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি চারিদিকের পর্বতমালা বরফে আচ্ছন্ন, পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষার জ'মে বরফ হ'য়ে গেছে, সূর্যকিরণ সেখান থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যে। এই সেই টমাস্ ম্যানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন,' এইখানেই তিনি ঐ বিখ্যাত নভেল লিখেছিলেন। চমৎকার নামটি,—'ম্যাজিক মাউন্টেন।' এখানে পাহাড়ে পাহাড়ে বরফের ম্যাজিক, তার স্তরে স্তরে সূর্যরশ্মির ম্যাজিক, আবহাওয়াতে স্বাস্থ্যের ম্যাজিক। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, অবাক হ'য়ে যাই। আকাশের রং এত নীল, এতই নীল? ভারতবর্ষের আকাশও

নীল, কিন্তু এত নয়। সেখানে তবু দু একটা মেঘের চিহ্নও থাকে, কিন্তু এখানে মেঘের কোন চিহ্নই নেই। আকাশ কত কাছে দেখায়। আকাশের নীলবর্ণ ঐ গোল সামিয়ানা যেন মাথার ওপর উবুড় হ'য়ে পড়েছে মোটেই এ-আকাশ অসীম নয়, চারদিকেই সীমা দেখা যাচ্ছে।

ছেলেবেলার শোনা কৈলাসধামের কথা মনে পড়ে, গন্ধর্বলোকের কথা মনে পড়ে, স্বর্গলোকের কথা মনে পড়ে। এখানে যেন মাটি নেই, আকাশের নীচেই তুষারের দেশ, মাটির দেশ এখান থেকে অনেক নীচে। দেশের কথা মনে পড়ে,—দেশের জন্য মন কেমন করে, আইরিণের জন্য করে, দাদার জন্য করে, পাঞ্চালীর জন্য করে। আশ্চর্য এই, বৌদিদির জন্যও মন কেমন করে। প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন রকমের মন-কেমন করা। এ অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো ছিল না, আপনার লোকের জন্য এমন একটা আকুলতা। কোথায় আমার আপনার লোকেরা, আর কোথায় আমি নির্বান্ধব দেশে!

কিন্তু নির্বান্ধব আমি কোথাও নই। এই দূর অপরিচিত বিদেশে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'য়ে গেছে প্রথম রাত্রি থেকেই। তারপর ক্রমশই যোগাযোগ বেড়ে চলতে লাগলো। মানুষ কোথাও নির্বান্ধব থাকে না। যে যেখানেই থাক, মানুষের সঙ্গে যোগ চিরকালই, মুখোমুখি হ'লেই সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

৪১

নতুন জগতে নতুন মানুষদের সঙ্গে নতুন উদ্যম নিয়ে আমি কাজে লাগলুম। সারাদিনই কাজের ব্যবস্থা, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকবার সময় একটুও নেই। ওখানকার জায়গার আবহাওয়াতেই হোক কিংবা ওখানকার মানুষের আবহাওয়াতেই হোক, শরীর মনের স্ফূর্তি আমার দ্বিগুণ বেড়ে

গেল। মুক্ত মন আর সবল শরীর নিয়ে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলাম। সকাল সাতটার সময় এক পেয়ালা দুধ-কফি আর দুই টুকরা সেমেল রুটি খেয়ে তখন থেকেই কাজে লাগতুম। রোগীদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের খবর নেওয়া, পরীক্ষা করা, এক্সরে দেখা, অপারেশনের ব্যবস্থা করা,—বিস্তর কাজ। বেলা এগারটার সময় সেকেণ্ড ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়লেই চ'লে যেতাম ডাইনিং হলে,—এ সময় প্রচণ্ড ক্ষুধা, সকলের সঙ্গে ব'সে রীতিমত খেতাম। নিতান্ত অসমর্থ ভিন্ন স্যানাটোরিয়মের সকল রোগীই তখন ডাইনিং হলে ব'সে খেতো, এবং তারপর সেইখানেই ব'সে, কিংবা কমন রুমে, কিংবা বারান্দায় কোথাও ব'সে গল্পগুজব করতো। আমার তখন কাজ ছিল তাদের সঙ্গে ব'সে নানারকম গল্পে যোগ দেওয়া। রোগের কথা কিংবা চিকিৎসার কথা সেখানে একটিও না, অন্য পাঁচরকম বাজে কথা ক'য়ে রোগীদের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে, হাসি ঠাট্টা ক'রে নানাভাবে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের দ্বারা তাদের আনন্দ দিতে হবে। এটাও চিকিৎসার অন্তর্গত, এটাও প্রত্যেক ডাক্তারের ডিউটি। এরপর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ছুটি। ঐ সময় আমি একটু বেড়াতে বেরুতাম, কখনো বা শী করতে শিখতাম (ওখানে কেউ স্কি উচ্চারণ করে না)। ডিরেক্টরের ছেলে আর মেয়ে আমাকে শেখাতো, তাদের সঙ্গে খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। তিনটের আগেই বাসায় গিয়ে একবার স্নান ক'রে আসতাম আর তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে খানিকটা কফি খেয়ে নিতাম। মাংসের ভুষ্ট দেওয়া স্যাণ্ডউইচ আমার পকেটেই থাকতো। সাড়ে তিনটের সময় থেকে আবার দস্তুরমত কাজের পালা। তখন এ. পি. করা সুরু হোতো। আমাকে এ. পি. করতে শেখাবার জন্ত সিগারেট মুখে নিয়ে ডক্টর মাওরার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি একটু কোথাও ভুলচুক হোতো তাহ'লে তিনি ভীষণ ধমক দিতেন। —"অমন দুটো চোখ রয়েছে কি কেবল আমার মুখের দিকে চাইবার জন্তে?

মাথায় কি তোমার বরফ জ'মে গেছে ? ডাক্ত[illegible] ধরতে না শিখে তোমার লাঙ্গল ধরতে শেখাই উচিত ছিল,"—[illegible]দি অনেক কথাই তিনি বলতেন, সব মুখ বুজে সহ্য করতাম। এ. পি.[illegible]া হ'য়ে গেলে তিনি চ'লে যেতেন, আমরা ডিনারের সময় পর্যন্ত আরো নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এই হোলো প্রাত্যহিক কাজের তালিকা।

রাত্রি আটটার সময় ডিনার। ডক্টর মাওয়ার তখন সপরিবারে আসতেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে অনেক হাসিঠাট্টা করতেন, কিছুক্ষণ আগেই যে আমাকে বেজায় ধমক দিয়েছেন সে কথা যেন একেবারেই ভুলে গেছেন।

ডিনারের পর মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কিছুদিন তাঁর সখ হোলো, বাংলা ভাষা শিখবেন, টেগোরের কাব্য বাংলাভাষায় পড়বেন। বাংলা বোঝানো তাঁকে ভারি কঠিন। 'আমি খাই' যদি বলি তো 'তুমি খাই' কেন বলবো না, এ তাঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। একদিন বললাম, আপনার মাথায় বরফ জ'মে গেছে তাই বুঝতে পারছেন না। তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন—এইবার বুঝতে পেরেছি। ধমক না দিলে বোঝা যায় না, নতুন কিছু শিখতে গেলেই আমার গোলমাল হ'য়ে যায়, ছেলেবেলা থেকেই আমার এই দোষ। মাষ্টারের মতো আমাকে ধমক দেওয়া দরকার। প্রগাঢ় জ্ঞান, অথচ কী শিশুর মতো সরল!

ডিনারের পর প্রায়ই আমরা অনেকে দল বেঁধে বেড়াতে বেরুতাম। তার মধ্যে অনেক পুরুষও থাকতো, মেয়েরাও থাকতো। খুব খানিকটা ঘুরে গিয়ে কোনো একটা কাফেতে ব'সে কফি খেতাম এবং অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিতাম। ঘরে ফিরতে রাত একটা হ'য়ে যেতো।

সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা অনেকটা উদারনৈতিক কসমোপলিটান প্রকৃতির। ওদের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা নেই, জাতিস্বাতন্ত্র্যের কোনো

গোঁড়ামি নেই, গাত্রবর্ণের প্রতি বিজাতীয় অবজ্ঞা নেই। বিদেশী লোকের সঙ্গেও মন খুলে ওরা মেশে, অন্তরের কথা বলে। মেয়েরা দেশের লোকের সঙ্গেও যেমন অসঙ্কোচে ফ্লার্ট করে, বিদেশীর সঙ্গেও তেমনি করে। যে ওদের দেশে গিয়ে বাস করছে সেই ওদের দেশের লোক। এমন খোলাখুলি হৃদ্যতা, এমন অন্তরের সহজ আদানপ্রদান যে, দেখলে আশ্চর্য লাগে, মনে হয় এরা যুদ্ধবিগ্রহ করে কেমন ক'রে? শুক বিজ্ঞানের আর অর্থ সম্পদের পূজা ক'রেও এরা হৃদয়কে এমন বাঁচিয়ে রেখেছে কেমন ক'রে?

ডিরেক্টরের মেয়ে ফ্রয়লাইন এর্ণা অনেক সময় আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতো। অল্প বয়সের মেয়ে কিন্তু ভারী বুদ্ধিমতী, আমার সঙ্গে বেড়াতে পেলে তার খুব আমোদ হোতো। যেখানে যত দেখবার জিনিষ আছে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতো, পাছে আমি তার সৌন্দর্য বুঝতে না পারি তাই প্রাণপণে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো, আর বারে বারে বলতো,—এমন জায়গা তোমাদের দেশে আছে কি? আমি বলতাম, এর চেয়েও ভালো জায়গা আছে। সে বলতো,—আচ্ছা তোমাকে ক্লিভলাণ্ড পাহাড় দেখিয়ে আনবো, সাণ্ট মরিজ্ দেখিয়ে আনবো, এন্‌গাডিন রেলে চ'ড়ে সেখানে যেতে হয়। তেমন সুন্দর আর এই পৃথিবীতে কোথাও নেই। বাবাকে ব'লে আমি তোমার ছুটি করিয়ে নিয়ে যাবো। অনেকবার সে এই প্রস্তাব করেছে, তার বাবাকে ব'লেও মত করিয়েছে, কিন্তু যাবার অবসর আর ঘটে ওঠে নি।

• •

৪২

ক্রমে শীত প'ড়ে এলো। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু সে শীত আমার সহ্য হ'য়ে গেল। দেশটা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির রাজ্য। যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে সেদিন সকাল থেকে সমস্তক্ষণ সূর্যরশ্মি চারিদিকের বরফের উপরে

পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে সেই রশ্মি আরো চারিদিকে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। আল্ট্রাভায়োলেটের সমস্ত রশ্মি তাই চতুর্দিক থেকে মানুষের গায়ে এসে লাগে। তার তেজ এমন যে—মাইনাস্ দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারেও ওভারকোট গায়ে দেবার দরকার হয় না, সাদা পোষাকেই চ'লে যায়। কাজের সময় আমরা সর্বদা সাদা কাপড়ের পোষাকেই থাকতাম,—সাদা প্যান্ট, সাদা এপ্রন, সব সাদা। নীচে থাকতো মাত্র পশমের পুল-ওভার। ডাক্তারেরা সকলেই সাদা পোষাকে থাকবে, এই নিয়ম।

মাঝে মাঝে খুব শীত করতো, নাকের ডগা আর হাতের পায়ের আঙুল ঠাণ্ডায় জ'মে অসাড় হ'য়ে যেতো, মোজা কিংবা দস্তানায় কিছুতে ঠাণ্ডা আটকাতো না। তখন আমরা ঘরে ঢুকে হাত পা সেঁকে গরম ক'রে নিতুম। ঘর গরম রাখবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছিল। বাইরে যখন হাত অসাড় হ'য়ে যেতো, জামার বোতামটা লাগাবারও উপায় থাকতো না, তখন খানিকটা তুষার কুড়িয়ে নিয়ে হাতে ঘষলেই কিছুক্ষণের জন্য হাত গরম হ'য়ে যেতো। আশ্চর্য এই যে বাইরের ঠাণ্ডার চেয়ে তুষার-গুলো হাতে যেন তখন একটু গরমই ঠেকতো।

স্যানাটোরিয়মের প্রত্যেক ঘরের জানালায় এক রকম কাচ দেওয়া আছে, তাতে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আটকায় না। এই জানলাগুলো বন্ধ রাখলে ঠাণ্ডা আসতে পারে না। কিন্তু ওখানকার ঠাণ্ডাটাই এমন চমৎকার যে অনেকে রাত্রেও জানলা বন্ধ করে না, গায়ে খুব ঢাকা দিয়ে সমস্ত খুলে রাখে। তাতে কোনো অনিষ্ট হয় না। রোগীরাও তাই করতো, আমিও তাই করতাম। একথা আমার দেশের মেয়েরা শুনলে বিশ্বাস করবে না। সমস্ত রাত আমার জানলা খোলা থাকতো। সকালে উঠে দেখতাম জানালার ওপর, মেঝের ওপর, খাটের তলায়, লেপের উপর, মাথার চুলে, সর্বত্র তুষারের পর্দা পড়ে গেছে। যেদিকে চেয়ে দেখি সব

সাদা। ঘরে সাদা, বাইরে সাদা, গাছের পাতা আর ডালগুলো পর্যন্ত সব সাদা, সমস্ত পৃথিবী আপাদমস্তক শুভ্রতায় আচ্ছাদিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করছে। ঘুম ভেঙে উঠে এমন দৃশ্য দেখবার মতো আনন্দ আর নেই। মনে হয় যেন মনের ভিতরটাও আমার অমনি সাদা হ'য়ে গেল। বরফের গুঁড়া-গুলো যেন সাদা বালির মতো সর্বত্র লেগে থাকে, ঝেড়ে দিলেই ঝ'রে যায়, কিন্তু গলে না।

শীতের সময় স্কী করা এবং স্কেট করার বড় আনন্দ। মেয়েরা স্কী করতে বড় ভালোবাসে। ওখানকার মেয়েরা পল্লবিনী লতার মতো নয়, হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ তাদের চেহারা। দলে দলে তা'রা স্কী ক'রে বেড়াচ্ছে, আনন্দে আর উত্তেজনায় তাদের গাল সিঁদুরের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, মনে হয় এখনই বুঝি ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়বে। আমাদের স্যানাটোরিয়মের অনতিদূরেই দাভোস্ লেক, তার জল জ'মে কঠিন বরফ হ'য়ে গেছে। ওর উপর স্কী করবার ভারী সুবিধা। আমি দুপুরের ছুটির সময় প্রায়ই ওখানে স্কী করতে যেতাম। একজন রোগিনীর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল. তার নাম এরিকা। দুপুরে একটা বাজলে যখন সে দেখতো আমি স্কী করতে যাচ্ছি, তখনই সে তার ঘরের জানলা থেকে চেঁচিয়ে আমাকে ডাকতো,—"একটু দাঁড়ান ডক্টর মুখার্জি, মাত্র এক সেকেণ্ড। আপনার সঙ্গে আমিও যাবো।" তার পরেই স্কী করবার পাদুকা আর লাঠি দুটো নিয়ে সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতো। তার অসুখ সামান্যই ছিল, স্কী করবার সে অনুমতি পেয়েছিল। দুজনে পাশাপাশি আমরা ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি মাইল বেগে স্কী করতাম, চলতে চলতে কত গল্প করতাম। কোনো কোনো দিন এর্ণাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতো।

স্কী করা ছাড়া আরো এক রকমের আনন্দ ছিল স্লেজে চ'ড়ে বেড়ানো। স্লেজের চাকায় স্কী করবার পাদুকার মতো মসৃণ কাঠ লাগানো থাকে, অনায়াসে বরফের উপর দিয়ে পিছলে চ'লে যায়। সাধারণত আলসে-

শিয়ান কুকুরে স্লেজ টানে, তা'রা খুব শিক্ষিত। স্লেজে দুজন একত্রে বসা যায়। অনেকেই স্লেজে চ'ড়ে বেড়াতো। অনেক রোগীকেও স্লেজে বেড়াতে অনুমতি দেওয়া হোতো।

রোগী আর রোগিনীতে মিলে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল প্রায় একশো জন। আশ্চর্য এই, তাদের মধ্যে কারো কখনো মুখভার হ'তে দেখিনি। সর্বক্ষণই তা'রা খুশি আছে, কাছে গেলেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে। যার ১০৩ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে, তারও কোনো উদ্বেগ নেই, সে জানে যে ডাক্তারেরা যা হোক ব্যবস্থা করছে, তার ঐ নিয়ে ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই। রোগ সম্বন্ধে তা'রা সকলেই নিশ্চিন্ত। তা'রা জানে স্যানাটোরিয়মে যখন এসেছে তখন রোগ তাদের একদিন সেরেই যাবে। ইতিমধ্যে আনন্দকে অনর্থক ব্যাহত ক'রে রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই। আনন্দবোধেই তা'রা এমনি অভ্যস্ত যে কষ্ট পেলেও সহজে বুঝতে পারে না, সর্বদা প্রফুল্ল হ'য়ে থাকে। কষ্টবোধের তিক্ততা বাঁচিয়ে চলবার একমাত্র উপায় প্রফুল্লতার অভ্যাস রাখা, এ আমি ওদের কাছে শিখলুম।

মরতে হবে, এ কথা ওরা কেউ ভাবে না। রোগ হয়েছে, চিকিৎসার দরকার, ডাক্তারেরা যথারীতি তার ব্যবস্থা করছে। ডক্টর মাওরারের উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। সকলেই মনে করে যে রোগ নিশ্চয় সেরে যাবে। বোধ হয় সেইজন্যেই ওখানকার মৃত্যুসংখ্যা এত কম। চিকিৎসা আর ভালোবাসা—দুই ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সাফল্য পাওয়া যায় কেবল বিশ্বাসে।

একটা কথা প্রত্যেক রোগী এখানে শিখেছে, এই রোগ কেবল কাসির দ্বারাই সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব একবারও না কাসলেই আর এটা সংক্রামিত হবার আশা রইলো না। কাসলে নিজেরও অনিষ্ট, অতএব না-কাসাই ভালো। এই শিক্ষা তা'রা প্রথমেই পায়। প্রত্যহ রোগীদের "কফ ড্রিল" করানো হয়, তাতে শেখানো হয় কেমন ক'রে কাসিকে দমন করা যায়। কাসি দমন ক'রে রাখবার নানাবিধ উপায়

আছে, সেগুলো অভ্যাস করলে এক সপ্তাহের মধ্যেই [illegible]। সকলেই সেই অভ্যাস করেছে। দেখা যায় যে একশো জন যক্ষা-রোগী একত্রে ব'সে ডিনার খাচ্ছে, একসঙ্গে জটলা করছে, অথচ কাশির কোনো শব্দ নেই। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সিনেমা দেখানো হচ্ছে, সারে সারে যক্ষ্মারোগীরা বসেছে সিনেমা দেখতে, কিন্তু কারো গলায় কোনো শব্দ নেই। অথচ ওদের মধ্যে কারো বা একটিমাত্র ফুসফুস কাজ করছে, কারো বা আধখানা মাত্র কাজ করছে।

৪৩

আমার রোগীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই দেখতাম বেশি প্রফুল্ল। পুরুষরা অনেকে বইটই নিয়ে এবং তাসখেলা প্রভৃতি নিয়ে সময় কাটাতো। মেয়েরা আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং ঠাট্টাতামাসা করতেই বেশি ভালোবাসতো। কোথা থেকে তাদের মনে এত প্রফুল্লতা আসে জানি না, দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। যেমন তা'রা প্রফুল্ল, তেমনি আবার সেন্টিমেন্ট্যাল। সম্ভবত যক্ষ্মারোগের বিষে কোনোরকম নেশার শক্তি আছে, তাতেই অমন মনশ্চাঞ্চল্য আর ভাবপ্রবণতা আনে। আমি দেখতাম, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বকে গাঢ়তর করবার জন্যে ওদের পরস্পরের মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো। আন্তরিক প্রীতি স্থাপন করা একটা বিদ্যা, চেষ্টা করলে এ বিদ্যাও আয়ত্ত করা যায়। রোগীদের সঙ্গে ডাক্তারকে প্রীতির সম্বন্ধ জমাতে হবে এ শিক্ষা দেশে কখনো পাইনি, কিন্তু ওখানে গিয়ে সেই শিক্ষাই পেলাম, এবং তার জন্য আমাকে বিশেষ বেগ পেতেও হোলো না। ভাব করবার জন্যে ওরা উন্মুখ হয়েই থাকতো। প্রথমে কৃত্রিম থেকে বন্ধুত্ব অল্পদিনেই অকৃত্রিম হ'য়ে উঠতো। মান অভিমান ঈর্ষা প্রভৃতি বৈচিত্র্য নিয়ে সেটা ক্রমশ একরকম অপূর্ব

হ'য়ে উঠতো। অনেক সময় দেখেছি অবহেলা করলে কিংবা তিরস্কার করলে অভিমানে তা'রা কেঁদেও ফেলতো। সকলেই জানে এ আলাপ মাত্র দুদিনের, কিন্তু তবু এর আবেগ বড় কম ছিল না। সকলের অন্তরের কথাই আমাকে শুনতে হবে, সকলকেই খুশি করতে হবে।

মেয়েদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমার প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, এ বিদ্যা আমি পেলুম কার কাছে? সে কি আইরিণের কাছে? তাকে দেখেই কি আমার মেয়েদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি গেছে? এই কথা মনে হলেই আমার ডক্টর গাঙ্গুলির জন্যে বড় মন-কেমন করতো। মেয়েদের অন্তর দেখবার তার বড় আগ্রহ ছিল, দেশে হয়তো একটিকেও সে ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পায়নি। এখানে এলে তার সে আগ্রহ মিটতো, ওদের দেখে অনেক ধারণাই হয়তো তার বদলে যেতো।

ওদের মধ্যে আমার সঙ্গে সব চেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ক'রে নিয়েছিল এরিকা। প্রথম প্রথম সে আমাকে বড় জ্বালাতন করতো, নানারকম ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। অনেক রকমের শিল্পবিদ্যা তার জানা ছিল। হয়তো কমলালেবুর খোসা কেটে কেটে মহাত্মা গান্ধীর মতো একটি মূর্তি খাড়া করেছে, টেবিলের উপর সেটি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। দেখলেই চেনা যায় কার চেহারার নকল। ক্রমাগতই আমার নজর সেইদিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা। শেষকালে যেমনি আমি সেটিকে হাতে তুলে নিলাম, অমনি হি হি ক'রে হাসি। নিজের রুমালে রঙিন সূতার সেলাই দিয়ে আমার একটা প্রতিকৃতি তৈরি করেছে, দেখলে কতক বোঝা যায় চেহারাটা আমারই। নীচে নাম লিখেছে মু-কা-জি। আমাকে দেখিয়ে বললে, এটা কি আমি রাখতে পারি, তোমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ? মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখবার সময় আমার একরকম কুঞ্চিত-ভ্রূ মুখভঙ্গি হোতো, আমি তা জানতুম না। নকল ক'রে ক'রে সেটা ও আমাকে দেখিয়ে দিলে।

এমনি ক'রে সে আমার সঙ্গে আলাপ জমালে, অনেক দিন আমার সঙ্গে শী ক'রে বেড়ালে, অন্যান্য মেয়েদের কাছে এমন ভাব দেখালে যেন আমার কাছে সে-ই সব চেয়ে প্রধান, তার প্রতিই আমার সকলের চেয়ে বেশি মনোযোগ। যখন দেখলে যে কিছুতেই এটা সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তখন আমার উপর একদিন রাগ হ'য়ে গেল। রাগের কারণ হোলো, শী করতে ওকে ডেকে নিয়ে যাইনি, সেদিন ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

অভিমান ক'রে ও বললে—"আমি এত চেষ্টা করচি, তবু আপনি আমার প্রেমে পড়চেন না কেন তাই শুনি?"

—"ছি ছি, ওকথা বলতে নেই, আমি যে বিবাহিত।"

—"তাতে কী হয়েছে? বিবাহ তো আমি চাই নি, চেয়েছি শুধু প্রেম। নিয়ম ক'রে বুঝি চলতে হবে যে স্ত্রী থাকলে আর কারো ভালোবাসা নেবোই না, তাচ্ছিল্য ক'রে ফিরিয়ে দেবো? স্ত্রী রয়েছে, অতএব বুঝি আর প্রিয়া থাকতে পারে না?"

—"তা নিশ্চয় পারে। আমি তোমার কাছে স্বীকারই করছি যে আরো একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু সে কথা তার কাছেও বলি না, নিজের কাছেও বলতে চাই না। এ রকমের ভালোবাসা হ'লে তা মনে মনেই রাখতে হয়, মনকে সংযত করতে হয়।"

—"ও তাই বলুন, হ'য়েছে তাহ'লে একটি। কিন্তু ভারী বীরত্বের কাজ করেছেন, এমন একটা চমৎকার জিনিষ পেয়েছেন তবু নিজেও ভোগ করছেন না, আর তাকেও ভোগ করতে দিচ্ছেন না। সংযম অভ্যাস ক'রে ভারী তো লাভ হচ্ছে। কোথায় সে মেয়েটি বলুন তো, এখানে না ভারতবর্ষে?"

—"না এখানে নয়, ভারতবর্ষে।"

—"তা বেশ হয়েছে, কেমন ক'রে ভালোবাসা জানাতে হয় আমার কাছে একটু শিখে যান। যতদিন এখানে আছেন ততদিন আমাকেই

ভালোবাসুন, তারপর সেখানে গিয়ে আবার তাকে ভালোবাসবেন। এতে আপনার উপকার হবে, দ্বিধা কেটে যাবে। আজ থেকেই আরম্ভ করুন। একজনকে যখন ভালোবেসেই ফেলেছেন, তখন দ্বিতীয়টিতে আর কোনো দোষ হবে না।"

—"প্রথমটি যদি কোনো আপত্তি করে ?"

—"আচ্ছা তার অনুমতি নিয়ে নিন। চিঠি লি[illegible] দিন যে তাকে দিনকতক ছুটি দেওয়া হয়েছে, এখানে একটি টেম্পোরারি ভালোবাসার মেয়ে জুটেছে। তার নাম হোলো এরিকা সুন্দরী।"

ঠাট্টার ছলে এই কথা আমি আইরিণকে লিখলাম। এই দেশটা এমন যে যক্ষ্মায় যে-মেয়ে ভুগছে সেও প্রেমের কথা বলে। আইরিণ লিখলে,—সেই মেয়েটিকে বলবেন, আমি অনুমতি দিয়েছি। সে যদি আপনার মনে একটুও আনন্দ দিতে পারে, তাহ'লে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সে পাবে। যা আমি এখানেও কোনো দিন পারিনি, ওখানে গিয়ে করবো ব'লে কত আশার স্বপ্ন আমি দেখেছিলুম, তাই যদি [illegible] একটুও করতে পারে, তাহ'লে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তাই কি [illegible] পারবে ? আমিও জানি এবং সেও নিশ্চয় জানে যে পারবে না। তবু সাহস ক'রে সে যে মুখেও বলতে পেরেছে এ জন্যেও তাকে ধন্যবাদ। আমি এমন বোকা ছিলুম যে মুখেও কোনো দিন কিছু বলতে পারি নি, কেবল মনে মনেই কত ভেবেছি।"

পাঞ্চালীকে আমি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি লিখতুম। তাকে ওখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো কথাই লিখতুম না। কি[illegible] তবু সে মাঝে মাঝে সাবধান ক'রে দিতো,—ও দেশের মেয়েদের যেন একটুও না বিশ্বাস করি। বিদেশী লোক দেখলেই ওরা তার সর্বনাশ করে।

দাদাকে প্রায়ই চিঠি লিখতুম। ও দেশের অপরূপ দৃশ্যাবলীর কথা, বরফের সৌন্দর্যের কথা, ও দেশের মানুষদের কথা, চিঠির পাতা ভ'রে

খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করতুম। দাদা লিখতো,—ভারতবর্ষেও অমন অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনেক আছে, এখানেও তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, এখানেও আতিথ্যপরায়ণ নরনারী অনেক আছে, কিন্তু সেদিকে তোমার দৃষ্টি কখনো পড়েনি। নিজের জিনিবের উপর প্রশংসার চোখ কখনই পড়ে না, পরের জিনিষের উপর পড়ে, এইটেই আমাদের স্বভাব। তাই আমার ভয় হয়, ঐ দেশের সব কিছুর চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে তুমি আমাদের কথা একেবারে ভুলেই না যাও। আমি তার জবাবে লিখতুম —মুগ্ধ আমি হ'য়েছি সে কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি কেবল এ দেশের সৌন্দর্য দেখে নয়, এদেশের গুণ দেখে। সৌন্দর্য মানুষকে একবার মাত্র মুগ্ধ করে, কিন্তু বারে বারে যা মুগ্ধ করে তা শুধু চরিত্র। সৌন্দর্যকে সার্থকতা দেয় চরিত্র, তাই সেটা আরো নজরে পড়ে। আমাদের দেশে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তার চরিত্র কোথায়, তার জীবন কোথায়? সে সৌন্দর্য এখানে ওখানে ছড়ানো আছে ইতিহাসের ছিন্নপত্রের মতো, তার প্রতি আমাদের দরদ যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিস্ময় নেই। আমাদের দেশ অতীতের প্রতীক, আর এ দেশ বর্তমানের প্রতীক। কিন্তু ভয় নেই, তোমাদের কাউকে আমি ভুলবো না। বর্তমানের প্রতি যদিও আগ্রহ জন্মেছে, তবু অতীতের প্রতি মোহ আমার কিছুতে ঘুচবে না। দাদা আবার লিখতো—কলকব্জার দেশে গিয়ে তুমি এত আনন্দের সন্ধান পেলে কোথায়, চরিত্রের সন্ধানই বা পেলে কোথায়? যেখানে হৃদয় নেই, সেখানে আবার চরিত্র কী? যেখানে প্রাণের চেয়ে বস্তু বড়ো, সেই দেশের লোক তোমাকে মুগ্ধ ক'রে দিলে? আমি আবার লিখতাম,—এ দেশে হৃদয় নেই এমন কথা কখনো বোলো না। আমাদের দেশে ছোটো ছোটো হৃদয়, আর এখানে বড়ো বড়ো হৃদয়। মহৎ লোক আমাদের দেশেও আছে, এদেশেও আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখবে, এদেশের মতো উদার হৃদয় আর সরল মন আমাদের

দেশে বিরল, সেখানে মহৎ লোকদের মনেও উদারতার অভাব। জীবন ধারণ কাকে বলে, আর তার আনন্দ কাকে বলে, এখানে এসে দেখতে পেতে। এরা মরবার সময়েও জীবনধারণ করে। একদিন আনন্দের সন্ধান আমাদেরই দেশ পেয়েছিল, এই দেশ পেয়েছিল শুধু বিজ্ঞানের সন্ধান। কিন্তু এখন সব অদলবদল হ'য়ে গেছে। সত্যিকথা যদি শুনতে চাও তো বলি,—আগে আমরা যা ছিলাম তা ছিলাম, কিন্তু এখন ওদের মতো উৎকর্ষ পেতে আমাদের চের দেরী।

বৌদিদি মাঝে মাঝে লিখতো,—ঠাকুরপো, এখান থেকে মনোহরা সন্দেশ পাঠালে ওখানে পৌছতে কতদিন লাগে? কড়াপাকের সন্দেশ ওখানে যেতে যেতে নষ্ট হ'য়ে যাবে কি? অনেকদিন খেতে পাওনি, এখানকার সন্দেশের স্বাদ হয়তো ভুলেই গেছ। ওখানে কেবল বিলাতী খাবারই খাচ্ছো, দেশী সন্দেশ খেতে হয়তো এখন ইচ্ছা হ'তে পারে।

৪৪

ছয়মাস মাত্র ছিলাম সুইজারল্যাণ্ডে। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব কাজ শিখে নিয়েছিলাম।*

বিদায় নিয়ে আসবার আগের দিন ডক্টর মাওয়ার তাঁর বাড়িতে আমাকে কফি খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর নিজের লেখা দুখানি বই আমাকে উপহার দিয়ে বললেন,—এর চেয়ে ভালো স্মৃতিচিহ্ন তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই।

এরিকা আর তার সঙ্গে দুচার জন রোগী আর রোগিনী ষ্টেশনে এসে আমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেণ ছাড়ার পরে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলুম, যতক্ষণ দেখা যায়, এরিকা হাসিমুখে ঘন ঘন রুমাল আন্দোলন করছে।

দেশে ফিরলাম যেন নবজীবন নিয়ে, নবীন উৎসাহ নিয়ে। মাত্র ছয়

মাস ছিলাম বিদেশে, তাতেই যেন আবার নতুন দৃষ্টিতে দেশকে দেখছি। আমার দেশকে আমি সত্যই ভালোবাসি, আমার নিজস্ব ব'লে অনুভব করি, এখানকার প্রতি আমার একটা আন্তরিক মমতা। যতই হোক, আমার নিজের দেশ।

পাঞ্চালী আমাকে দেখে ভারী খুশ হোলো। আবার সে তেমনি টান ক'রে চুল বেঁধে রঙিন শাড়িখানি প'রে আনন্দে আর উৎসাহে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যেমন সে আগেকার দিনে করতো, যখন আমি শ্বশুরবাড়ি যেতাম। পাঞ্চালীর সেই ছায়াস্নিগ্ধ রূপ, তার সেই ভিজা মাথার এলোচুলে চামেলি তেলের গন্ধ, তার বুকের ভিতরকার উষ্ণতা আমাকে আবার তেমনি ক'রে আহ্বান করলে, তেমনি ক'রে পরিতৃপ্ত করলে। এই সবের মধ্যে এক আলাদা রকমের সৌরভ আছে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে বাংলা সৌরভ। কিন্তু এর আবার অন্য দিকটাও আছে। লজ্জিত হ'য়ে পাঞ্চালী আমাকে বললে—"তোমাকে এমন নতুন লাগছে যে কী বলবো!"

আমি বললাম—"তোমাকেও আমার নতুন লাগছে।"

—"আর তুমি কোথাও একা যেতে পাবে না, এবার যেখানেই যাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

—"নিশ্চয়, তোমাকে ফেলে রেখে কোথায় যাবো? এ কেবল ছ'মাসের জন্যে মাত্র শিখতে গিয়েছিলাম, তাই।"

—"আচ্ছা, সেখানে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে তোমার আলাপ-সালাপ কী রকম ভাবে হোতো? শুনেছি পুরুষদের হাত ধ'রে তা'রা নাচে। তুমিও তাদের সঙ্গে নেচেছিলে?"

—"মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো আলাপ হয় নি, হয়েছে কেবল পুরুষদের সঙ্গে। সেখানে গিয়েছি কাজ শিখতে, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বেড়াতে নয়।"

—"একজন মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়নি? তাই কখনো হয়? নিশ্চয় তুমি লুকোচ্ছ। কোনো নাম কিংবা—"

—"না, কারো সঙ্গেই আলাপ হয়নি।"

ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখে দেখেছি, তাতে ঘরে ব'সেই ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করা যায়, আর দেখতেও বেশ চমৎকার, কিন্তু জলের তলায় ফুলের যে বোঁটা থাকে তাতে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ জন্মায়।

বৌদিদি আমাকে মাছের মুড়ো রেঁধে কয়েকদিন খুব খাওয়ালে। বললে—"ঠাকুরপো, তুমি এবার একেবারে সাহেব হ'য়ে গেছ। আগেই অনেকটা ছিলে, এখন একেবারে পুরোপুরি সাহেব। পোষাক পরলে আর চেনবার যো থাকে না, কথা কইতে ভয় হয়। অমন ক'রে খাচ্ছো যে, মাছের মুড়ো আর ভালো লাগছে না বুঝি? আচ্ছা তবে কাল থেকে মাংসই রাঁধবো, মাংস খাওয়াই তোমার এখন অভ্যাস হ'য়ে গেছে দেখছি।"

আইরিণের সঙ্গে দেখা করলাম। আইরিণ প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারলে না। গাল দুটো অকারণে অত্যন্ত লাল হ'য়ে উঠলো, সুইজারল্যাণ্ডের মেয়েদের মতো। আনমিত চোখে সেই বিস্ময়জনক দৃষ্টি, ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন যেমন দেখেছিলাম। অনেক্ষণ আমার দিকে চেয়ে অবশেষে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে—"বসুন ডক্টর মুখার্জি। আপনি বড়ো রোগা হ'য়ে গেছেন।"

—"সে কী কথা? সকলেই বলছে আমি আগের চেয়ে ভালো দেখতে হয়েছি।"

—"না, যখন এখান থেকে যান তখন এর চেয়ে মোটা ছিলেন। সেখানে আপনার খুব পরিশ্রম হয়েছে।"

—"ও বোধ হয় তোমার চোখের ভুল। অনেকদিন দেখনি ব'লে ঐ রকম মনে হচ্ছে।"

—“সারাক্ষণ যে মানুষকে মনে মনে দেখছি তার সম্বন্ধে কখনো ভুল হয় ? আপনার এতটুকু এদিক-ওদিক হ’লে তখনি তা ধ’রে দিতে পারি। যাক্ গে, ইউরোপ কেমন দেখলেন বলুন।”

একদিন আইরিণ আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে এক হোটেলে। স্বতন্ত্র একটা ঘরের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে বসলুম। আইরিণ নিজের হাতে আমাকে চা প্রস্তুত ক’রে খাওয়ালে, আইসক্রীম পুডিং খাওয়ালে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুজনে সেখানে ব’সে গল্প করলুম। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আইরিণ অনেক আলোচনা করলে। একবার আমার হতখানা ধ’রে বললে—“এই হাতটা দেখলেই আমি ব’লে দিতে পারি আপনি রোগা হচ্ছেন না মোটা হচ্ছেন। মনে আছে, আপনার বাবার অসুখের সময় কতবার এই হাতের সঙ্গে আমার হাত ঠেকে গেছে, কতবার পিঠের তলায় ব্যাণ্ডেজ দিতে গিয়ে এই হাত ধরেছি ?”

আমি এ কথার কোনো জবাব দিলাম না। যে-কোনো জবাব দিতে গেলেই আমি ভুল ক’রে ফেলবো। কী জবাব আমি দিতে পারি ?

বাসনা সকল মানুষেরই আছে। সে বাসনা দুর্দমনীয় হ’লেও আমি তাকে দমন ক’রে নিতে শিখেছি। আইরিণকে শুধু ভালোবাসি বললেই যথেষ্ট হয় না। তাকে পেয়ে আমি নতুন রকমের একটা আত্মোপলব্ধি পেয়েছি। আমার সত্তার মধ্যে যা সব চেয়ে গরিষ্ঠ, ডক্টর মুখার্জি বলতে আমার প্রকৃত পরিচয়, সে পরিচয় কেবলমাত্র আইরিণ জানে, আর কেউ না। আইরিণের গায়ে একটু হাত দিতে বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু না। হস্তক্ষেপ করা মানেই অধিকার করবার লোভ।

এর পর কতবার আইরিণের সঙ্গে মাঠে বেড়াতে গেছি, কতবার কত বেঞ্চের উপর দুজনে একত্রে বসেছি, ইডেন গার্ডেনে জলের ধারে ঘাসের উপর, শান বাঁধান বেদীর উপর দুজনে কাছাকাছি ব’সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি, গল্প করেছি অজস্র, কিন্তু গাত্রস্পর্শ বরাবর বাঁচিয়ে গেছি।

বরং আইরিণ আমার হাত ধরেছে, আমার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করেছে, কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি। এমনি অনেক দিন হয়েছে, যখন চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, নির্জনে আমরা পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে বিহ্বল হ'য়ে উঠেছি, আইরিণের চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখেছি আত্মনিবেদনের আকুলতা, আমাদে[illegible]তে হয়তো ফুটে উঠেছে আগ্রহ, কিন্তু তবু আমরা অসংযত হইনি[illegible] যেন আমাদের কাছে-পেয়ে-না-ছোঁয়াছুঁয়ির এক নতুন রকমের খেলা। এতেও এক-রকমের আনন্দ আছে, নিজেকে অতৃপ্ত রাখাতে একরকমের তৃপ্তি আছে। আইরিণের মনের দিক থেকে কী রকম ক্রিয়া হোতো তা আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হোতো সংযমের প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এতে আমি ঠকবো না। সম্বরণ আমি অভ্যাস ক'রে নিয়েছি। প্রেম আমি পরিপুর্ণ ক'রে পেয়েছি, আর কিছু চাই না।

একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন বেড়াতে গিয়ে ভয়ানক বৃষ্টি এলো। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল জ'মে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ, আমরা ভিজতে ভিজতে একটা ট্যাক্সি ধ'রে তাতে উঠলুম। কিন্তু ট্যাক্সিটাও খানিকদুর গিয়ে অচল হ'য়ে গেল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ট্যাক্সির মধ্যেই আমরা প্রায় দুঘণ্টা ব'সে রইলুম। আইরিণ এরোপ্লেনে চড়ার মতো ক'রে আমার হাত ধরলে, আমি নির্বিকার হ'য়ে ব'সে রইলুম। আইরিণ বললে—আমার শীত করছে, তবু আমি নির্বিকার হ'য়ে ব'সে রইলুম। আইরিণের চোখে দেখতে পেলুম একটা বি[illegible]মত আবেদন, তবু আমি নির্বিকার হ'য়ে ব'সে রইলুম।

অভ্যাস ক'রে নিয়েছি। গ্রহণ করবো, কিন্তু অধিকার নয়। সাক্ষাৎ পাই, সঙ্গ পাই, স্নেহ পাই, সেবাও পাই,—যথেষ্ট। আরো কিছু পেতে পারি, কিন্তু চাই না। সকল রকমের কথাই আমরা খোলাখুলিভাবে বলি, কেবল এই সম্বন্ধে কোনো কথা কেউ উচ্চারণ করি না। পরস্পরের মধ্যে

অনন্ত বেগগর্ভ পজিটিভ আর নেগেটিভ, একত্রে মিলিত হ'লেই ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাতে নিভানো বাতি জ্ব'লে ওঠে, ঘুমন্ত শক্তি সজাগ হ'য়ে ওঠে,—কিন্তু সে শক্তির এখানে কোনো ক্রিয়া নেই, সে শক্তি সংহত।

৪৫

কিন্তু যা পাচ্ছিলাম সেটুকুও ঘুচে গেল।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে কাজে যোগ দিয়ে কিছুকাল কলকাতায় রইলাম। তারপরেই আমাকে বদলি হ'য়ে চ'লে যেতে হোলো সুদূর নৈনিতালে। আমি স্যানাটোরিয়মের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'য়ে এসেছি, সুতরাং সেখানকার স্যানাটোরিয়মে গিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। সেখানে নতুন রকম চিকিৎসার প্রবর্তনা করা হচ্ছে, আমাকে তাঁর ভার নিতে হবে।

যাবার আগে কয়েকদিন ধ'রে উপর্যুপরি আইরিণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলাম।

শেষের দিন এমনি একটু হাসতে হাসতে আইরিণকে বললাম—"অন্যায় যা ক'রে ফেলেছি তা তুমি ভুলে যেও। আমার সব কথাই যেন মনে ক'রে রেখো না।"

দীপ্তশিখা প্রদীপটা যেন এক ফুৎকারে দপ্ করে নিভে গেল। চোখে আর কোনো জ্যোতি নেই, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে আইরিণ ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বললে—"আমাকে আপনি ভুলে যেতে বলছেন? আপনি—আমাকে—"

ব্যগ্র হ'য়ে আমি বললাম—"না না, আমাকে ভুলতে বলছি না। কেবল কয়েকটা ঘটনা মাত্র ভুলতে বলছি।"

—"কোনটা ভুলবো বলুন ? গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত সবই তো আমার কৃতজ্ঞতায় ভরা। কোনটা রেখে কোনটা ভুল[illegible] ?"

—"কৃতজ্ঞতা আবার কিসের, কী এমন [illegible]র মহা উপকার করেছি ?"

—"অমন কথা বলবেন না। এই মনে করুন আমার ছেলের অসুখের সময়, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। এও কি আমাকে ভুল যেতে বলছেন ?"

—"ও তো সামান্য কথা, ওর চেয়ে আমি বরং [illegible]র কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। আমার সারা জীবনের তুমি একটা পাথেয় [illegible]য়ে দিয়েছো, সেই সম্বল নিয়ে আমি সারাটা পথ চলতে পারবো।"

—"ও কথা যেতে দিন, কে কার কাছে কৃতজ্ঞ তাই কি বোঝাপড়া করবার এখন সময় হয়েছে ? এই তো সবেমাত্র আমাদের সুরু। আপনি দিনকতকের জন্যে একটু দূরে চ'লে যাচ্ছেন, না হয় কয়েক বছরই দেখা হবে না, তাইতেই কি সব বন্ধ হ'য়ে যাবে ? এখনো যে কিছুই হয় নি ! এর মধ্যেই আপনি ভুলে যাবার কথা বলছেন ?"

—"না না কিছুই এখনো শেষ হয়নি, কিছুই আমি ভুলতে বলছি না। কেবল একদিন যে দুর্বলতা আমার প্রকাশ পেয়েছিল, সেইটুকু ভুলে যেতে বলছি। তোমার মনের মধ্যে আমার যে ইতিহাস জ'মে উঠেছে, তার থেকে ঐ লজ্জার কথাটা একেবারে মুছে যাক, এই আমি চাই।"

—"সে কথা তুলে আর কী লাভ আছে বলুন ?"

আইরিণের চোখ দুটো চক্‌চক্ করতে লাগলো। ম্লান একটু সলজ্জ হাসি দেখা গেল সেই অশ্রুসজল চোখে। আলোতে আর সে তেজ নেই বটে, কিন্তু মৃদুমৃদু জ্বলছে।

নৈনিতালে প্রথমে একাই চলে গেলুম। পাঞ্চালীর সঙ্গে যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু সে আসন্নপ্রসবা, আপাতত তাকে দাদার কাছেই রেখে গেলুম।

কিছুকাল পরে ছেলে কোলে নিয়ে সে, এবং মেয়ে কোলে নিয়ে বৌদিদি, একত্রেই নৈনিতালে গিয়ে হাজির হোলো। দাদা ওদের পৌঁছে দিতে গিয়েছিল কিছুদিনের ছুটি নিয়ে।

রোজ বৈকালে খানিকটা ক'রে আমরা বেড়াতে বেরুতাম। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখি নৃপেনের বোন সরলা,—একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াচ্ছে। তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, হয় তো তাকে চিনতেই পারতুম না, কিন্তু আমাকে দেখেই ভয়ে তার মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে গেল, সে আমাকে না-চেনার ভাণ ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করলে তাতেই চিনতে পারলুম।

আমি তাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম —"সরলা!"

সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।—"কুমারদা? আমি চিনতে পারিনি। এখানে আপনি কোথায়?" দাদাকেও সে চিনতে পারলে।

শুনলাম, ঐ সঙ্গের ভদ্রলোক তার স্বামী। তিনি ওখানকার রেলে চাকরি করেন। কোয়ার্টার্স পেয়েছে, দুজনে সংসার পেতে বেশ আছে।

সরলা বললে—"আমার দাদার কোনো খবর জানেন?"

—অনেক দিন কোনো খবর পাইনি।"

সরলা বললে—"একটা গোপনীয় খবর আছে, একটু আড়ালে চলুন, বলছি।" আড়ালে গিয়ে আমাকে বললে—"আগেকার কথা সমস্ত আপনি একেবারে ভুলে গেছেন বলুন, শপথ করুন যে কিছুই আপনার মনে থাকবে না, কারো কাছে কোনো কথা আপনার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হবে না, তবেই আমি এখানে থাকতে পারবো। নইলে যেমন ক'রেই হোক এ দেশ ছেড়ে আমাকে চ'লে যেতে হবে। নতুন জীবন সুরু করেছি, আমার স্বামী যদিও দ্বিতীয়পক্ষে আমাকে বিয়ে করেছেন, তবু আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন। এমন বোধ হয় আপনিও বৌদিদিকে ভালোবাসেন না। উনি-বলেন যে

আমাকে পেয়ে ওঁর আগের জীবনের ইতিহাস একেবারে মুছে গেছে। আমারও তো তাই, কিন্তু মুখে কিছু বলা যায় না। মনে মনে ভাবি বেশ আছি, কিন্তু আপনাকে দেখেই আমার সমস্ত মন আবার বিষিয়ে উঠেছে। আগে বলুন যে আপনিও সব ভুলে যাবেন, আমার নতুন জীবনটাকেই নষ্ট ক'রে দেবেন না, নইলে আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে যা কিছু ফল হয়েছে সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হলাম, সরলাও এমন চালাক হ'য়ে উঠেছে? তাকে জানিয়ে দিলাম যে ডক্টর গাঙ্গুলি মারা গেছে, সুতরাং সেদিক থেকেও কোনো ভয় নেই।

ওদের বিদায় দিয়ে ফেরবার পথে দাদা জিজ্ঞাসা করলে—"নৃপেনের সম্বন্ধে ও কী কথা বলছিল রে?"

আমি বললাম—"নৃপেনের সম্বন্ধে নয়, আমারই সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিল। ওর স্বামীর কাছে সে সকল কথা বলতে লজ্জা হচ্ছিল তাই আড়ালে গিয়ে বললে।"

রাত্রে আবার পাঞ্চালী জিজ্ঞাসা করলে—"ঐ মেয়েটি তোমার সেই নৃপেনবাবুর বোন বুঝি? ওর মুখ দেখাতে লজ্জা হোলো না?"

আমি চুপ করে রইলাম।

পাঞ্চালী আবার জিজ্ঞাসা করলে—"ওতো আমাদের বাসা জেনে নিয়েছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে আবার এখানেও আসবে না কি?"

আমি বললাম—"না, এখানে ও আসবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

কিছুদিন পরে দাদা ওদের রেখে চ'লে গেল।

স্যানাটোরিয়মের নতুন কাজের ভার পেয়ে আমি উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে লাগলাম। ওখানে কাজের কোনো অন্ত নেই, ইচ্ছা করলে অনেক রকমের কাজ বাড়ানো যায়। সর্বক্ষণ যে রোগী নিয়েই থাকতে হয় তা

নয়, কিন্তু নিজের ইচ্ছামত গবেষণার কাজ করবার খুব সুবিধা। জিনিষ-পত্র চেয়ে পাঠালেই পাওয়া যায়, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে মুক্তহস্ত। কাজের উপকরণেরও কোনো অভাব নেই। যাঁর অধীনে ছিলাম তিনি উৎসাহ দিতেন যথেষ্ট, সুতরাং গবেষণার পক্ষে সুযোগ এবং স্বাধীনতা পাওয়া যেতো। ওখানে নামমাত্র একটা ল্যাবরেটরি ছিল, সরঞ্জামপত্র ছিল যৎসামান্য। অনেক যন্ত্রপাতি আনিয়ে আমি তাকে আধুনিক একটা উঁচুদরের ল্যাবরেটরির মতো ক'রে সাজালাম, এবং কর্ণেল লাইটের দরুণ নিজের মাইক্রোস্কোপটি নিয়ে সেখানে ব'সে নানারকমের পরীক্ষা করতে লাগলাম। লাইব্রেরিও একটা ছিল খুব ছোটো, অনেক ভালো ভালো বই আনিয়ে সেটাকে সমৃদ্ধ করলাম। রোগীদের নিয়েও পড়লাম, তাদের জন্য নতুন নতুন চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলাম। নিজেও খুব খাটতে লাগলাম, অধীনস্থ কর্মচারীদেরও খাটাতে লাগলাম।

সারাদিনের মধ্যে বাসায় থাকতাম খুব কমই সময়। বেশির ভাগ সময় আমার ল্যাবরেটরিতে কিংবা লাইব্রেরিতেই কাটতো। সকালে উঠেই কাজে চ'লে যেতাম, দুপুরে মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য বাসায় ফিরতাম, তারপর একেবারে সন্ধ্যার পর গিয়ে বিশ্রাম নিতাম। সংসারের সম্বন্ধে পাঞ্চালী আর বৌদিদি দুজনে মিলে যা হয় ব্যবস্থা করতো। তা'রা দেখতো যে আমি কাজে খুব ব্যস্ত আছি, সুতরাং আমাকে বেশি বিরক্ত করতো না। দুজনে মিলে থাকায় একটা সুবিধা হয়েছিল, পাঞ্চালী একটা সঙ্গ পেয়েছিল নইলে আমাকে মুশকিলে পড়তে হোতো। ওরা থাকতো ওদের ছেলেমেয়ে আর সংসার নিয়ে, আমি থাকতাম আমার কাজ নিয়ে। সেখানে থেকে ওদের স্বাস্থ্যেরও অনেকটা উন্নতি হোলো।

স্যানাটোরিয়মের রোগীদের নিয়ে আমি নানারকম পর্যবেক্ষণ করতাম, এবং তাতে যে সকল নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কার হোতো তাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখতাম। ডাক্তারি গেজেটে সেগুলো প্রকাশ করা হেতো।

আমি দেখতাম যে ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগের সমস্যা কিছু স্বতন্ত্র রকমের। এখানে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করার অনেক সুবিধা আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে অনেকের ঐ কেবল একটিমাত্র রোগ নয়, ওর সঙ্গে আরো দুএকটি বা ততোধিক রোগ একত্রে আক্রমণ করে। কারো থাকে ম্যালেরিয়া, কারো আমাশা, কারো হুকওয়ার্ম, কারো অন্য কিছু। কিন্তু সেগুলো থাকে লুকানো, ঐটেই হ'য়ে ওঠে প্রধান। এ স্থলে সব রোগগুলিকে খুঁজে বের করতে হয়, এবং সবগুলিরই চিকিৎসা করতে হয়। তখন দেখা যায় যে রোগীর শরীরের উন্নতি হয়, যক্ষ্মার চিকিৎসা সহজ হ'য়ে আসে। এই নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখলাম, বিদ্বৎ-সমাজে সেগুলো আদৃত হোলো।

আইরিণকে আমি প্রত্যহ একখানি ক'রে চিঠি লিখতাম, সেও লিখতো। এই রকমই আমাদের কথা ছিল । সব কথাই তাকে লিখতাম। মনে মনে আমি স্থির ক'রে নিয়েছিলাম যে কোনো কথাই তার কাছে লুকোবো না, কেবল একটিমাত্র বিষয় ছাড়া। প্রাত্যহিক আমার কাজের এবং আমার মনের সব খবরই তাকে লিখে পাঠাতাম। অত্যন্ত খুশি হতাম এই কথাটি ভেবে যে এমন একজন লোক পেয়েছি যাকে সমস্তই অকপটে বলতে পারি, আর যে সমস্তই শোনে এবং বোঝে, যাকে লুকোবার কিছু প্রয়োজন হয় না, মিথ্যা বলবার প্রয়োজন হয় না। এইটুকুই যেন আমার পরম তৃপ্তি। অদর্শনের জন্যে বিশেষ কিছু অভাব বোধ করতাম না, প্রত্যহই তাকে আমার কথা বলতে পেতাম, প্রত্যহই তার কথা শুনতে পেতাম। চিঠি পাওয়া এবং চিঠি দেওয়ার যে আনন্দ, সাক্ষাতের আনন্দের চেয়ে সে কিছু কম নয়। সাক্ষাতের আনন্দ অবশ্য আলাদা রকমের, কিন্তু চিঠিতে যে কথা শোনা যায়, সাক্ষাতে সেগুলো শোনা যায় না।

দৈনন্দিন জীবনকে আমি বেশ গুছিয়ে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম এই রকম ভাবেই অতঃপর কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ আমার খুব অসুখ হ'য়ে

পড়লো। টাইফয়েড ফিভার। কয়েকদিনের জ্বরে আমি একেবারে অচৈতন্য হ'য়ে গেলাম। তারপর যে কী হোলো সে খবর আমি কিছুই জানি না।

৪৬

যখন জ্ঞান হোলো তখন দেখি আইরিণ আমার সেবা করছে।

ভালো ক'রে জ্ঞান হবার পর শুনেছি যে নৈনিতালে আমার অবস্থা দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। দাদাকে ওরা টেলিগ্রাম করেছিল, দাদাও সেখানে গিয়ে আমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে বললে ওখানে আর এক-দিনও রাখা উচিত নয়, যেমন ক'রেই হোক কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। সেখানকার ডাক্তার অনেক নিষেধ করেছিল, কিন্তু দাদা শোনে নি, গাড়ি রিজার্ভ ক'রে একেবারে কলকাতায় বাসায় আমাকে এনে হাজির করলে। অটলদা' আর কলেজের সাহেব আমার চিকিৎসা করতে লাগলেন, আইরিণ শুশ্রূষায় নিযুক্ত হোলো।

কিন্তু ভালো ক'রে জ্ঞান আমার অনেকদিন হয়নি। যখনই একটু জ্ঞান হয়েছে তখনই চেয়ে দেখেছি আইরিণ আমার কাছে রয়েছে। মাঝে মাঝে অনেক সময় দেখেছি পাঞ্চালী, কখনো কখনো দেখেছি দাদা, অটলদা' মেয়ে কোলে বৌদিদি। কিন্তু চোখখুলে আমি প্রায়ই দেখেছি আইরিণ, সকলের মধ্যেই সে আছে। ওষুধ খাবার সময় আইরিণ, পথ্য খাবার সময় আইরিণ, জ্বর দেখবার সময় আইরিণ, মাথায় বরফ দিচ্ছে আইরিণ, স্পঞ্জ করাচ্ছে আইরিণ, সকল সময়েই আইরিণ। চোখ খুলেও দেখি, চোখ বুজেও দেখি। ভিতরে ভিতরে একটা আরাম পাই। মনে মনে ভাবি, যেমন সেবা সে আমার বাবাকে করেছে, তেমনি সেবা আমাকেও করছে।

আরো ভাবি, আমার এমন অসুখ হয়েছে সে খুব ভালোই হোলো, ওর হাতের সেবাটা পেয়ে নিলাম। এ একটা উপভোগ করবার জিনিষ, অনেকেই এর আস্বাদ পেয়েছে, কেবল আমিই এতদিন পাইনি। শিক্ষিত হাতের আগ্রহপূর্ণ সেবা,—অসুখের সময় ভারী লোভনীয়।

পাঞ্চালীও আমার কাছে অনেক সময় থাকতো, যতটুকু তার ক্ষমতা ততটুকু করতো। তবে তার ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হোতো, আর ঠাকুর পূজার দিকে ঝোঁক তার আরো বেড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই শুনতাম পূজায় বসেছে। দিনের মধ্যে অনেকবার ফুলচন্দন এনে মাথায় ঠেকাতো, চরণামৃতের জল এনে খাইয়ে দিতো।

অনেক দিন পর্যন্ত আমাকে ভোগালে। জ্ঞান হবার পরেও অনেক-দিন জ্বর ছিল। খুব ধীরে ধীরে সারতে লাগলুম। এমন দুর্বল হ'য়ে পড়ে-ছিলাম, যে বেশি কথা কইতে পারতুম না, নিজে পাশ ফিরতেও কষ্ট হোতো, আমাকে ধ'রে পাশ ফিরিয়ে দিতে হোতো।

সবেমাত্র সেরে উঠেছি, এই সময় একদিন মহা গণ্ডগোল বেধে গেল। আমার পথ্য এসে হাজির হয়েছে, অতএব আমাকে উঠে বসতে হবে। আইরিণ আমাকে পথ্যটা খাইয়ে দেবে। শুয়ে শুয়ে খেতে আমার ভালো লাগে না, ইদানিং কয়েকদিন থেকে আমি খাবার সময় উঠেই বসতে চাই। আইরিণ আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়ে দেয়, পিঠের দিকে কয়েকটা বালিস সাজিয়ে আমাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়, তারপর চামচে ক'রে একটু একটু পথ্য খাওয়ায়। কয়েকদিন এই রকম ব্যবস্থাই চলেছিল।

সেদিন আমার কী খেয়াল হোলো, একটু দুষ্টামি বুদ্ধি মাথায় জাগলো। শরীরও দুর্বল, মনও দুর্বল, সতর্কতার কথা অতো মনে ছিল না। আমি বললাম—"ঘাড়ে হাত দিয়ে তুললে আমার লাগে। যদি তোমার হাত দুটো ধরতে দাও তাহ'লে আপনিই উঠে বসতে পারি।

—"না না জোর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করবেন না। তার চেয়ে

বরং এক কাজ করুন। আমি পিঠের দিকে হাত দিয়ে ধরছি, আপনি দুই হাতে আমার গলার ভর দিয়ে থাকুন। তারপর আস্তে আস্তে আমি তুলে বসিয়ে দেবো, দেখবেন একটুও লাগবে না।"

—"সেই ভালো"—ব'লে আমি আনন্দে হাত দুটো প্রসারিত করলাম। আইরিণ ঝুঁকে প'ড়ে আমার পিঠের দিকে ধরলে, আমি দুহাত দিয়ে তার গলদেশ আবেষ্টন করলাম। তার মুখ আমার অত্যন্ত কাছে, চুলের স্পর্শ পাওয়া যায়। তার সেই সুগঠিত বক্ষ আমার অত্যন্ত কাছে সেই অতিশয় চেনা ল্যাভেণ্ডারের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। তার গলার হারে আমার সেই মোহর ঝুলছে। চোখ বুজে আমি সমস্তটা উপভোগ করতে লাগলাম, আইরিণের কোনো আপত্তি হচ্ছে না দেখে উঠে বসতে একটু বিলম্ব করতে লাগলাম।

—"বেশ বেশ, রোগীর সেবা বুঝি তোমরা এমনি ক'রেই করো?"

কথা শুনে চমকে উঠে চোখ চেয়ে দেখি, পাঞ্চালী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে পুজার ফুল, সম্ভবত আমার মাথায় দিতে এসেছিল।

আমি তাড়াতাড়ি আইরিণের গলাটা ছেড়ে দিলাম। সে কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হোলো না, আমার সাহায্য করাও ছাড়লে না, যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে আমাকে উঠিয়ে বালিসে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলে! তারপর পাঞ্চালীর দিকে ফিরে বললে—"এইবার কী বলছেন বলুন।"

—"বলবো আর কী? এমনি ক'রেই বুঝি তোমরা রোগীদের সর্বনাশ করো? ছি ছি!"

—আপনি অন্যায় সন্দেহ করছেন। যেমন এসেছিলেন তেমনি চুপ ক'রে আড়ালে থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেন না কেন, আমি কী করি? উনি উঠে বসতে পারেন না, ঘাড়ে ধরে তুললে ব্যথা লাগে, তাই অমনি

ক'রে ধরেছিলাম। তার পরে আর কিছু করি কি না দেখলেই আপনি বুঝতে পারতেন।"

—"বুঝতে আমার কিছু বাকি নেই গো বাকি নেই, অনেক কালই বুঝেছি? তোমাকে কি আর এখানে ঢুকতে দিতুম? সবাই বলে তুমি না হ'লে প্রাণরক্ষা হবে না, তাই ভাবলাম আসুক গে। তা তার ভালো প্রতিফলই দিলে। আমারই ঘরে—"

—"দেখুন, অন্যায় কথা বলবেন না। আমার কিংবা ওর যদি অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকতো তা'হলে তার যথেষ্টই সুযোগ ছিল। এতদিন পরে ওঁর এই অসুস্থ অবস্থায় কিছু অন্যায় করতে যাবো, একথা আপনার মনে করাই ভুল।"

—"জানি গো জানি, আর সাধুগিরি ফলাতে হবে না। চোর তোমরা চুরি করাই তোমাদের স্বভাব। সুবিধা পেলেই, চুরি করবে, তার আবার সময় অসময় কী? আর কিছু আমি বলতে চাই না, ঢের হয়েছে, কিন্তু তুমি এখনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। আর কখনো আমাদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে না, বলে দিচ্ছি।

—"আপনি যা খুশি তাই বলতে পারেন, কিন্তু তাড়িয়ে দিলেই আমি চলে যাবো, এ কথা মনেও করবেন না। উনি আমার পেশেণ্ট, আমার হাতে ওঁর সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে। আপনি বললেই আমি ওঁকে ছেড়ে চ'লে যেতে পারি না। এই নিয়ে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন তাহ'লে ওঁকেও আমি এখানে রাখবো না, অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে কলেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো। আপনি নিশ্চিত জানবেন যে তাও আমি পারি। বলবো যে এখানে থেকে ওঁর অনিষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে আমার যা বলবার আছে সব আগে শুনুন। কিন্তু যদি স্থির হ'য়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোনেন তাহ'লে আপনার কথার জবাব দেবো, তা না হ'লে কিছুই বলবো না।"

—"বলো বলো তোমার কী বলবার আছে, মাথা ঠাণ্ডা ক'রেই শুনছি।"

—"এখন না। আগে সবুর করুন, পথ্যটা ওঁকে খাইয়ে নিই। মাথায় ঠাকুরের ফুল দিতে এসেছিলেন, তাই দিয়ে ততক্ষণ আপনি ঐ চেয়ারে গিয়ে বসুন।"

পাঞ্চালী আমার কাছে এলো না, ফুল হাতে নিয়ে গুম্ হ'য়ে চেয়ারে গিয়ে বসলো।

আইরিণ আমার গলার চারিপাশে তোয়ালে গুঁজে যথারীতি পথ্য খাওয়ালে, খাওয়া শেষ হ'লে ধীরে ধীরে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

তারপর পাঞ্চালীর কাছে গিয়ে সংযত কণ্ঠে বললে—"এইবার শুনুন আমার কথা। আপনার জিনিষ আমি চুরি করি নি। কখনো তা করিনি, আর কখনো করবো না, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি। চুরি করবার ইচ্ছা থাকলে অনেক দিন আগেই করতে পারতাম। ডক্টর মুখার্জিকে আমি ভক্তি করি। আপনি যেমন ভাবে আপনার ঠাকুরকে ভক্তি করেন না? আমি অনেকটা সেই রকম ভাবেই ওঁকে ভক্তি করি। ওঁর সঙ্গে আপনার যে সম্বন্ধ, আমার সম্বন্ধ ঠিক সেদিক দিয়ে নয়। আপনার যা অধিকার তা সমস্তই ঠিক আছে, আমার দ্বারা সে অধিকার খর্ব হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যেও একটা অন্তরের সম্পর্ক আছে সে কথা স্বীকার করছি। কিন্তু কর্তব্যের ভিতর দিয়ে, সহানুভূতির ভিতর দিয়ে সে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, সে অধর্মের সম্পর্ক নয়। হয়তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু একদিনেঁ এটা হয়নি, বহুকাল ধ'রে একটু একটু ক'রে এই শ্রদ্ধা গ'ড়ে উঠেছে। কত জীবন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠেছে, আমরা হাত ধরাধরি ক'রে তাদের বাঁচিয়েছি। কত জীবন নষ্ট হয়েছে, আমরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় দিয়েছি। কত কঠিন মৃত্যুর ইতিহাস আমাদের সম্পর্কের মধ্যে জড়ানো আছে। এ সম্পর্ক কখনো ভাঙতে পারে না। কিন্তু আপনার কোনো

ভয় নেই, স্বামীপুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন। মনে কখনো বিদ্বেষভাব আনবেন না, তাতে আপনি নিজেও সুখী হবেন না, আর ওঁকেও সুখী করতে পারবেন না। আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি, আর কখনো আপনার বাড়ি ঢুকবো না। কিন্তু বন্ধুভাবে আমাকে বিদায় দিন, তাড়িয়ে দিলে আমি যাবো না। আমি প্রকৃতই আপনার বন্ধু, আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কখনই আপনার শত্রু নই।"

পাঞ্চালীর যেন কথাগুলো বিশ্বাস হোলো, তার চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো। সে বললে—"তুমি আমার শত্রু নও তা জানি। আমার শ্বশুরের যা করেছো, আর আমার স্বামীর যা করলে, সবই আমি দেখেছি। আমার মনটা আজ কেমন ছোটো হ'য়ে গেল, হঠাৎ রাগের মাথায় কী ব'লে ফেললুম, তুমি আমায় ক্ষমা করো। এখন যদি নিতান্তই চ'লে যেতে চাও তো বাধা দেবো না, কিন্তু কথা দিয়ে যাও যে আবার তুমি আসবে?"

আইরিণ তখন খুশি হ'য়ে বললে—"আচ্ছা বেশ, সে ভালোই হোলো। আপনি যখন বলছেন তখন কথা দিচ্ছি যে আবার আমি আসবো। কিন্তু এখন নয়। এখন তো উনি ভালো হ'য়ে গেছেন। কিন্তু আপনিও আমাকে কথা দিন যে ওঁর আবার তেমন কিছু অসুখ-বিসুখ হ'লেই আপনি আমাকে খবর দেবেন। খবর পেলেই আমি আসবো, আবার ওঁর সেবার ভার নেবো। আপনি আমাকে কথা দিন যে যখন যেখানেই থাকুন, ওঁর অসুখ হ'লেই তখনি আমাকে খবর দেবেন?"

পাঞ্চালী চোখ নীচু ক'রে বললে—"কথা দিচ্ছি, তাই হবে। কিন্তু তুমি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছো। আমার তো স্বামী,—তাই ও রকম দেখে আমি ভুল বুঝেছিলাম, স্থির থাকতে পারিনি। এটা তুমি বুঝলে না? তোমারও স্বামী ছিল, তুমিও ছেলের মা।"

আইরিণেরও চোখ একবার ছলছল করতে লাগলো তার গাল দুটো লাল হ'য়ে উঠলো। সে বললে—"আপনার স্বামী, সে ঠিক কথা। কিন্তু

উনি আমার কাছে স্বামীর চেয়েও বড়ো, উনি আমার গুরু। ওঁকে কি আমি কোনো তুচ্ছ জিনিষের লোভ দেখাতে পারি? এই কথাটি কেবল মনে মনে রাখবেন, আর আমার কিছু বলবার নেই। অনর্থক সন্দেহ করবেন না, ওতে কিছু লাভ নেই, কেবল অশান্তি। অন্ধের মতোই শুধু বিশ্বাস ক'রে যান, তাতে বরং শান্তি পাবেন। অনেক দেখে শুনে এই কথাই আমি শিখেছি।"

দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে চ'লে গেল। দুজনের চোখেই আনন্দের অশ্রু, দুজনের মুখেই পরাজয়ের হাসি। একজন পরাজয় করলে বুদ্ধি দিয়ে, একজন করলে ক্ষমা দিয়ে। আমি নির্বাক হ'য়ে শুনলাম, নির্বাক হয়ে দেখলাম। আর কোথাও এ সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভব। এখানে সঙ্কীর্ণতা অনেক আছে বটে, কিন্তু ক্ষমাও আছে।

৪৭

তারপরে কার্সিয়ংএ চ'লে এসেছি। এখানে পাঞ্চালী আছে, বৌদিদি আছে; দাদাও প্রায় আসা-যাওয়া করে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আছি, সেবা যত্নের মধ্যে আছি। চার মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেলেই আবার নীচে নেমে যাবো, কাজে লেগে যাবো।

এইখানেই আমার গল্প শেষ করতে হবে। কার রচনা তা জানি না, কিন্তু এ গল্প আমার নিজের রচনা নয়। এর ভবিষ্যতের পাতা উল্টে আমি দেখতেও পারি না, কিছু বলতেও পারি না। আজ পর্যন্ত এই। তারপর কে জানে নিত্য নূতনের সম্ভাবনা নিয়ে গল্প আবার কোন পথে এগিয়ে চলবে,—যে পর্যন্ত না আপনি থেমে যায় সে পর্যন্ত। সমাপ্ত যখন হবে তখনো হয় তো সম্পূর্ণ হবে না।

কে জানে আমি ভবিষ্যতে কী করবো! হয় তো সারাজীবন যক্ষ্মারোগ নিয়ে বিজ্ঞানের সাধনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে যাবো। হয় তো একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করবো, মৃত্যুরহস্যের যবনিকার একটা কোণ হয়তো ফাঁক ক'রে উঁকি মেরে খানিকটা দেখে নিতে পারবো। জগতের হয়তো তাতে কিছু কাজ হবে, আমার মৃত্যুর পরে লোকে হয়তো আমার মর্মরমূর্তি গ'ড়ে রাখবে। তখন আমার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করতে সকলে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে, কেউ জানবে না আমার জীবনে কোথায় কোন অতৃপ্তি, কোথায় কোন—

কিংবা হয়তো বিজ্ঞানের সাধনাই আমাকে ছাড়তে হবে। চাকরি করতে করতে কোনো অজানা লোকালয়ে চ'লে যাবো, সেখানে অজানা হ'য়ে নগণ্য প্রাণীর গল্পের মতো আমার গল্পটি ফুরিয়ে যাবে। যে ফলটা আমার পাকবার সম্ভাবনা ছিল, সে হয়তো আর পাকবেই না, ঝড়ে বৃষ্টিতে নষ্ট হ'য়ে এক দিন ঝ'রে পড়বে। কেউ হয়তো জানবে না,···কিন্তু এ কথা বলা আমার ঠিক হচ্ছে না। আইরিণ নিশ্চয়ই জানবে। সে বলেছে, অসুখ হ'লেই সে আসবে। তার কথার কখনো বেঠিক হয় না, বরাবরই দেখে আসছি। সেও থাকবে, পাঞ্চালীও থাকবে। একটি আমার জীবনের সান্ত্বনা,—আর একটি মমতা।

আমার কথাগুলো দুই নৌকায় পা দেবার মতো হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী করবো, এই কথাই সত্য।

আমি একা নয়, আজকাল সকলেই আমরা এমনি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেছি। এখনকার আমাদের জীবনধারাই এমনি। এক নৌকায় ওঠাই হয়তো ভালো, কিন্তু বর্তমান যুগের জীবনপ্রতিমার তাতে কুলায় না, তার জটিলতা আর আয়তন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এই সকল প্রতিমার ভাসান দিতে দুই নৌকা একত্র করতে হয়, দুই নৌকায় চড়িয়ে নদীতে যাত্রা করতে হয়। একদিকে ভগবান অন্যদিকে বিজ্ঞান,—

একদিকে প্রাচ্য অন্যদিকে পাশ্চাত্য,—একদিকে শিক্ষা অন্যদিকে স্বভাব,—একদিকে জগৎ অন্যদিকে জগতাতীত,—একদিকে অজ্ঞান অন্যদিকে জ্ঞান,—একদিকে যুক্তি অন্যদিকে মুক্তি,—একদিকে অতীত অন্যদিকে ভবিষ্যৎ,—একদিকে পাঞ্চালী অন্যদিকে আইরিণ,—এমনি ক'রেই দুই নৌকায় পা দিয়ে আমাদের চলতে হয়। ভবিষ্যতে কখনো হয়তো মানুষজাতি এক নৌকায় উঠতে শিখবে, কিন্তু তার ঢের দেরী, ততদূরে চাইবার আমাদের অবসর নেই। উপস্থিত ভারকেন্দ্র ঠিক রাখবার জন্যেই নিযুক্ত হ'য়ে আছি।

উপায় নেই। পরিবর্তনের যুগে অতি দুঃসময়ের মধ্যে আমাদের জন্ম। সমস্তই অনিশ্চিত। স্বাস্থ্য অনিশ্চিত, ভাগ্য অনিশ্চিত, সাধনা অনিশ্চিত, প্রেম অনিশ্চিত। নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক নৌকায় পা রাখা এখন চলে না।...

তবু এই অনিশ্চিতের মধ্যে যা পেয়েছি সে আমার সৌভাগ্য। এই যে বিক্ষোভ আর অস্থিরতার মধ্যে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এই যে অব্যবস্থিত চিত্ত আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়েও অন্ধকারে অগ্রসর হ'য়ে চলেছি, প্রতি পদে হোঁচট খেয়ে বারে বারে সজাগ হ'য়ে উঠছি,—এও আমার পরম সৌভাগ্য। প্রতি পদে জানছি যে আমি বেঁচে আছি। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অস্তিত্বের এই জলন্ত অনুভূতি আর কোনো যুগে আর কোনো মানুষ পেয়েছে কি না জানি না।...

ডাক্তার হয়েছি, সে আমার পরম সৌভাগ্য। মানুষের সঙ্গে মেশার এই অপূর্ব সুযোগ পেয়ে অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি, অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেছি। কর্ণেল লাইটের কাছে, সার্জন বনারজির কাছে, ডক্টর আওয়ারের কাছে, ডক্টর দাসগুপ্তের কাছে, ডক্টর গাঙুলির কাছে,—অনেকের কাছে অনেক বহুমূল্য সম্পদ লাভ করলাম। আর সব চেয়ে বড়ো সম্পদ পেয়ে গেলাম আইরিণ।...একথা কখনো কাউকে বলবার নয়,

এ সম্পদ কখনো কাউকে দেখাবার নয়। শুধু জানি আমি, আর কেউ জানে না এ কত বড় সম্পদ। অবিচল সম্পদ, স্বয়ং প্রকৃতির দান। কিন্তু এ কেমন সম্পদ,—যা কখনো নিকটে রাখা যাবে না, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাবে না, যা চিরদিন দূরে দূরেই রাখতে হবে? হয় হয়, তাও হয়, অনধিকারের সম্পদও মানুষের হয়। কথাটা আশ্চর্যের বটে। অনেক সময় আমি নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যাই। অনেক সময় আমি নিজেই বুঝি না।...

দেখবার জন্য জন্ম নিয়েছিলাম। দেখলাম অনেক। অপরূপ সৃষ্টির এই পৃথিবী দেখলাম, সেই পৃথিবীর আরো অপরূপ সৃষ্টি মানুষ দেখলাম, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হবে? এই অদ্ভুত পৃথিবীতে চারিদিকেই ম্যাজিক আর চারিদিকেই মিরেকল্, দেখতে দেখতে অবাক হ'য়ে যাই।

বাবার কথাটা মনে পড়ছে। সেই যে বাবা বলতেন—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"—যার মানে আগে বুঝতাম না। এতদিনে একটু একটু বুঝতে পারছি তার অর্থ কী। ওগুলো হচ্ছে মিরকেল্-এর কথা, এই দোটানা জগতেও নিত্য কত মিরেকল্ হয়। আজ যে অন্ধ কাল তার দৃষ্টি খুলে যাবে, আজ যে খোঁড়া কাল সে লাফিয়ে চলবে, আজ যার সম্পদ নেই, কাল সে সম্পদ পেয়ে যাবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

কার্শিয়ংএ চ'লে আসবার পর আইরিণের কাছ থেকে কয়েকটা চিঠি এসেছে। তার মধ্যে সম্প্রতি পেয়েছি এই চিঠিখানা—

কলকাতা

১২ অক্টোবর

প্রিয়তম ডক্টর মুখার্জি—

আপনি ওখানে গিয়ে অনেকটা সেরে উঠেছেন, লেখাপড়া করতে কিংবা ঘুরে বেড়াতে আর কোনো কষ্ট হয় না জেনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

লেখাপড়া যত খুশি করুন তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যার পরে খবরদার বাইরে ঘুরে বেড়াতে পাবেন না। ঐ এক আপনার বদ স্বভাব আছে জানি, তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি। ওখানকার সন্ধ্যার সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে, তার আগেই বাড়ি ফিরবেন।

নিজের গল্প নিজেই লিখচেন বুঝি? শুনে ভারী আমোদ হচ্ছে, লেখা শেষ হ'য়ে গেলে আমাকে পড়তে দেবেন তো? আমার নামটাও তার মধ্যে থাকবে লিখেছেন। কী লিখবেন আমার নামে? নিন্দা করবেন না সুখ্যাতি? যত আনন্দ পেয়েছি, যত কষ্ট দিয়েছি, সব লিখবেন না কি? শুনতে ভারী কৌতূহল হচ্ছে।

আপনি অসুখের সময় যখন অচৈতন্য হয়ে ছিলেন, তখনকার কথা জানতে চেয়েছেন। কেন? ঐ গল্পের মধ্যে তাও বুঝি লিখতে হবে? বিকারের ঘোরে আপনি কেবল আমার নাম করতেন। আমি তখন জানতুম না আপনার অসুখের কথা, অনেকদিন চিঠি না পেয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ একদিন আপনার দাদা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেই থেকে ছুটি নিয়ে আমি আপনার কাছে থাকি। বিকারের উত্তেজনায় আপনি ভারী ছটফট করতেন, কিন্তু আমার গলা শুনলেই চুপ করতেন। আমি যদি একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতুম, তাহ'লে অচৈতন্য অবস্থাতেও আপনি খুশি হ'য়ে উঠতেন। অন্য কেউ আপনাকে জলটুকু পর্যন্ত খাওয়াতে পারতো না, কিন্তু আমি আপনার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডেকে যা কিছু খাওয়াতে যেতুম তাই তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলতেন। যখন এক-একবার জ্ঞান হোতো তখন চোখ চেয়ে চারিদিকে আমাকে খুঁজতেন, দেখতে পেলেই আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজতেন। আমি তাই আপনাকে ছেড়ে একবারও কোথাও যেতে পারতুম না, সর্বক্ষণই থাকতে হোতো, কখন আমাকে খুঁজবেন তার ঠিক নেই। মৃত্যুর কথা আমিও ভেবেছি। অনেক সময় ভেবেছি আপনি বুঝি আর বাঁচবেন না। আমি মনে মনে ঠিক ক'রে

রেখেছিলাম যে মরবার সময়েও আমি আপনার কাছে থাকবো, তাতে আপনি একটু আনন্দ পাবেন। সেইটুকুই আমার পরম লাভ। সেইজন্যেই তো চালাকি ক'রে আমি দিদির কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছি যে আপনার অসুখবিসুখ হ'লেই যেন আমি খবর পাই। তখন আমি কাছে না থাকলে আপনার অযত্ন হবে। ঐ আমার এক বিষম ভয় আছে। আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি যে ডাক্তারেরা কী রকম অযত্নে আর অচিকিৎসায় মরে! সকলের মরবার সময় আছে তা'রা, কিন্তু তাদের মরবার সময় কেউ নেই। ডক্টর গাঙ্গুলির মরবার সময় ঠিক তাই হয়েছে, কিন্তু আপনার মরবার সময় কিছুতেই তা হ'তে দেবো না।

কিন্তু মৃত্যুর কথায় আর কাজ নেই। আর ও কথার উল্লেখ করবেন না। আপনাকে অনেক বড়ো হ'তে হবে, অনেক কাজ করতে হবে, মরবার যথেষ্ট দেরী আছে। আপনি খ্যাতিলাভ করবেন, পাঁচজনে আপনার নাম করবে, সেই তো আমার গর্ব! আমরা যে এত স্বার্থত্যাগ করলাম, তার কি কোনো ফল পাবো না?

আর আমার মৃত্যু? সে কথা একটুও আপনাকে ভাবতে হবে না। যে নারী মনের খোরাক পায় তার রোগও হয় না, সে মরেও না, বহুকাল বেঁচে থাকে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে, একথা কি আপনি জানেন না?

আমার ছেলে জন্ আজকাল অত্যন্ত অবাধ্য হ'য়ে উঠেছে, মোটে আমার কথা শোনে না। এর মধ্যেই তার বাপের মতো স্বভাব দেখা যাচ্ছে। আমাকেই তার বাধ্য হ'য়ে চলতে হবে, যা বলবে তাই শুনতে হবে। সকলেই দেখছি এমনি, আমার কাছে কেবল সুযোগটুকু নিতে চায়। কিন্তু তা'রা ভুল করে, সুযোগ চাইলে পাওয়া যায় না, না-চাইলেই পাওয়া যায়। দুনিয়ার কারো ওপরে আমার আর কোনো আস্থা নেই, কেবল আপনি ছাড়া। তাই আমি ভাবি, এত আপনার মানুষকে কতদিন

না দেখে থাকবো, কতদিন আপনি দূরে দূরে থাকবেন ? এখন তাই মনে হয় আমি বড় ভুল করেছি। আনন্দ কখনো অপরাধ হয় না, কষ্টই অপরাধ। একথা অনেক দেরীতে বুঝলুম।

দিদির কাছে আমি একটা মিথ্যা কথা বলেছি। ঐ মিথ্যা আমি একদিন নিজেও ভুল ক'রে বুঝেছিলাম। প্রকৃতই যাকে তেমন গুরুর মতো ভাবি, অর্থাৎ যাকে আত্মনিবেদন করেছি, তার সম্বন্ধে তুচ্ছ বস্তু আর মহৎ বস্তু সবই সমান, তাকে অদেয় কিছু নেই। ভক্তিই বলুন আর ভালোবাসাই বলুন, ও এমনই জিনিষ যেটুকু না থাকলে কোনো কিছুর অধিকার দিতে পারাই মহা কষ্ট, আর যেটুকু থাকলে সমস্ত কিছুর অধিকার না-দিতে পারাই মহা কষ্ট।

একটা নতুন খবর আছে। কলকাতার কাছেই একটা নতুন স্যানাটোরিয়ম হবে শুনছি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, সেখানে আপনাকেই আনা হবে নতুন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। আমিও দরখাস্ত ক'রে দিয়েছি সেখানে নার্সিং বিভাগের ভার নিতে রাজি আছি ব'লে। আপনার কাছে আমার থাকতেই হবে, যখনই পারি আর যেমন ক'রেই পারি। এখনো আমাদের কিছুই হয় নি, মিলনের এই সবে সুরু। দেখবেন যে আপনার সহযোগিতা পেলে আমি সেবার কাজ কতই করতে পারি।

আপনার ছুটি ফুরোবে ১৩ই নভেম্বর। কিন্তু এখানে আসতে যেন ততদিন পর্যন্ত দেরী করবেন না, অন্তত তার এক সপ্তাহ আগে আসতে হবে। এখানে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে তবে চাকরিতে জয়েন করতে যাবেন। ঐ কয়টা দিন আগের মতো আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে।

দিদি কেমন আছেন ? খোকা কেমন আছে ?

আপনার স্নেহের আইরিণ

সমাপ্ত